প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীকালিদাস রায়

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্
দক্ষিণ কলিকাতা

ভূমিকা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা সাহিত্যের ইতিহাস নয়। যাহা সাহিত্যপদবাচ্য নয়, তাহা আমার আলোচ্যও নয়। যাহা প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য তাহার সম্বন্ধে আমার সমস্ত বক্তব্য দুইখণ্ডে বলা হইল না। অনেকগুলি আলোচনা বাকী থাকিয়া গেল। কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য আপাততঃ এইখানেই থামিতে হইল।

ভবিষ্যতে মুদ্রণের সুযোগ ঘটিলে তৃতীয় খণ্ডে প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্য, প্রাচীন লোক-সাহিত্য, গাথা-সাহিত্য, কাশীরামের মহাভারত, রামেশ্বরের শিবায়ন, ভারতচন্দ্রের কাব্য, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও পদাবলী, শাক্ত-সাহিত্য ও প্রাচীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের ছন্দ সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করিবার আশা আছে।

প্রাচীন সাহিত্যের কোন কোন অঙ্গের ব্যাখ্যা ও আলোচনা কবিতার আকারে নিষ্পাদিত হইয়াছে।

অক্ষরে অক্ষরে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয় নাই। কোন বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমি পদাবলীর চণ্ডীদাসকে পৃথক চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। ইতিহাসের দিক হইতে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। ২।১ স্থলে ছাপার ভুলও আছে। যেমন—বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে মরহট্টা ছন্দের স্থলে 'ভরহট্টা' ছাপা হইয়াছে। ইতি

সন্ধ্যার কুলায়
টালিগঞ্জ, কলিকাতা। }

শ্রীকালিদাস রায়

সূচী-পত্র

(প্রথম খণ্ড)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি বহু বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা অনুকরণ ও অনুসরণের দ্বারা গুরুর মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা যে হিসাবে বাংলা কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল বিদ্যাপতির পদও সেই হিসাবে বাঙ্গালীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। ভাষার জন্য বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে এইরূপ অনেক শ্রেষ্ঠ কবিকেই বাদ দিতে হয়। তাহা ছাড়া—খাঁটি বাংলার কৃষ্ণকীর্ত্তন, ময়নামতীর গান ও শূন্যপুরাণের ভাষার তুলনায় বিদ্যাপতির বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর ভাষা আমাদের কাছে ঢের বেশি পরিচিত ও অন্তরঙ্গ। সে যুগের অন্যান্য কবির ভাষার মত বিদ্যাপতির ভাষাও বাংলা ভাষারই একপ্রকার প্রাচীন রূপ। বাংলা দেশের সীমা তখন পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানের ভাষা ও তথাকথিত মৈথিলীতে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। প্রভেদ সামান্য ছিল বলিয়াই বাঙ্গালী কবিরা এত সহজে বিদ্যাপতির ভাষা আয়ত্ত করিয়া সেই ভাষায় বিদ্যাপতির মতই পদ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে সমাদৃত হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরের মুখে বিদ্যাপতির

পদের আবৃত্তি শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাতে মিথিলার কবি বঙ্গদেশে অভিনব মর্য্যাদা ও অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আবেষ্টনীর মধ্যে যে সমাদর ও রসব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশে যেন তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এই জন্মান্তরে হয়ত কিছু রূপান্তরও ঘটিয়াছে। মিথিলায় উহাদের মূল্য এক, বাংলায় মূল্য আর। বাংলা দেশ ঐগুলিকে যে-ভাবে প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মিথিলা তাহা পারে নাই; এমন কি বাঙ্গালা দেশে বিশিষ্ট সমাদরের ফলে মিথিলায় বিদ্যাপতির সমাদর বাড়িয়া গিয়াছে—বাংলার রসবোধ এবিষয়ে মিথিলার রসবোধকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যেই ঐ পদগুলি অভিনব লোকোত্তর জীবন লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শ ঐগুলিতে আধ্যাত্মিক অর্থগৌরব (Spiritual Interpretation) দান করিয়াছে। সঙ্কলয়িতারা ও রসজ্ঞগণ বিদ্যাপতির পদগুলিকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাবেষ্টনীর মধ্যে চণ্ডীদাস, লোচনদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি সাধক কবিগণের পদের সঙ্গে গুম্ফিত করিয়া এবং কীর্ত্তনিয়ারা পদে নূতন নূতন ভক্তি-রসানুগ আঁখর সংযোগ করিয়া একদিকে যেমন সেগুলিকে লোকোত্তর বা মিস্‌টিক ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে, অন্যদিকে সেগুলিকে তেমনি বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ্ করিয়া লইয়াছে।

বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছেন—সে ভাষার মত রাগমাধুর্য্য বর্ণনার উপযোগী ললিত, মধুর, স্বচ্ছ, সরল ভাষা আর্য্যাবর্ত্তে আর নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন—"বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলীতেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে ঐগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া বাংলা ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এই বিকৃত রূপই বাংলাদেশে ব্রজবুলি নামে পদ রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে।"

কিন্তু আমরা মনে করি, কেবল গীতি-রচনার জন্যই এই ভাষা কবির নিজেরই

বা মিথিলার কবি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সুললিত মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া মাগধী প্রাকৃত কবিতার ভাষাকে কবি এই অভিনব রূপ দান করিয়াছিলেন এবং ইহার তিনি নাম দিয়াছিলেন অবহঠ্‌টা। (দেসিল বসনা সবজন মিঠ্‌টা তেঁ তইসন জম্পও অবহঠ্‌টা)। বঙ্গদেশে বাংলা শব্দের প্রভূত মিশ্রণে ইহাই ব্রজবুলি নামে চলিয়াছে। *

পিঙ্গল-সঙ্কলিত বাছাবাছা প্রাকৃত ছন্দগুলিই কবি পদরচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রাকৃত পিঙ্গলের দৃষ্টান্তগুলির সহিত পরিচয় আছে, তাঁহারা সহজেই বিদ্যাপতির ভাষা ও ছন্দের জন্ম-কোষ্ঠী ধরিতে পারিবেন।

বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ও সভা-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ১৫শ শতাব্দীর লোক। ** ইনি সংস্কৃতে শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করেন। প্রাকৃত ভাষার বৃত্তনরেন্দ্র, ভররহট্ট, দোহা ইত্যাদি ছন্দে ও জয়দেব-প্রবর্ত্তিত ছন্দে ইহার পদাবলী রচিত। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন না— ইনি ছিলেন শৈব অথবা পঞ্চোপাসক।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—নরনারীর চিরন্তন প্রেমলীলার নানা বৈচিত্র্য লইয়া প্রাকৃত রসরচনাই ছিল কবির অভিপ্রেত। অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাকৃত প্রেম-মাধুর্য্যকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রস-সাধনার অঙ্গীভূত এবং কীর্ত্তনের পালার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লইয়াছে।

* বাংলার জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবিগণ প্রচলিত বাংলাভাষা ত্যাগ করিয়া কেন যে এই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন সে কথার পরে আলোচনা করা যাইবে।

** বেকতেও চোরি গুপুতকর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম যুগপতি চিরে জীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

গ্যাসদেব—গিয়াসুদ্দিন সুলতান। ইনি মিথিলারও সুলতান ছিলেন। বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ বাঙ্গালার সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সময়ের লোক।

(বৃন্দাবনের রস-সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রতি-রসাত্মক কবিতা রচনা করিলে তাহা আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক অভিব্যঞ্জনা লাভ করিবে, এই ধারণাও সম্ভবতঃ তাঁহার মনে ছিল।)

(বিদ্যাপতির কবিশেখর, কবিরঞ্জন ইত্যাদি অনেক উপাধি ছিল। বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ভাষায় অর্থাৎ ব্রজবুলিতে কবিরঞ্জন, কবিশেখর, কবিবল্লভ, চম্পতি, ভূপতি ইত্যাদি ভণিতা দিয়া বাঙ্গালী কবিরাও বহু পদ লিখিয়াছেন। এজন্য অনেক বাঙ্গালী কবির পদকে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া মনে করা হয়।

নগেনবাবু কবিরঞ্জন, কবিবল্লভ, কবিশেখর, চম্পতি ও ভূপতির পদগুলিকেও বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশবাবু এই বিষয়ে যুক্তি সাহায্যে নগেনবাবুর ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দুই একটি যুক্তির এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কবিবল্লভের "সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে তিলে তিলে নূতন হোয়।" এই কবিতাটি বিদ্যাপতির হইতে পারে না। রূপগোস্বামী অনুরাগ শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব। সেই অর্থে এখানে অনুরাগ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি তাহা কোথায় পাইবেন? গোবিন্দদাসের "আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে" পদটির ভাব ও কবিবল্লভের কবিতার ভাব একই। এইপদে গোবিন্দদাস করিয়াছেন—"গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রসমরিযাদ।" এই শ্রীবল্লভ বা কবিবল্লভ বাঙ্গালী কবি।

কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি হইলেও কবিশেখর ভণিতার পদমাত্রই বিদ্যাপতির নয়। বাংলায় চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ইত্যাদি পদকর্ত্তা ছিলেন। রায়শেখর-ভণিতা ও শুধু শেখর-ভণিতার পদও বিদ্যাপতির হইতে পারে না। কবিশেখর-ভণিতা-যুক্ত বহুপদের ভাষায় মৈথিলী শব্দের বদলে সংস্কৃত শব্দ এবং

শ্রীচৈতন্য ও গোস্বামিগণের দ্বারা প্রবর্তিত নব ভাবের আভাস-ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়, পদকর্তার সখী-স্থানীয়তা-সূচক ভণিতাও দেখা যায় এবং বিশাখা, ললিতা, কুটিলা, জটিলার উল্লেখ দেখা যায়। এসমস্ত বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল। অতএব কবিশেখর-ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতির পদ হইতে পারে না।

'কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা' ও 'ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুইটি পদও কবিশেখরের, বিদ্যাপতির নয়।

বিদ্যাপতির ভণিতায় কতকগুলি বাংলাপদও পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ বাবুর মতে এইগুলি শ্রীখণ্ডবাসী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির রচনা। ইঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি বলা হইত। কেবল বাংলা পদ নয়—ইঁহার অনেক ব্রজবুলির পদে কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি ভণিতা আছে। সেগুলিকে মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ভুল করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন—এই বিদ্যাপতির সহিতই গঙ্গাতীরে দীন চণ্ডীদাসের মিলন ও সহজিয়া তত্ত্ব-বিচার হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট পদ নগেনবাবু মিথিলায় পান নাই—পাইয়াছেন বাংলায়। এই পদগুলি যদি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির হয়, তাহা হইলে মিথিলার বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যান। আর যদি সেগুলি মৈথিল বিদ্যাপতির হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় বিদ্যাপতির যে মর্য্যাদা মিথিলা বুঝে নাই—সে মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল বাংলা। মিথিলার লোকেও সেগুলিকে রক্ষা করে নাই, বাঙ্গালীরাই ঐপদগুলিকে বুকে করিয়া রক্ষা না করিলে সেগুলি লুপ্ত হইয়া যাইত। মিথিলায় জন্মগ্রহণ করিলেও বিদ্যাপতি বাংলারই প্রাণের কবি।

বিদ্যাপতির পদাবলী সংস্কৃত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। হালা সপ্তশতী আর্য্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক ইত্যাদি আদিরসের সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য হইতে বিদ্যাপতি

বহু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত কবি-প্রৌঢ়োক্তি, সংস্কৃত অলঙ্কার ইত্যাদি তিনি ভূরিভূরি গ্রহণ করিয়াছেন। নায়িকা-বৈচিত্র্য-বিন্যাসেও কবি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বহু সংস্কৃত শ্লোকের ভাব তাঁহার রচনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে তিনি ঋতুবর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত কবির ভাবে ও রসোপাদানে তিনি নিজের মনের মাধুরী যথেষ্টই যোগ দিয়াছেন।

জয়দেবের মত বিদ্যাপতি সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার-রসের কবি—সৌন্দর্য্য-পিপাসার কবি। সম্ভোগের কোন লীলা-বিলাস কবির কাব্যে বাদ যায় নাই। মনে হয় কবি বাৎসায়নের কামসূত্র এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ-অনুসরণ করিয়াই যেন সম্ভোগলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধার রূপবর্ণনার প্রত্যেক অঙ্গটি কবি সংস্কৃতকাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কৃতিত্ব,—ঐগুলিকে তিনি বিবিধ অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মণ্ডন-শিল্পের অন্তর্গত। কবি তাঁহার রচিত উপমাহৃত রূপোচ্চয়কে অনেক স্থলে জীবন্ত করিতে পারেন নাই—তাঁহার তিলোত্তমা জড় প্রতিমাই থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রাণহীন মণ্ডন-শিল্পকেও (Decorative art) সেকালে উচ্চাঙ্গের কবিত্বই মনে করা হইত।

কলানৈপুণ্যে, গঠন-সৌষ্ঠবে, ছন্দঃশ্রীসম্পাদনে, পদবিন্যাসে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। রচনায় বহিরঙ্গের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কাহারও রচনায় দেখা যায় না।

প্রার্থনার পদ ছাড়া বিদ্যাপতির কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা কোথাও নাই—কোন প্রকার মিষ্টিক ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাও কোথাও নাই। নাই বলিয়াই বোধ হয় শ্রীচৈতন্যদেব ঐগুলিকে উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রস- াধক-সম্প্রদায় ঐগুলির এত সমাদর করিয়াছিলেন। কোন প্রকার

ঐশ্বর্য্যের বা আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা থাকিলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শের মতে রসাভাসের সৃষ্টি হইত। "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি" (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)। রাধাকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গে প্রেমের গূঢ়তা, গাঢ়তা ও আত্মবিস্মরণের ব্যঞ্জনাই ঐ পদাবলীকে বৈষ্ণব-সমাজে পরমাস্বাদ্য ধন করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রাকৃত লীলা-মাধুর্য্য ছাড়া অন্য কিছুই বৈষ্ণব রসিক চাহে না। বিদ্যাপতি তাহা দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়।

কবির রূপবর্ণনা মণ্ডন-শিল্পের অন্তর্গত, প্রকৃতিবর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিক (Conventional)। উহা রাগলীলা-বৈচিত্র্যের পটভূমিকা ও আবেষ্টনী মাত্র। সম্ভোগের বর্ণনায় কবি সুরুচির পরিচয় দেন নাই—বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ ইত্যাদির বর্ণনায় আলঙ্কারিকতার কৃতিত্বই দেখাইয়াছেন—অভিসার, মান, মানভঞ্জন ইত্যাদিতে মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছেন, একথা সত্য—কিন্তু যেখানে কবি মিলনোচ্ছ্বাসের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার লেখনী রসমহোৎসবে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উল্লাসরসের এমন উন্মাদনা প্রাচীন কবিদের মধ্যে এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কোন কবির রচনায় পাওয়া যায় না। আবার কবি যখন বিরহের কথা লিখিয়াছেন—তখন মনে হয় না যে—এই বিদ্যাপতিই অলঙ্কারিকতার বৈচিত্র্য ও চাতুর্য্য সৃষ্টি করিয়া একদিন তুষ্ট ছিলেন—অথবা সম্ভোগ-বর্ণনায় আত্মবিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন। ✓

যেখানে তিনি প্রেমার্ত্ত হৃদয়ের গভীর ও গূঢ় বার্ত্তা শুনাইয়াছেন—সেখানে তাহার আবেদনের সুরও চিরন্তন প্রেম-লোক স্পর্শ করিয়াছে এবং দেশ কাল পাত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহা অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উঠিয়াছে।

কবির কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার অন্য সমস্ত বিষয়ে অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য, সুখে দুঃখে, সম্ভোগে, নৈরাশ্যে, মিলনে, বিরহে, রাগাকুলতায়, উৎকণ্ঠায় সব সময়ই

রাধার বাস্তবস্তুতে বৈরাগ্য, তাঁহার কাব্যে যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা চিত্তকে উদাস করিয়া তোলে। তখন জগৎ সংসারকে অসার ও এই জীবনকে মায়ার খেলা বলিয়া মনে হয়—চিরন্তন ধনের জন্য একটা অপূর্ব্ব তৃষ্ণায় প্রাণ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহা Mystic appeal না হইতে পারে, কিন্তু ইহার Transcendental ও Universal appealকে উপেক্ষা করা যায় না।

কবি যে সকল রচনায় মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, সেগুলিতে কোন অনির্বচনীয় রসের সৃষ্টি না হউক, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইয়াছে। Sensuousness বলিয়া ইহাকে বিদায় করা যায় না। ইহাও এক প্রকারের আর্ট। ভাষার স্বচ্ছতা, ভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অনবদ্যতা, পদ-বিন্যাসের পারিপাট্য সমস্ত মিলিয়া চিত্তে এমন একটা তৃপ্তি-সুখের সৃষ্টি করে—তাহা রসানন্দ না হউক, রূপানন্দ আখ্যা পাইতে পারে। কবি কোথাও কোন অঙ্গহানি বা অক্ষমতার দ্বারা তৃপ্তিসুখ-প্রসন্ন চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হইতে দেন নাই। যে অপূর্ব্ব লাবণ্যে চিরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত, সেই লাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়া কবি দিশেহারা হইয়া গিয়াছেন, অলঙ্কারের ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বিশ্বের প্রত্যেক মনোহর বস্তুর কথা উপমাচ্ছলে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য সকল মাধুর্য্যের মধ্যেই যেন তিনি রাধাকে দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধা বিশ্বসৌন্দর্য্যময়ী,—একটি লাবণ্যময়ী নারী মাত্র নয়।

বিদ্যাপতির রাধা অনবদ্য বনকুসুমের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। অঙ্গলাবণ্য ও বর্ণচ্ছটার গৌরবই ইহার প্রধান সম্বল নয়—মাধুর্য্য ও সৌরভই ইহার প্রধান সম্পদ্। এই মাধুরী ও সৌরভ ফুটিয়াছে—রাধার হাস্যে, লাস্যে, ভাষায়, ভূষায়, চাহনিতে, গতিভঙ্গীতে, ছলনায়, কৌতূহলে, আশায়, বৈরাগ্যে, লজ্জায়, ভয়ে, উদ্বেগে, আকুলতায়, আধগোপনে, আধপ্রকাশে, বিলাসে,

উল্লাসে, হাবভাবে এবং রসচঞ্চল কৈশোর-জীবনের নবনব ভাবরহস্যের উচ্ছল তরঙ্গ-লীলায়।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চোখে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। কিন্তু তাহা তেমন মর্ম্মঘাতী নহে। * * * বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা, আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্যে সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। * * * যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্যোবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবে মাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে। তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে, কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। "কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি। কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥"

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়। কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহলে এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়োসড়ো অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলা-চাঞ্চল্য।

বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীর-চঞ্চল সমুদ্রের

উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্য্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি, কেবলি নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য্য যে কত ছন্দে, কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা যে আত্ম বিস্মৃত ধ্যানশীলতা আছে, তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

বিদ্যাপতির পদাবলী মধুচক্রের মত—ইহার কুহরে কুহরে মাধুর্য্য। কবি ভাষার ভাণ্ডারে, ভাবলোকে, বিশ্বপ্রকৃতিতে, ধ্বনিজগতে যেখানে যত মাধুর্য্য পাইয়াছেন সমস্তই তাঁহার রচনায় চাতুর্য্যের বন্ধনীতে একত্র করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু মাধুরীর উপচয় হইয়াছে। অধিকাংশ পদে দেহ ছাড়িয়া কবির কল্পনা অতীন্দ্রিয় লোকে পৌছায় নাই—মর্ম্মের গভীর কূপেও প্রবেশ করে নাই। হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনের যে অমৃত রসিক জনের অঞ্জলিতে মহাকবিরা পরিবেষণ করেন—বিদ্যাপতি তাহাও করিতে পারেন নাই। তবু বিদ্যাপতির তুলনা নাই।

বিদ্যাপতির বর্ণিত বর্ষা-প্রকৃতি ও বসন্তশ্রী রতিরসের উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির যে একটা গূঢ় গভীর চিরন্তন সংযোগ আছে—তাহারও আভাস দিয়াছে। কবি বিরহের দিনে বসন্তকেও উপেক্ষা করিয়াছেন—কিন্তু বর্ষা-প্রকৃতির দুর্দ্দম প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

খেদব মোঞে পিক অলিকুল বারব কর কঙ্কণ ঝমকাই।
অথনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব তথমুক কওন উপাই॥

মনের যে উদাসভাব জন্মিলে মানবাত্মা দেশে দেশে যুগে যুগে বলে—পরম কাম্য ধনের সাক্ষাৎ বিনা কি করিয়া জীবন ধারণ করিব, বিদ্যাপতির বর্ষা-প্রকৃতি-চিত্রণ সে ভাব কি জাগায় না? বিদ্যাপতির রাধাহৃদয়ের হাহাকার গগনের হাহাকারের মধ্য দিয়া কি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে না?

সংস্কৃত কবিদের অনুকারক হইলেও বিদ্যাপতির আলঙ্কারিকতায় মৌলিকতাও যথেষ্ট আছে। মৌলিকতা এই হিসাবে বলিতেছি—সকল ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত কাব্য নাট্যের দাগা বুলান নাই। উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ও দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের এত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য কোন কবির কাব্যে আমরা দেখি নাই। কবি সব সময়ে চাতুর্য্যশ্রী ফলাইবার জন্যই অলঙ্কারের বীথি সাজান নাই, অনেক সময় দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির সমাবেশ রসকেই ঘনতর করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ—"সজনি কে কহ আওব মধাই" পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারিকতার কয়েকটি উদাহরণ দিই—

মালারূপক—শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

সমুচ্চয়—

(ক) হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা। বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা।
নয়নক নিঁদ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুঃখ মম পাশ।

(খ) ভাগে মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত। ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগে মিলয় ইহ প্রেম সংঘাতি। ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি॥

পরিণাম—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহ। মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার। মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥

বিনোক্তি—(ক) আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনু পাজর ঝাঁঝর ভেলা॥
(খ) সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন তনু বিনু যৌবন কী যৌবন পিয় দূরে॥

ব্যাজোক্তি—নাহিয়া উঠল তীরে রাই কমল মুখী সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নত-মুখী কৈছন হেরব বয়ান॥
তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেলাওল কহত হার টুটি গেল।
সভজন এক এক চুনি সঞ্চরু শ্যাম দরশ ধনী কেল॥

ননদী স্বরূপ নিরূপহ দোষে ইত্যাদি পদটিও ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিভাবনা—চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক দহই সব অঙ্গ মোর।

অর্থধ্বনি—
(ক) সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥
(খ) করে কর ধরি যে কিছু কহল বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি কুমুদ কয়ল কোর।
(গ) চাণূর মরদন তুঁহু বনচারী। শিরীষ কুসুম হম কমলিনী নারী॥

স্বভাবোক্তি—
আওল যৌবন শৈশব গেল। চরণক চপলতা লোচন নেল॥
করু তুহুঁ লোচন দূতক কাজ। হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাথ। সগর বচন কহ নত করি মাথ॥

কবির বসন্তবর্ণনায় ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মিলিবে।

প্রতিবস্তূপমা—
(ক) পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনী দংশি পুনহি যদি দংশয় তবহি সময় বিষ যাহ।

(খ) নিধনকা জঞো ধন কিছু হোয় করএ চাহ উছাহ।
শিয়ারকা জঞো সিঙ্গ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।
পশড়ীকা জঞো পাখা জনমএ অনল করয়ে ঝপান।
ছোটা ছোটা পানি চহচহ কর পোঠী কে নহি জান।
ষইও যকর মুহ পেচ সম দূষএ চাহএ আন।
হম তহ কে বিষহু আগর ঢোঁড়হু কাথিক ভান।
ঝরক পানি ডোভক কৌঙ্গ গরব উপজু যাহি।
ভণে বিদ্যাপতি দহক কমল তুষয় চাহএ তাহি।

অতিশয়োক্তি—

(ক) প্রথম শিরীফল গরবে গমওলহ জোগুণ গাহক আবে।
গেল যৌবন পুন পালটি না আবয় কেবল রহ পচতাবে।

(খ) মালতি সফল জীবন তোর।
তোরে বিরহে ভুবন ভময়ে ভেল মধুকর ভোর।
জাতকী কেতকী কত না আছএ সবহি রস সমান।
স্বপনেহু নহি তাহি নিহারয় মধু কি করত পান।

কণ্টক-দোষে কেতকী সঞো রুষল হঠে আএল তুয় পাশে। ইত্যাদি পদটিও ইহার দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্ত—

(ক) অধর নীরস মঝু করলনি মন্দা। রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা।

(খ) কুলকামিনী ভই নিজ পিয় বিলসে অপথে নহি যাই।
কি মালতী মধুকর উপভোগয় কিংবা লতাহি শুথাই।

যথাসংখ্য—

হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিনি হিম পিকবর বুঝ অনুমানী।
নয়ন বয়ন পরিমল গতিরুচি অও অতি সুবলনী বাণী।

নিদর্শনা—

(ক) কুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি। বাহর রতন আঁচরে দেই গাঁঠি।

(খ) যাবৎ জনম হাম তুয়া পদ না সেবিলুঁ যুবতি মতিময় মেলি।
অমৃত ত্যজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ সম্পদে বিপদহি ভেলি।

(গ) অধর সুরঙ্গ জনি নীরস পবার। কোন লুটল তুয় অমিয় ভাণ্ডার।

(ঘ) হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব-বিবাধ। তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনি করু সাধ।

ভ্রান্তিমান্—কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি—পদটি ইহার দৃষ্টান্ত।

সমাসোক্তি—মাঘমাস শিরি পঞ্চমী গজাইলি নবএ মাস পঞ্চমহু রুয়াই…
যোড়শ সপুণে বতিশ লক্ষণে জনম লেল রিতুরাই হে।

বিষমালঙ্কার—

(ক) পিয়া পরদেশ আশ তুয় পাশহি তেঁ বোলহ সখি কান।
যে প্রতিপালক সে ভেল পাবক ইথি কি বোলত আন।

(খ) কমল বদন কুবলয় দুইলোচন অধর মধুরি নিরমানে।
সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজল কিঅ দঈ হৃদয় পথানে॥ (অনুবাদ) ১

ভাবিক—অঙ্গনে আওব যব রসিয়া……বিদ্যাপতি কহ ধনি তব ধেয়ানে
ইত্যাদি পদটি ইহার দৃষ্টান্ত।

পরিবৃত্তি—কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। একএ ক্ষীণ অওকে অবলম্ব।
প্রকট হাস অব গোপত ভেল। উরজ প্রকট অব তহ্নিক গেল।
চরণ চপল গতি লোচন পাব। লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব। ২

একাবলী—

জনম হোয়য়ে জনি জঞো পুনু হই। যুবতী ভই জনময় জনু কোই।
হোইহ যুবতী জনু হো রসবতী। রসও বুঝয় জনু হো কুলবতী।

(১) ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় বেধাঃ কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥

(২) ইহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালার কবিশেখরের। কিন্তু বিদ্যাপতিরই রচনার মত।

আক্ষেপ –

পিয়াক পিরিতি হাম কহই না পার। লাখ বয়ন বিহি না দিল হামার।

যমক—

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ সারঙ্গ তসু সমাধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ কেলি করথি মধুপানে।
[সারঙ্গ—মৃগ, কোকিল, মদন, পদ্ম, ভ্রমর]

এইগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। বহু স্থলেই অলঙ্কার-সাঙ্কর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকের সহিত অন্যান্য অলঙ্কার মিশ্রিত আছে। অনেক স্থানে অতিশয়োক্তির মিশ্রণ।

মিশ্র (অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা ও যথাসংখ্য)—

বদন মেরাএ রহল মুখমণ্ডল কমল মিলল জনু চন্দা!
ভমর চকোর দুঅও অবসায়ল পীবি অমিয় মকরন্দা।

অর্থান্তরন্যাস+বিষমালঙ্কার—

দিনকর বন্ধু কমল সভে জানয়ে জল তঁহি জীবন হোয়।
পঙ্কবিহিন তনু ভানু শুখায়ত জলহি পচায়ত সোয়।
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখসম্পদ খেনে খেনে দগধই সোই।

শ্লেষাত্মক অতিশয়োক্তি—তড়িত লতা তলে জলদ সমারল
....চঞ্চরিগণ করু কোলে—ইত্যাদি

মালারূপকাত্মক উল্লেখ—

হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি। জীবক জীবন হম তুহুঁ জানি॥

সমাসোক্তিমূলক পর্য্যায়োক্তি—

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন কারী মঝু মনে লাগল ধন্ধা॥

এইগুলি ছাড়া বিদ্যাপতির পদে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি। যে কোন পদ হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনেকস্থলে কবির বক্তব্য উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারাই শুধু সফল নয়—সুস্পষ্টও হইয়াছে —যেমন—সখীশিক্ষায় শিরীষকুসুম ও ভ্রমরের বারবার উপমা দ্বারাই উপদেশ সার্থক হইয়াছে।

উৎপ্রেক্ষা—

(১) কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণহীন হিমধামা।

(২) গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত গীম গজ মোতিম হারা।
কামকম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি ঢারত সুরধুনি ধারা॥

(৩) নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা। সিন্দূর মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥

(৪) একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পরায়ল কাম॥

(৫) লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।

(৬) চিকুরে গলয়ে জলভার। মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে জলধার।

(৭) কেশ নিঙাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥

(৮) সুন্দর বদন সিন্দূর বিন্দু সামর চিকুর-ভার।
জনি রবি শশী সঙ্গহি উগল পাছু কএ অন্ধকার॥

(৯) সুরত সমাপি সুতল বর নাগর পানি পওধর আপি।
কনক শম্ভু জনু পূজি পূজারে কএল সরোরুহে ঝাঁপি।

[গেলি কামিনি গজহু গামিনি—পদটি উৎপ্রেক্ষা মালার দৃষ্টান্ত।]

(১০) মরকতস্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কষিল কনক রেহা।
(উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বস্তুধ্বনি হইয়াছে)

উপমা—

(ক) তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খনহি শুকায়ল ঐছন তোহারি সোহাগে।

(খ) তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম সুতমিত রমণী-সমাজে।

(গ) যৌবনরূপ তাবে ধরি সাজত যাবে মদন অধিকারী
দিন দশ গেলে সেহও পলায়ত সকল জগৎ পরচারী।
দিনে দিনে আগে সখি ঐছনি হোবহ ঘোষিণী ঘোরক মূলে।
(গোয়ালিনীর ঘোলের মত)

(ঘ) ক্ষীর দণ্ড দেই নিরসত পানি·········বিরহ বিয়োগ তবহু দূর গেল।

(ঙ) আঁচর পরশি পয়োধর হেরু। জলমগজু যেন ভেটল সুমেরু।

(চ) বেরি এক কর ধরি মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে জনি ঔখদ পান।

(ছ) উরে দোলে শামর বেণী। কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী।

রূপক—

(১) সে অতি নাগর তোঞে সব সার। পসরও মন্দী পেসপসার।
যৌবন নগরী বেসাহবরূপ। তাতে মূল হইহ যতে স্বরূপ॥

(২) দ্বিজপিক লেখক মসি মকরন্দা। কাঁপ ভ্রমর পদ সাখী চন্দা॥

(৩) পানি পলব গত অধর বিম্বরত দশন দালিম বীজ তোরে।
কীর দূর গেল পাশ ন আবয় ভৌঁহ ধনুকি কে ভোরে।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত—পদটি সাঙ্গরূপকের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'আলিপন দেওব মোতিম হার······অভিষেকে' পর্যন্ত ও 'হরি ঘর আওব গোকুলপুর'—পদের অংশটিও একটি দৃষ্টান্ত।

কবি রাধিকার রূপবর্ণনায় বহু বার ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমেয় রাধার অঙ্গের তুলনায় উপমানের অপকর্ষ দেখাইবার জন্য কবি নানা ছল-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নায়িকার রূপ-বর্ণনায় উপমেয় উপমানকে জয় করিতেছে,—এইরূপ অত্যুক্তি চির প্রচলিত প্রথা।

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি চললিহু সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড হেমমঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা।
উরুযুগ কদলী করিবর-কর জিনি স্থলপঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম বিজ ইন্দু রতন জিনি পিকু জিনি অমিয়া বাণী।

[এই দীর্ঘ পদটি রীতিমত উপমানের তালিকা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত]

কবি তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপজ্যোতির ভয়ে উপমানগুলিকে পলাতক করিয়াছেন।

কবরী ভয়ে চমরী গিরি কন্দরে মুখ ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিনি নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল গতিভয়ে গজ বনবাস॥

ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া কবি উপমানগুলিকে একত্র সন্নিবেশ করিয়া রাধার অঙ্গশ্রীর আভাস দিয়াছেন। এইরূপ উপমান-বিন্যাসকে প্রথমোক্তি অলঙ্কার বলে।

পল্লব রাজ চরণ যুগ শোভিত গতি গজরাজক ভাণে।
কনক কদলী পর সিংহ সমারল তাপর মেরু সমানে।
মেরু উপর দুই কমল ফুটায়ল নাল বিনা রুচি পাই।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি তঁই নহি কমল শুখাই।

আবার রাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ—

বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ। তাপর কীর থির করু বাস।
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়। তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর।

পরবর্তী কবিদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া

প্রসঙ্গান্তরে 'কদলী উপরে কেশরী দেখল কেশরী যেক চড়লা' * ইত্যাদি আছে। রাধার বদনের সহিত চন্দ্রের উপমা দিতে গিয়া কবি রাধাকে চন্দ্রাপহারিকা বলিয়াছেন। কবি রাধাকে বলিতেছেন—রাজা চুরি ধরিবার জন্ত লোক লাগাইয়াছেন,— আঁচলে বদন ঝাঁপায়হ গোরি। রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি। উপমা দিয়া আরম্ভ করিয়া কবি 'ব্যতিরেকে' শেষ করিয়াছেন—"ভয় নাই, প্রহরীকে বলিও—গগনের চাঁদ কলঙ্কী, এ চাঁদ সে চাঁদ নয়, এ চাঁদ নিষ্কলঙ্ক।"

কবি অঙ্গের উপমানগুলিকে প্রাধান্ত দিয়া স্থলে স্থলে চমৎকার অর্থধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে উপমেয় গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। উপমানের উৎকর্ষই ধ্বনিত হইয়াছে।

(১) এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনি তাক উপরে ধরি হাত॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়। তুয়া হার নাগিনি কাটব মোয়॥
(২) পাণি পলব গত অধর বিম্বরত দশন দালিম বীজ তোরে।
কীর দূরে ভেল পাশ ন আবয় ভৌহ ধনুকি কে ভোরে।

রাধার অঙ্গ-বিশেষের উপমা যোগাইতে বিদ্যাপতি জড় জীব কিছুই বাকি রাখেন নাই,—বদরী, নারঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দাড়িম্ব, বেল, তাল, চকেবা (চক্রবাক), কনক কটোরা, স্বর্ণকুম্ভ, গজকুম্ভ পর্যান্ত (বেল তাল যুগ হেমকলস গিরি কটোর জিনিয়া কুচ সাজা। কিয়ে গিরিবর কনয়া কটোরে তা দেখি লাগয়ে ধন্ধ)। তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া কবি স্বয়ং শম্ভুকে টানিয়াছেন। শম্ভুর উপর সুরধুনীধারা ঢালিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। শ্রীকৃষ্ণের করসরোরুহে পূজিত বলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। তাহাকে নখক্ষতের দ্বারা চন্দ্রচূড় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। (হিয়ার উপরে শম্ভু পূজিত বেড়িয়া বালক চন্দ্র)। কেহ কেহ বলেন—ইহাতে গঙ্গাধরের অমর্য্যাদা হয় নাই, পয়োধরেরই শুচিতা জ্ঞোতিত হইয়াছে।

এক একটি অঙ্গের লাবণ্য যেন বিশ্বপ্রকৃতির এক একজনের নিকট হইতে পাইয়া রাধা 'তিলে তিলে উত্তমা' হইয়াছিলেন। প্রিয় যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—তখন রাধার দেহে আর সে লাবণ্য থাকিল না। কবি কৌশলে সে কথা বলিয়াছেন, উপমানকে উপমেয়ের গৃহীত দান প্রত্যর্পণ করিয়া। রাধা বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতেছেন—

শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক হরিণক লোচন-লীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোপল পায়ে মনোভব পীলা॥
দশনদশা দাড়িবকে সোপলক বন্ধুকে অধর রুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোপলক কাজর সম সখি ভেলি।

কবি অনেক স্থলে দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, প্রতিবস্তূপমা ও অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের সাহায্যে (Epigram ও Maxim জাতীয়) সুভাষিতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—মৌলিক সমাশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিলেও সেগুলি হীনপ্রাণ বা প্রাণহীন হয় না। যেমন—

১। সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দহইতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল।
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত। যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
২। গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি যত তুহুঁ করবি বিচার।
৩। সুজনক পীরিতি পাষাণক রেহা।
৪। মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ। ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূলে নিবাস।
৫। তিল তিল আধ যৌবন রাখবি বহই দিবস সব যাব।
ভালমন্দ দুই সঙ্গে চলি যাওব পর উপকার সে লাভ।
৬। কুকুরক লাঙ্গুড় নহত সমান। ৭। আশাভঙ্গ দুখ মরণ সমান।
৮। চৌরি পিরিতি হয়ে লাখগুণ রঙ্গ। ৯। ভমরা ভরে মঁাজরী ন ভাঁগে।
১০। বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ
১১। সব সঞো বড় থিক আঁখিক লাজ

১২। নিধনেকা জঞো ধন কিছু হো করএ চাহ উছাহ।
শিয়ার কা জঞো সিজ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।

১৩। কৌড়ি পঠওলে পাব নাহি ঘোর। ঘীব উধার মাগ মতিভোর।
বাস না পাবএ মাগ উপাতি। লোভক রাশি পুরুষ থিক জাতি।

১৪। সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক কি করব লোচনহীনে।
কি করব তপজপ দান ব্রতাদিক যদি করুণা নহি দীনে।

১৫। ন থির জীবন ন থির যৌবন ন থির এ সংসার।
গেল অবসর পুনু না পাইঅ কীরিতি অমর সার।

১৬। থির নহি যৌবন থির নহি দেহ। থির নহি রহয় বালভূ সঞো নেহ।
থির জনু জানহ ইহসংসার। একমাত্র থির রহ পর উপকার।

১৭। জলমধে কমল গগনমধে সূর। আঁতর চাঁদ কুমুদ কত দূর।
গগন গরজ মেহ শিখর ময়ূর। কতজন জানসি নেহ কতদূর।(অনুবাদ)

১৮। সহজে চাতক না ছাড়য় বরত না বৈসে নদী-তীরে।
নবজলধর বরিখন বিনু ন পিয়ে তাহারি নীরে।
যদি দৈববশে অধিক পিয়াস পিবয় হেরয় থোর।
তবহুঁ তোহর নাম সুমরি গলে শতগুণ লোর॥

১৯। পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনী দংশি পুন যদি দংশয় তবহি সময় বিষ যাহ।

২০। পিতল কাটারি কামে নাহি আওল উপরহি ঝকমকি সার।

বিদ্যাপতি সাধারণতঃ চাতুর্য্যের কবি। সাধারণ অলঙ্কার-প্রয়োগ ও ব্যঞ্জনা-ধ্বনির সাহায্যেই তিনি এই চাতুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুইএক স্থলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। আঁচরে বদন ঝাঁপাওহ গোরি—পদটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত—পদটিও আর একটি দৃষ্টান্ত। কবির বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার পদ দুইটি খুবই প্রসিদ্ধ। এই দুটি পদ

চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 'চৌরি পিরিতি' লইয়া বিদ্যাপতি চাতুর্য্যের সহিত কত রঙ্গই না করিয়াছেন—শাম ঘুমায়ত কোরে আগোরি। তহিঁ রতি চৌট পীঠ রহুঁ চোরি—পদটি লক্ষ্য করিতে বলি। জয়দেবের ভাবানুসরণে রচিত নিম্নলিখিত পদটী অপূর্ব্ব চাতুর্য্যের দৃষ্টান্ত—

কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর হুঁ বর নারি।
নাহি জটা ইহ বেণি বিভঙ্গ। মালতি মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু।
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার। নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলি কমল ইহ না হয়ে কপাল।
বিদ্যাপতি কহে এহেন সুছন্দ। অঙ্গে ভসম নহে মলয়জপঙ্ক॥

চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সংযোগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করি—

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়। অরু এক কৌতুক কহনে না হোয়।
একলি আছহুঁ ঘরে হীন পরিধান। অলখিতে আওল কমল নয়ান।
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস। ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ।
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়। মলয় শিখর জনু হিমে না লুকায়।
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ। আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই। চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই।

সম্পূর্ণ মাধুর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পদেরও বিদ্যাপতিতে অভাব নাই। দুই একটির উদাহরণ দিই। আক্ষেপানুরাগের পদ—

অগোর চন্দন তনু অনুলেপন কো কহে শীতল চন্দা।
পিয়া বিনে সো পুন আনল বরিখয়ে বিপদে চিনিয়ে ভালো মন্দা।
সজনি—কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেমবীজ অঙ্কুরে মোড়লি বাঢ়ব কওন উপায়।

তৈল বিন্দু যৈছে পানি পসারল তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খণহি শুখায়ল ঐছন তোহারি সোহাগে।
কুলকামিনি ছিলুঁ কুলটা ভৈ গেলুঁ তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়লুঁ কানুসে প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণি জনু মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল সো ফল ভুঁজইতে চাই।
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ দিবস দিবস করি মাস।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ ছোড়লুঁ জীবনক আশ।
বরিখ বরিখ করি জনম গোঙায়লুঁ জরা আরত তনুপাশে।
হিম গরল জনু হিমগিরি বরিখয়ে কি করব মাধবি মাসে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ রীতি চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষ আপহি ভুঞ্জই যো জন পরবশ হোই।

যিনি লিখিয়াছেন—

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে অবধি রহল দুই বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিকজন—সোঁপল তোহারি নয়ানে॥

তিনিই আবার লিখিয়াছেন—

নারীর দীঘ নিশাস পড়ুক তাহার পাশ মোর পিয়া যার কাছে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাউ সবদুখ কহোঁ তছু পাশে।

প্রথম অংশ পড়িয়া বিদ্যাপতিকে সংস্কৃত কবিদের অনুকারক মাত্র মনে হয়, দ্বিতীয় অংশেই তিনি প্রকৃত কবি।

কবি বৃন্দাবনের ক্ষণিক বিরহে ও মানজনিত বিরহে প্রচলিত রীতি কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করিয়াছেন—কিন্তু মাথুর বিরহে আর কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ করেন নাই। এই বিরহেই বিদ্যাপতির প্রকৃত কবিত্ব বিকসিত হইয়াছে। এখন আর—"সজল নলিনী দল শেজ বিছাইঅ পরশে বা

অসিলাএ। চন্দনে নহি হিত চান্দ বিপরীত করব কওন উপাএ।' কিংবা—

মধুর মধুর পিক রব তরু তরুসব কর কর লতিকা সঙ্গ।
ঐসন শোহাওন সুরভি সময় বন পুনমতী রচ রতি-রঙ্গ।
দখিণ পবন বহ শীতল সবহু তহ মলয়জ রজ লয় আব।
কত ন যুবতীমন মনসিজ নহি হন সবে কর রস পরথাব।

—এই সকল উক্তির দ্বারা বিরহগীতি মামুলী আক্ষেপেই পর্য্যবসিত হয় নাই। এ বিরহ সকল Convention ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। যাহার সঙ্গে অন্তর ঘটিবে বলিয়া 'চুয়া চন্দন হার' ও বর্জ্জিত হইয়াছিল, পুলক-সঞ্চারও যাহার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের দূরত্ব ঘটাইবে বলিয়া ভয় হইত—সে আজ "নদীগিরি অন্তরে" চলিয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে নয়ানের নিদ, বয়ানের হাস ও সকল সুখ চলিয়া গিয়াছে। আজ পিয়া বিনা পাজর ঝাঁঝর ভেলা। কঙ্কণবলয়া গলিত দুহুঁ হাত। বসন্ত-সমাগমে রাধার বুক চিরিয়া হাহাকার উঠিয়াছে—

অনিমেখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।
ঈ সুখ সময়ে সহয় এত সঙ্কট অবলা কঠিন পরাণ রে।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিম-কমলিনী জনু না জানি কি জীব পরিযন্ত রে।
বিদ্যাপতি কহ ধিকধিক জীবন মাধব নিকরুণ অন্তরে।

* * *

এখন তখন করি দিবস গমাওল দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গমাওল ছোড়ল জীবনক আশা।
বরস বরস করি সময় গমাওল খোয়ল তনুক আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে।

* * *

সরসিজে বিনু সর সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সুরে।
যৌবন বিনু তন তনু বিনু যৌবন কী যৌবন পিয় দূরে।

চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম নীরসি মাঁজরি পীবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহকুহু কহ বিরহিণী কৈসে জীবই।

* * *

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর তোড়হ গজমোতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙারে যামুন সলিলে সব ডার রে।

* * *

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখলব ভৈ গেল নিরাশা।

* * *

সুরসরি তীরে শরীর তেজব সাধব মনক সিধি।
তুলহ পহু মোর সুলহ হোয়ব অনুকূল হোয়ব বিধি।

সখীরা বলেন—দেহত্যাগ করিবে কেন? সে সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে, দর্শনের সাধ ত রহিয়াছে "সময় বশে মধু না মিলয় সজনি সৌরভ কে করে বাধ?" ঐ স্মৃতির সৌরভটুকু সম্বল করিয়া 'তন্তক দোসর দেহে' শ্রীমতী বাঁচিয়া রহিলেন—প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়। "অঙ্গুলক অঙ্গুটী সে ভেল বাহুটি হার ভেল অতিভার।"

"কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল। লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল।"

সখীরা শ্রীমতীর দশা দেখিয়া বলিতেছে—

ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত পুনহি উঠয় না পারা।
সহজই বিরহিনী জগমাহা তাপিনী বৈরী মদন শর-ধারা।
অরুণ নয়ন লোরে তিতল কলেবর বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহর করইতে সংশয় সহচরী গণতহি শেষা।

শ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন—

কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনি তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিনদিন ফল তরুণিত ভেল সজনি অহখন না কর গেয়ান।

কহও পিশুন শত অবগুণ সজনি তনি সম মোহি নহি আন।
কতেক যতন সোঁ মেটিয় সজনি মেটয় ন রেখ পষাণ।
যে দুরজন কটু ভাষয় সজনি মোর মন না হোয় বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনি হরিণ ন তেজ হিম-ধাম॥
যইও তরনী জল শোষয় সজনি কমল না তেজয় পাক।
যে জনি রতল যাহি সোঁ সজনি কি করত বিধি ভই বাঁক॥
প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি পহু তেজি গেলাহ বিদেশ।
কত হম ধৈরয বাঁধব সজনি তনি বিনু সহব কলেশ।

আবার বর্ষা আসিল—

আওন অবধি অতীত ভেল সজনি জলধর ছপল দিনেশ।
শিশির বসন্ত উষম ভেল সজনি পাউষ লেল পরবেশ।

* * *

বরিষয় লাগল গরজি পয়োধর ধরণী দন্তুদি ভেলি
নবী নাগরী রত পরদেশ বল্লভ আওত আশা দূর গেলি।

'ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী'—বিরহিণী কি করিয়া বাঁচিবে? 'যৌবন ভেল বন বিরহ হুতাশন।' রাধা বলেন—কোকিলকে না হয় কর কঙ্কণের ঝঙ্কারে তাড়াইতে পারি, ধবল গিরি হইতে তাহার বর্ণ গায়ে মাখিয়া মেঘ আসিতেছে —তাহাকে কি করিয়া নিবারণ করিবু? বেয়াজ কইয়ে পিয়া পরদেশ গেল—সত্বর ফিরিবে বলিয়া—আমি "নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লিখি লিখি। নয়ন আন্ধায়লুঁ পিয়া পথ পেখি।"

গাবই সব মধু মাস। তনু দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সাদৃশ চাঁদ চন্দন মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু মত্ত মধুকর মধুর মঙ্গল গাবই।
নব—মঞ্জু বঞ্জুল পুঞ্জ রঞ্জিত চুত কানন সোহই.

রস—লোল কোকিল কোকিলা কুল কাকলী মন মোহই।
মোহই মাধবি মাস। চৌদিকে কুসুম বিকাশ।
বি—কাশ হাস বিলাস সুললিত কমলিনী রস জৃম্ভিতা।
মধু—পান চঞ্চল চঞ্চরিকুল পদ্মিনী মুখ চুম্বিতা!
নব—মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিসে সজ্জিতা।
হম সে পাপিনি বিরহ তাপিনি সকল সুখ পরিবঞ্চিতা।
বঞ্চিত রহ নিশি বাস। ভৈগেল জৈঠহি মাস।
মাস ইহ রহ যাক পয় পহু সোই সুলখিনী কামিনী।
কতয়ে সুখ সম্ভোগ বঞ্চয় চাঁদ উজোর যামিনী।
দহই দাছুরি দিনহি বঞ্চয় কেলি করয় সরোবরে।
পেম পেসলি পুরুষ পেয়সি পেখি তাপিত অন্তরে।
অন্তরে আওয়ে আষাঢ়। বিরহিণী বেদন বাঢ়।
বাঢ় ফুল্লিত বল্লি তরু বর চারু চৌদিশে সঞ্চরে।
তাপে তাপিত ধরনি মঞ্জরি নিরখি নব নব জলধরে।
পপীহা পাখিয় পিয়াসে পীড়িত সঘনে পিউ পিউ রাবিয়া।
পিক—নাদ শুনি চিত চমকি উঠয় পিয়া সে পেখি না পাপীয়া॥ *

কবি বলিয়াছেন—এই ভাবে শ্যাম নাম জপ করিতে করিতে রাধার শ্যামের সহিত অভেদ জ্ঞান জন্মিল।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেল মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাব হি বিসরল অপনগুণ অনুধাই।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর জীবইতে ভেলি সন্দেহা।

* ইহা বিদ্যাপতি-রচিত বারমাস্যার চারি মাসের বর্ণনা। পদকল্পতরুতে যে বারো মাসের বর্ণনা আছে—তাহার বাকি মাসগুলি দুই গোবিন্দদাসের। নগেনবাবু বলেন,—সবটাই বিদ্যাপতির। যাহাই হউক, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব সাহিত্যে বারমাস্যা-রচনার প্রবর্ত্তক।

শ্রীমতীর এমনই তদ্‌গতভাব জন্মিল যে, নিজেকেই মাধব মনে করিতে লাগিলেন। নগেনবাবু বলিয়াছেন—"ইহা সমাধির অবস্থা, দ্বৈতভাবের পরিবর্ত্তে অদ্বৈতভাব, ভেদাভেদজ্ঞানের তিরোভাব।" তাহা হইলে ইহাই শ্রীমতীর সান্ত্বনা হইতে পারিত, কিন্তু কবি বলিতেছেন—'বাঢ়ত বিরহক বাধা।' দশ দিশ দারু দহনে দগধই আকুল কীট-পরাণ। কীট কথাটি ব্যবহারের কি কোন সার্থকতা নাই? আমরা একথাও বলিতে পারি—বিদ্যাপতি যাহা রাধার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—তাহা শ্রীচৈতন্যের জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

কেবল এই কথাটি কেন—বিদ্যাপতির পদের অনেকস্থলেই এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া যাইতে পারে।

যইঅও সরোবর হিমকর নিজ করে পরশয় সবহু সমানে।
কুমুদিনী কাঁ শশী শশীকাঁ কুমুদিনী জীবন কে নহি জানে।

বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার সম্পর্কের কথা এখানে বলা হইয়াছে। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গ পরম প্রেমের মধ্যে কোথায় নিমগ্ন হইয়া যায়।

মোটের উপর, বিদ্যাপতির পদাবলীর ব্যাখ্যা দেশ, কাল বিশেষতঃ পাত্রের উপরই নির্ভর করিতেছে। সমস্ত পদকেই নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের বাণীরূপ মনে করিলেও কেহ দোষ দিতে পারে না—কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত নাই। বিরহের কবিতাগুলিকে যে কোন অনুরাগিণী প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। আবার ভক্তের কাছে এই পদাবলীর অর্থ স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব সেজন্য এই পদগুলি শুনিতে শুনিতে ভাবে তন্ময় হইতেন। রাধাশ্যামের ভাগবত স্বরূপই সাধারণ পাঠকেরও মনে আধ্যাত্মিক অর্থ স্বতই প্রবুদ্ধ করে। শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনলীলার দ্বারা এইগুলিতে যে অর্থ আরোপ করিয়াছেন—তাহাই বা আমরা ভুলি কি করিয়া?

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাধা হয় অনঙ্গলীলার আতিশয্য। এমন কি বিরহের রসঘন পদগুলিতেও 'কাম তুরঙ্গের' উল্লেখ বারবারই আছে। এ বাধা বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্ত রসজ্ঞের পক্ষে উত্তরণ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যুগে প্রেম ও কামকে পৃথক করিয়া দেখা হইত না—কামলীলাকে প্রেমলীলার অঙ্গস্বরূপই মনে করা হইত। প্রেমকে abstraction হইতে রক্ষার জন্য কামলীলায় তাহাকে প্রাকৃতরূপ দেওয়া হইত। ইহাকে কবি-পদ্ধতি বলিয়া মনে করিয়া লওয়াও যাইতে পারে। যে লীলাই হউক—বিরহই যেখানে সমস্তকে গ্রাস করিতেছে, তখন সমস্তটাই বেদনা এবং তজ্জনিত বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে অভিরঞ্জিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতির 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম' ও 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' এই পদ দুটি অন্য পদগুলিরও লোকাতীত ব্যঞ্জনারই ইঙ্গিত করে।

কবির ভাব-সম্মিলনের পদগুলি মিলনানন্দের পদ। কিন্তু প্রাকৃত মিলনের পদগুলির সহিত ইহার ঢের প্রভেদ। একটা অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা যেন এইগুলিতে বিদ্যমান। শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরহের তপস্যায় তাঁহার প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য অন্তর্লোকে লাভ করিয়াছেন—আর তাঁহার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, লোকভয়, বিরহের ভয়ও সর্ব্ববিধ লজ্জা দ্বিধা জয় করিবার চেষ্টা বা মানসিক দ্বন্দ্ব যেন কিছুই নাই। তিনি যেন শান্ত সমাহিত চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন মদনের পাঁচ বাণ লাখ বাণই হউক, আর লক্ষ কোকিলই ডাকুক, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না।

প্রেমের ঠাকুর পরম তৃষ্ণা জাগাইবার জন্য অহৈতুকী করুণা করেন একবার, তারপর অন্তর্হিত হ'ন—তারপর ঐ তৃষ্ণা সাধনায় প্রণোদিত করে—তপস্যায় মগ্ন করায়। এই সাধনা ও তপস্যার দ্বারাই তাঁহাকে

চির দিনের জন্ম পাওয়া যায়। বিনা সাধনায় ঐহিক বা দৈহিক ভোগাত্তিশয্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে হারাইতে হয়, তাহা চিরদিনের ধন হইয়া থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই আছে। শ্রীমতীর নিদারুণ বিরহকে তপস্যা মনে করিয়া ভাবসম্মিলনের যদি এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়—তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। তপস্যার অনলে দৈহিকতা ধ্বংস পাইলে বিদেহ প্রেম ভাবসম্মিলনের দিব্যানন্দে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

সাধারণ কাব্য-বিচারের দিক হইতে ইহা স্বপ্ন সুখ ও তন্ময় স্মরণ-মননের দ্বারা কল্পনায় মিলনানন্দ উপভোগ। মনস্তত্ত্বের সহিত এই ভাবেরও যোগ আছে। প্রাকৃত জীবনে এই ভাবাকুলতা সাময়িক,—কাব্যে তাহাকে চিরন্তন বলিয়া ধরা হইয়াছে রসসৃষ্টির জন্য।

লালসার পঙ্কে জন্ম যে মৃণালের, সেই মৃণালেই ফুটিয়া উঠে কামনাময় প্রেমের পঙ্কজ। তাহার স্বর্গীয় সৌরভটুকু পঙ্কজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুক্ষণের জন্যও ভাবের মলয়ানিলকে আশ্রয় করে। কবি এই বিদেহ ভাব-সৌরভকে কবিতায় চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছেন।

বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ রচনা করেন নাই। বাল্যলীলায় কবিত্বের অবসর অল্প। যশোদার মধুর বাৎসল্যের ভাবটি বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ। বিদ্যাপতি মুগ্ধা নায়িকার বর্ণনায় সংস্কৃত কবিদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। নবোঢ়া বালাবধূর কিলকিঞ্চিত ভাবও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অনুসরণে ফুটাইয়াছেন। এ বিষয়ে মৌলিকতা তাঁহার নাই। এ বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন আমাদের চণ্ডীদাস। পূর্ব্বরাগের মাধুর্য্যও বিদ্যাপতির পদাবলী অপেক্ষা বঙ্গীয় কবির পদে অধিকতর ফুটিয়াছে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনার চাতুর্য্যে ও মাধুর্য্য দুইই অতুলনীয়।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগে বংশীধ্বনির মাদকতা নাই—শুধু রূপেরই মোহনতা।

"সুরপতি পায়ে লোচন মাগঞো গরুড় মাগঞো পাখি। নন্দেরি নন্দন সঞে দেখি আবঞো মন মনোরথ রাখি।" "দাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ পরিজন বামহি আধ। আধ নয়ন কোণে যব হরি পেখল তাহি ভেল এত পরমাদ।"

এ সকল চরণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রূপানুরাগের ক্রমবিকাশও আছে—

"একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়। অরু দিন নাম ধরে মুরলী বাজায়।
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস। না জানিয় গোকুল ককর বিলাস।
পরিচয় নহি দেখি আন কাজ। না করয় সম্ভ্রম না করয় লাজ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি অজস্র উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সমুচ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি পংক্তিতে রাধিকার রূপের দুর্নিবার প্রভাব যেমন ফুটিয়াছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

১। মেঘমালা সঞে তড়িৎলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।

২। নব জলধর বিজুরি রেহা দন্দ (দ্বন্দ্ব) পসারিয়া গেলি।

শ্রীমতীর স্নানান্ত-রূপ ফুটাইয়া বিদ্যাপতি রাগ-সাহিত্যে ও চিত্রশিল্পে একটি নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন। 'তনুস্থগ বসন তনু হিয়লাগি। যো পুরুখ দেখত তারক ভাগি।' বিদ্যাপতি যে রসের কবিতা রচনা করিয়াছেন—সে রসের পক্ষে এই চিত্র অপূর্ব্ব। যে পদে ইহা রসের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সে পদ লোচনেরই হউক আর চণ্ডীদাসেরই হউক,—বাঙ্গালী কবিরই কৃতিত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে অতিরিক্ত অলঙ্কারের ঘটায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্তি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। অবশ্য কামার্ত্তি ফুটাইতে কবি ক্রটী করেন নাই। কামার্ত্তির আভিজাত্য সম্পাদনের জন্যই এত বেশি আভরণ অলঙ্কারের সাহায্য লইতে হইয়াছিল—নিরাভরণ হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটিত।

প্রথম সম্ভোগের বর্ণনায়—বালা মুগ্ধা নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রথম রস মিলনে কবি অলঙ্কার দিয়াও গ্রাম্যতা আচ্ছন্ন করিতে পারেন নাই—বোধহয়

আচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছাও কবির ছিল না। কবি হয়ত ভাবিয়াছেন—পঙ্কজের ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া পঙ্কপ্রোথিত মৃণালের পরিচয়টা অপরিহার্য্য।

খণ্ডিতা নায়িকার রোষ, মান, মানভঙ্গ ইত্যাদি প্রকরণে যে পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল কবি তাহাই কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করিয়াছেন। এই পর্য্যায়ের পদগুলির মধ্যে সখীর উক্তিগুলিতে বিদ্যাপতির মৌলিকতা পরিস্ফুট। মানিনী রাধার আক্ষেপোক্তির পদগুলিতে কবি অনেক সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা, মানব-জীবনের বহু ভুল ভ্রান্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে প্রকৃত সজ্জনের লক্ষণ কি, প্রকৃত বিদগ্ধজনের ধর্ম্ম কি, রাধার আক্ষেপচ্ছলে কবি তাহা বিবৃত করিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে বৈরাগ্যের উদ্দীপক শান্ত রসের ধারা প্রবাহিত।

এই সঙ্গে রাধার অনুতাপের পদও কয়েকটি আছে। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহের পদগুলিকে স্মরণ করায়। বিদ্যাপতির মানভঞ্জনের পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইতে আবেদন অলঙ্কারের ঝঙ্কারে নিমগ্ন—রাধার পক্ষের আবেদনই মর্ম্মস্পর্শী। বিদ্যাপতি পুরুষবেশে শ্রীরাধিকাকে অভিসারিকা করিয়াছেন—আবার শ্যামকে মানভঞ্জনের জন্য গোপীবেশ পরাইয়াছেন। বিদ্যাপতির "যামিনী ঘোর আঁধিয়ার। মনমথ হিয় উজিয়ার।" অপেক্ষা শেখরের 'অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাশ' এক ধাপ উচ্চ স্তরের কথা।

অভিসার প্রকরণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিদ্যাপতি পাইয়াছেন। নারীর পক্ষে দুর্গপথ দিয়া বনপ্রান্তর পার হইয়া নায়কের সঙ্কেত-স্থানে গমন স্বাভাবিক নয়। তবু কবিরা মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্য ও প্রেমের আহ্বানের দুর্নিবারতা দেখাইবার জন্য নারীকে অভিসারিকা করিয়াছেন। বোধহয়—নদীধারার দুর্গমপথে উদ্দাম বেগ মহাসিন্ধুর পানে অভিযাত্রা এই কল্পনায় সাহায্য করিয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি প্রচলিত প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।

রজনী কাজর বম ভীমভুজঙ্গম কুলিস পড়য় দুরবার।
গরজতরজ মন রোষে বরষি ঘন সংশয় পড় অভিসার।

বর্ষার ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই অভিসার,—এমন কি জ্যোৎস্নালোকে অভিসারের কথা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। ইহাতে নারীর পক্ষে যথেষ্ট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়। বিদ্যাপতি পুরুষবেশে অভিসার করাইয়া নায়িকাকে প্রগল্‌ভতর। করাইয়াছেন।

এই অভিসার বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্য সার্থকতা (Interpretation) লাভ করিয়াছে। ইহা পরম ইষ্টধনের আকর্ষণে ভক্তের অভিযান, এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে অভিসার-পথকে অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তোলা হইয়াছে এবং অভিসারের বৈচিত্র্যও ইহাতে বাড়িয়া গিয়াছে। গভীর শীতের অভিসার, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কালের অভিসার (তপনক তাপে তপত ভেল মহিতল তাতল বালুকা দহন সমান ইত্যাদি) ইত্যাদিও বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বানকে দুর্নিবার বলিয়া বুঝাইবার জন্যই কবিগণ শ্রীমতীর অভিসার-পথকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন। এই অভিসার—বংশীধ্বনি শুনিয়া কুলশীল, সমাজ-সংস্কার ও সংসার বন্ধনের পিঞ্জরে আবদ্ধ হরিণীর লোকালয় হইতে অতিদুর্গম পথে গভীর অরণ্যের দিকে অভিযান।

বিদ্যাপতির ভাষা, ছন্দ, ভঙ্গী, বৃন্দাবন-লীলার পর্য্যায়-বিভাগ—সমস্তই বৈষ্ণব কবিগণ অনুকরণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি সে-জন্য কবিগুরু। বাঙ্গালী কবিরা গীতগোবিন্দ হইতে অনেক বাগ্‌ভঙ্গী পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছদ্মবেশ-ধারণের রসবস্তুর প্রবর্ত্তক বোধ হয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির ব্যবহৃত বহু অলঙ্কারও বৈষ্ণব কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের রসকলহ বিদ্যাপতির রসকলহের (গোবে চরাবএ গোকুল মাঝ। গোপক সঙ্গম কর পরিহাস ইত্যাদি) পদকে স্মরণ করায়।

পদের মধ্যকার অনেক বাক্যও বাঙ্গালী কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন। —যেমন—বিদ্যাপতির—"আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী।" এই পংক্তিরই রূপান্তর—'আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে। মরমে পিরিতি বেকত অঙ্গে'—জ্ঞানদাস। 'গাঁঠিক হেম বদনমাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি'—গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির 'অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি'—বাক্যের রূপান্তর 'অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল।' (জ্ঞানদাস)। বিদ্যাপতির 'সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু···আঁধিয়ারের' ভাব চণ্ডীদাসের "কপালে ললিত চাঁদ সে শোভিত" ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির "চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছপাই"—চণ্ডীদাসের পদে "চোরের মায়ে যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে"—এই রূপ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির—"সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হোয়ব কান॥ কানু হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা"—এই অংশ চণ্ডীদাসের একটি চমৎকার পদে পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি লিখিলেন 'রোগী করয়ে জনু ঔখদপান'; ভারতচন্দ্র লিখিলেন— 'রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।' বিদ্যাপতি লিখিলেন—"মন্ত্র না শুনয়ে জনু বালভুজঙ্গ।" নিধুবাবু লিখিলেন "ভুজঙ্গ শিশু যেমন মন্ত্রৌষধি মানে না।" বিদ্যাপতি লিখিলেন, "কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি।" রামবসু লিখিলেন —"হর নই হে আমি যুবতী। কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি"—ইত্যাদি

বিদ্যাপতি দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ কোথাও ধরিয়াছেন—কোথাও ধরেন নাই। যেখানে যে সুবিধা হইয়াছে—সেই সুবিধাই গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কোন কোন পদের নির্দোষ পারিপাট্য দেখিলে মনে হয়, তিনি ছন্দের নিয়ম সতর্ক ভাবেই মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁহার পদসংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে ছন্দের অসংখ্য ত্রুটী দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এইগুলি আঁখরিয়া ও কীর্ত্তনিয়াদের দোষেই ঘটিয়াছে। নগেনবাবুর সম্পাদিত পুস্তকে ছন্দের

দোষ খুব বেশী দেখা যায়। প্রচলিত পদগুলিকে মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংগ্রাহকগণের নিজেদের যদি ছন্দ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ঠিক পাঠটি ধরিতে পারিতেন।

বিদ্যাপতির ভাষা অনুপ্রাসে ঋদ্ধ। তিনি তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যদের মত বৃত্ত্যনুপ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন না—ছেকানুপ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাপতির অনুপ্রাস প্রয়োগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—'জোরি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ। দাম চম্পকে কাম পূজল যৈছে শারদ চন্দ।' যমক-মূলক অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে আছে। যেমন—

"শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কাজলে সাজল মদন-সন্দেশ।
জাতকী কেতকী কুসুম-নিবাস। তাদেখি মনমথ উপজল হাস॥"

বিদ্যাপতির ছন্দ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন। বাঙ্গালায় যাঁহারা ব্রজবুলিতে লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত ও গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত ছন্দগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এসকল ছন্দের লক্ষণ প্রাকৃত পিঙ্গল সূত্রে দেওয়া আছে। বিদ্যাপতির প্রধান ছন্দ পজ্ঝটিকা। এই ছন্দ হইতেই পয়ারের জন্ম হইয়াছে। **পজ্ঝটিকা**—

৪+৪+৪+৩—দিনে দিনে। উন্নত। পয়োধর। পীণ।
বাঢ়ল। নিতম্ব। মাঝ ভেল। খীণ॥

উল্লিখিত শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৪+৪+৪+৪—অধর নি। রস মধু। করলহি। মন্দা।
রাহু গ। রাসি নিশি। তেজল। চন্দা॥

মিশ্র পজ্ঝটিকা—

(১) ৪+৪+৪—চিকুরে গ। লয় জল। ধারা।
(২) ৪+৪+৪+৪—জনি মুখ-। শশী ডরে। রোয় অন্। ধারা।

প্রাকৃত **তরহট্টা** ও **বৃত্ত নরেন্দ্রের** মিশ্রণ। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে উপজাতির মত। শেষ পর্ব্বে ২—৩—৪ মাত্রা থাকিতে পারে। ১ম দুইপর্ব্বে মাত্রা ৮+৮, কিংবা ৭+৯ দুইই হইতে পারে।

৮+৮+৮+২—নব বৃন্দাবন। নব নব তরুগণ। নব নব বিকসিত। ফুল

৭+৯+৮+২—নবল বসন্ত। নবল মলয়া নিল। মাতল নব অলি। কুল।

৭+৯+৮+৩—অভিনব কাম। নাম পুন শুনইতে। রোখত গুণ দর। শাই

৮+৮+৮+৩—অরিসম গঞ্জয়ে। মন পুন রঞ্জয়ে। অপন মনোরথ। সাই

৮+৮+৮+৪—আজু রজনী হাম। ভাগে পোহাইনু। পেখল পিয়া মুখ। চন্দা

জীবনযৌবন। সফল করি মানল। দশ দিশ ভেল নির। দ্বন্দা

৮+৪— সজনি—অপরূপ পেখল। রামা

৮+৮+৮+৪ কনকলতা অব। লম্বনে উয়ল। হরিণহীন হিম। ধামা।

৮+৭+৮+৩—'সমগ্রপদটিতে (২৫—২৬ পৃষ্ঠা দেখ) প্রত্যেক ২য় পর্ব্বে 'সজনি' কথাটির সমাবেশের জন্য ছন্দটি অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে।

'কাঁচ সাঁচ পহু। দেখি গেল সজনি। তসু মন ভেল কুহ। ভান

দিন দিন ফল তরু-। ণিত ভেল সজনি। অহুখন না কর গে। য়ান।"

৮+৮+৮+৬—অলস গমন তোর। বচন বলসি ভোর।

মদন মনোরথ। মোহগতা।

জৃম্ভসি পুনুপুনু। যাসি অরস তনু।

আতপে ছুঁইলি মৃ-। ণাল-লতা॥

প্রাকৃত পিঙ্গলে নিম্নলিখিত ছন্দ **দোহা** নামে অভিহিত।

৮+৫+৮+৩—কম্বুকণ্ঠ মৃ-। ণালভুজ। বলিত পয়োধর। হার

কনক কলস রসে। পূরি রহু। সঞ্চিত মদন ভঁ। ডার।

৮+৬+৮+৩—শ্যামর চন্দ উগ। লাহ রে। চান্দ পুন গেল অ। কাশ।

এত বহি পিয়া কৈ। অয়বা রে। পলটত বিরহিনী। সাঁস॥

দোঁহার অন্য রূপও আছে। ৮+৬+৬+৩

মোর মন হরি হরি। লই গেল রে। অপনো মন। গেল।
গোকুল তেজি মধু-। পুর বস রে। কত অপযশ। লেল।
বিদ্যাপতি কবি। গাওল রে। ধনি ধরু পিয়। আশ।
আওত তোর মন। ভাবন রে। এহি কাতিক। মাস।

লঘু ত্রিপদী—

৬+৬+৬+৩(৪)—আওর পেখল। কুচযুগমাঝে। লোলিত মোতিম। হারে
কনক মহেশ। কামহু পূজল। জনি সুর নদী। ধারে।

প্রাকৃত রীতির লঘু ত্রিপদী—

৬+৬+৬+৩—ভিন ভিন অন্ত। ভবি আবথু। জনি পাবথু। খেদ
এক রস নহি। পুরুখ বুঝল। গুণ দুষণ। ভেদ।

অক্ষর-মাত্রিক লঘু ত্রিপদী—

৬+৬+৬+২—এহনি সুন্দরি। গুণক আগরি। পুনে পুনমত। পাব
ই রস বিন্দক। রূপ নারায়ণ। কবি বিদ্যাপতি। গাব।

অধিকাংশ লঘু ত্রিপদীর পদগুলিতে অক্ষর-মাত্রা ও স্বর-মাত্রার মিশ্রণ আছে।

মিশ্র লঘু ত্রিপদী—

২—৬+৪(৩)— ধনী—অলপ বয়সী। বালা
২—৬+৪(৩) জনি—গাঁথলি পুহপ। মালা
৬+৬+৬+৪(৩) থোরি দরশনে। আশ না পূরল। রহল মদন। জ্বালা। *(১)

লঘু ত্রিপদীর দুই পর্ব্বেও চরণ গঠনের দৃষ্টান্ত আছে।

৬+৬— তেঁ ধসি ময়ুরে। জোড়ল ঝাঁপ।
৬+৬ নখর গাড়ল। হৃদয় কাঁপ। * (২)

---

* (১) পঙ্কনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—এই ছন্দে রচিত। (২) লঘু ত্রিপদীর

একাবলী ছন্দের ধরণে ৬+৫ এর চরণও আছে—

কতয়ে গুঞ্জা। কতয়ে ফুল। কতয়ে গুঞ্জা। রতনতুল।

পাঁচমাত্রার ছন্দ—(স্তবক-বন্ধ)

৫+৫–৫+৫—বচনে বস। হোসি জহু। সসরি ভিন। হোইহ তহু।

৫+৫+৫+২—সহজে বঙ্ক। ছাড়ি দেব। শয়ন সী। মা

প্রথম রস। ভঙ্গ ভেলে। লোভে মুখ। শোভ গেলে

বাঁধি ভুজ। পাশে পিয়। ধরব গী। মা। * (৩)

চর্চরী—

৭+৭+৭+৩(৪)—গেলি কামিনী। গজহু গামিনী। বিহসি পলটি নি। হারি

ইন্দ্র জালক। কুসুম শায়ক। কুহকি ভেলি বর। নারী ॥

সাতমাত্রার চর্চরী ছন্দের স্তবক-(stanza) বন্ধনের দৃষ্টান্ত।

৭+৭—৭+৭—যখনে মধুরিপু। ভবন আওব—দূরে রহি মুজে। কহি পা-ঠাওব

৭+৭—৭+২—সকল দূখণ। তেজি ভূখণ। সমক সাজব। রে ॥

৭+৭–৭+৭—লাজ নতিভয়ে। নিকটে আওব। রসিক ব্রজপতি।

হিয়ে সম্ভাওব।

৭+৭—৭+২—কাম কৌশল। কোপ কাজর। তবহু রাজব। রে ॥

প্রচলিত পয়ারের মত পংক্তিগুচ্ছও মাঝে মাঝে আছে। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘের কোন বালাই নাই।

দূতী—যদি তোরা নহি ক্ষণ নহি অবকাশ।

পরকে যতনে কতে দেল বিশবাস।

রাধা—কর জোরি পৈঁয়া করি কহবি বিনতি।

বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরীতি ॥

স্তবকের অন্তরা। (৩) জয়দেবের বদসি যদি কিঞ্চিদপি ইত্যাদি ছন্দোবন্ধনের অনুযায়ী। একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে মরি-মরি অনঙ্গ দেবতা—ইত্যাদি বর্ত্তমান রূপ।

প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা।
দোসর পহর পরিজন নিন্দে গেলা॥

শুধু ৮, ৮+৩, ৮+৪ মাত্রাতেও পংক্তি গঠনের ছন্দ আছে

৮—৮—ফুয়ল কবরী মোর। অধরু আচর ওর।
চকোর চপল চাঁদ। পড়ল প্রেমক ফাঁদ।

৮+৩, ৮+৩—মধুঋতু মধুকর। পাঁতি। মধুর কুসুম মধু। মাতি

৮+৪, ৮+৪ ভনই বিদ্যাপতি। ভানরে। সুপুরুখ না কর নি। দানরে

৮+৪—ককে বিকে ঐলিহু। আপে॥ বেঢ়লিহু মোহি বড়ে। সাপে॥
(২)—৪+২ মোরে—পাপে লো।

৮+৪—করিতহুঁ পর উপ। হাসে। পড়ি লহুঁ তান বিধি। ফাঁসে॥
(২)—৪+২ নহি—আশে লো॥

৮+৫—রজনী ছোটি হো। দিবস বাঢ়। জনি কামদেব কর। বাল কাঁঢ়।

৮+৬—মলয়ানিল পিব। যুবতীমান। বিরহিনী-বেদন। কেও ন জান।

পাঁচমাত্রার পর্ব্বে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য—৫+৪—(২)+৫+২

মান পরি। হর হে। (করু)—বচন মো। রা।
মার মনো। ভব হে। (ধরু)—শরণ তো। রা।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই রামায়ণই আমরা পাই না, এ কথা সকলেই জানেন। তিনি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া একখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। পরে নূতন নূতন গল্প রামায়ণের মধ্যে ঢুকিয়াছে—বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর সমস্ত রামায়ণখানি বৈষ্ণব ভাবে তুলসীপত্রে সুবাসিত হইয়া পড়িয়াছে এবং হরি-ভক্তি-মূলক অনেক উপাখ্যান উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাক্ষসদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির আতিশয্য থাকিবার কথা নয়। আর্ষ রামায়ণে নাই, কৃত্তিবাসের পুঁথিতেও ছিল না। এইগুলি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব রামায়ণ-রচয়িতাদের সৃষ্টি। দেশে বৈষ্ণব ভাবের বন্যা বহিয়া যাওয়ার পর জনসাধারণের চাহিদাতেই ঐরূপ উপাখ্যান রচিত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী রামায়ণ-রচয়িতাদের রচিত কোন্ কোন্ অংশ কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং কৃত্তিবাসেরই কোন্ কোন্ অংশ পরবর্ত্তী রচয়িতারা গ্রহণ করিয়াছেন এ বিষয়ে এখনও সুচারুরূপ গবেষণা হয় নাই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাব ও ভাষা অনুসরণেই পরবর্ত্তী রামায়ণ-প্রণেতারা স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—তবে তাঁহারা একমাত্র বাল্মীকিকেই আশ্রয় করেন নাই। তাঁহারা জৈন রামায়ণ, অধ্যাত্ম পুরাণ, তুলসীদাসের রামায়ণ ইত্যাদি হইতেও কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই যে বহু নূতন নূতন রামায়ণ * রচিত হইয়াছিল ইহারা সব গেল কোথায়? অনেকগুলির রচনা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অপকৃষ্টও নয়—

* ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ, কবিচন্দ্রের রামায়ণ, জগৎ রামের রামায়ণ, শিবচন্দ্র সেনের সারদামঙ্গল ইত্যাদি বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। অমৃতকুণ্ডাগ্রামের নিত্যানন্দ

শুধু কৃত্তিবাসের রামায়ণই চলিল এবং অপরের যাহা কিছু ভাল তাহা কৃত্তিবাসের নামেই চলিয়া গেল। ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ বোধ হয়, কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের সভ্যতম হিন্দুজনবহুল অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণকে বাঁচাইয়া রাখিবার লোকের কোন দিন অভাব হয় নাই। বাল্মীকির রামায়ণের সহিত অধিকাংশস্থলে সাদৃশ্য থাকার জন্য শিক্ষিত লোকেরা এবং অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া অশিক্ষিত লোকেরা কৃত্তিবাসের রামায়ণই ভাল বাসিত। অশিক্ষিত লোকেরা রামায়ণ শুনে বটে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা না বাঁচাইলে এবং না পড়িয়া শুনাইলে তাহারা কি করিয়া এ সৌভাগ্য লাভ করিবে? যে অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি ছিল—কৃত্তিবাস সেই অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ও তাঁহার রামায়ণ সেই অংশে প্রচারিত হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস নিজেই আত্ম পরিচয় লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন পুঁথি হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়—কৃত্তিবাসের কোন পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গ

নামে এক ব্রাহ্মণ একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। ইনি সীতাকে কালীর অবতার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন—তাহাতে ইঁহার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের ভাবার্থ—'অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে পঠিত হইত, কৃত্তিবাসের প্রতিপত্তি ছিল দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে। অনেক স্থলে দুই রামায়ণের একটা মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কর-পাঠের পুঁথিই পরিমার্জিত করিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মুদ্রিত করিয়াছিল। তাহাই কৃত্তিবাসের নামে বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে। কৃত্তিবাসের তুলনায় অদ্ভুতের রচনা তরলতর ও চটুলতর। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ ও রামলীলামূলক সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য ও নাট্য হইতে তাঁহার বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্ভুত মূল উপাখ্যানের বাহিরের অনেক সরস, চিত্তাকর্ষক জনপ্রিয় উপাখ্যান রামায়ণের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনায় কোন অঙ্গে দৈন্যও নাই, আতিশয্যও নাই—অদ্ভুতের রামায়ণে আবেগোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি আছে এবং পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের দৈন্য আছে।

হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র মুরারি ওঝা। তাঁহার পৌত্র কৃত্তিবাস। ইনি নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি তৎকালীন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার আদেশে ইনি রামায়ণ রচনা করেন। এই গৌড়েশ্বর কে তাহা জানা যায় না—এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার ঠিক সময়ও জানা যায় না। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হ'ন—বিশেষজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আত্ম-চরিত হইতে এই জানা যায় যে, তিনি কোন ঐহিক লাভের আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় শ্লোক পাঠ করেন নাই। রামায়ণ-রচনার জন্য কোন বৃত্তিও তিনি গ্রহণ

কৃত্তিবাসের কল্পিত চরিত্রগুলি অনেকটা মূল রামায়ণের সঙ্গে সুসমঞ্জস, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা পুরাদস্তুর বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে।—বাঙ্গালীচরিত্রের হৃদয়বত্তা, আবেগাকুলতা, ভাববিহ্বলতা সর্বপ্রকার দুর্বলতা সেগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে। কাব্যরসের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্ভুত অনেকাংশে কৃত্তিবাসকে পরাভূত করিয়াছেন।'

রঘুনন্দন গোস্বামী কৃত রামরসায়ন একখানি উৎকৃষ্ট রামায়ণ। গোস্বামী প্রভুর রচনা, অতএব ইহা বৈষ্ণবভাবে অভিরঞ্জিত এবং বহুস্থলে ইহাতে ভাগবতের ছায়াপাত হইয়াছে। কৃত্তিবাস বা অদ্ভুতের মত এই রামায়ণ তেমন প্রাঞ্জল নয়। কবি শোকের দৃশ্যগুলিকে তাঁহার রামায়ণ হইতে বাদ দিয়াছেন—বৈষ্ণব হইয়া পাঠকের মনে কষ্ট দিবেন কি করিয়া?

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত রামায়ণ লেখেন—তাঁহার পরিচয় আমরা দীনেশ বাবুর মারফতে প্রাপ্ত হই। ইনি নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া জাহির করিতেন—পুরীর জগন্নাথদেবকে বুদ্ধদেবেরই দারুব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিতেন। মুসলমানগণ এই মন্দির ও মূর্ত্তির অবমাননা করিয়াছিল এবং বৈষ্ণবগণ উহাকে বিষ্ণু-মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে, সেজন্য এই নবীন বুদ্ধদেবের ক্রোধ ঐ দুই সমাজের উপর। রামচন্দ্রকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া মনে করিয়া তিনি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার রামায়ণে মুসলমান ও বৈষ্ণবদের প্রতি দারুণ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ক্ষীয়মান বৌদ্ধ সমাজের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার রামায়ণে আস্ফালনই খুব বেশি।

করেন নাই। 'গৌড়শ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।' এজন্যই গৌড়েশ্বরের সভায় আপনার কবিকৃতিত্ব দেখানোর প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা যাই তথা গৌরবমাত্র সার।

ইহা হইতে বুঝা যায়—কবির যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য অর্থাৎ গৌরব, তাহা ছাড়া কৃত্তিবাসের কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'খোল নলিচা' দুইই বদলাইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণ কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রজ সন্তান,—আজকাল অনেকের ইহাই অভিমত। কিন্তু একথাও খুব জোর করিয়া বলা যায় না। ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ইহাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। নূতন নূতন প্রসঙ্গ যে উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং অনেক অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল উপাখ্যানটি বজায় না থাকিবে কেন? ভাষা যদি বদলাইয়া থাকে তবে বহিরঙ্গেরই বদল হইয়াছে। যাঁহার রামায়ণের এত নাম, এত প্রচার তাঁহার রচনা কিছুই থাকিবে না, ইহা ভাবিবার কি কারণ আছে? যাহাই হউক নানা প্রকার প্রক্ষেপ সত্ত্বেও বর্ত্তমানে প্রচলিত রামায়ণের মূল উপাখ্যানটিকে কৃত্তিবাসের বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসুর কথায় বলা যাইতে পারে—"ভগীরথ-সমানীত স্রোতের পূর্ব্ববারি এক্ষণে কণামাত্র না থাকিলেও ভাগীরথী যেমন পূজিত, কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণের পংক্তিমাত্র না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ সেই রূপ সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে।"

সাহিত্য পরিষদ্ হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের কতকটা ও উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন পুঁথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে খাঁটী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে প্রচলিত রামায়ণে উপাখ্যানাংশে কি কি

প্রভেদ আছে তাহা দেখা যাক। বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে যে যে অংশ মিলে না—তাহাদের কোন' কোন' অংশ কৃত্তিবাসের নিজেরও কল্পিত হইতে পারে।

বিষ্ণুর চারি অংশে বিভক্ত হইয়া অবতরণ-সংকল্পে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আরব্ধ হইয়াছে। তারপর রত্নাকরের কাহিনী। এই কাহিনীটির জন্ম কখন হইয়াছে জানা যায় না। ইহার মূল অধ্যাত্ম রামায়ণ। বাঙ্গালাদেশে যে ইহা পল্লবিত হইয়াছে তাহা বোঝা যায়—'রামের' আক্ষরিক পরিবর্ত্তনে 'মরা' শব্দের প্রয়োগে। মরা খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ। ঢাকাই সংস্করণে এ কাহিনীটি গোড়ায় নাই। না থাকিতেও পারে। কারণ, পরে হনুমান এই কাহিনী সম্পাতির কাছে বিবৃত করেন। এই কাহিনীর দ্বারা রাম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামের মহিমা এমনই যে—রামভক্তি একজন নরঘাতক দস্যুকেও কুলপতি ঋষি এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি করিয়া তুলিয়াছে। *

বাল্মীকির রামায়ণ বাল্মীকির কবিত্ব-লাভ দিয়া আরব্ধ হইয়াছে। নারদ রামচরিত্রের সন্ধান দিয়াছিলেন মাত্র, যোগবলে বাল্মীকি রামচরিত্র জানিতে পারেন, রামায়ণ রচনা করিয়া তিনি লবকুশকে রামায়ণ শিক্ষা দান করেন। কুশলব অযোধ্যার রাজসভায় রামচন্দ্রকে রামায়ণ শুনাইলেন। রামায়ণের কাহিনী ইহাতেই আরব্ধ হইল। ঢাকা হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের আদি কাণ্ডের প্রারম্ভ অনেকটা বাল্মীকিরই অনুসৃতি।

প্রচলিত রামায়ণে রাম-চরিতের আখ্যান-বস্তু নারদ বাল্মীকিকে দিলেন

* রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—করুণাপূর্ণ হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ত্বে বাল্মীকিকে এবং ভক্তির অলৌকিক শক্তিতে রত্নাকরকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। পাপিষ্ঠ রত্নাকর রামচরিত গান করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে। পুণ্যবান্ মহর্ষি রামচরিত অবলম্বন করিয়া নিজের অকৌজ কাব্য শক্তিকে যথার্থভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই বলা হইয়াছে। তারপর কৃত্তিবাস সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, হরিশ্চন্দ্র, সগর, ভগীরথ, সৌদাস, দিলীপ, রঘু ও অজ রাজার কাহিনী ক্রমে বর্ণনা করিয়া দশরথে পৌঁছিয়াছেন। গঙ্গাবতারণ ভগীরথ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। *

বাল্মীকি প্রথমেই অযোধ্যা-বর্ণনা করিয়া একেবারে রাজা দশরথের রাজত্বকালে উপস্থিত হইয়াছেন। তারপর পুত্র-কামনায় দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন—ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ—বিষ্ণুর অংশে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের জন্ম।

বাঙ্গালীকবি রাজা দশরথের বিবাহ—দশরথের ভোগ-লালসায় আসক্তি, রাজ্যে শনির দৃষ্টি—অনাবৃষ্টি—গণেশের জন্ম—শনির তুষ্টিসাধন—অন্ধক মুনির পুত্রবধ—অভিশাপ—সম্বরাসুরের সঙ্গে দশরথের যুদ্ধ—কৈকেয়ীকে বর দান ইত্যাদি বর্ণনার পর ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। তারপর সীতার জন্ম-কথা বলিয়া বাঙ্গালী কবি রামাদির জন্মের কথা বলিয়াছেন। তারপর চারি ভ্রাতার বাল্য-জীবন, শিক্ষা ইত্যাদির বিবরণ আছে। রাজর্ষি জনকের হরধনু লাভ ও ধনুর্ভঙ্গ-পণের কথা—রাজ রাজন্যদের ধনুর্ভঙ্গে অক্ষমতা, গুহকের সহিত রামের মিতালি ইত্যাদির পর বিশ্বামিত্রের আগমনের কথা।

বাল্মীকির রামায়ণে রামাদির জন্মের কথার পর একেবারে ৫।৭ ছত্র পরেই বিশ্বামিত্রের আগমনের কথা। রামাদির জীবনের ১৫।১৬ বৎসরের কথা কিছুই বলা হয় নাই। বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের গমন—তারকা বধ, যজ্ঞরক্ষা, মারীচ ও সুবাহুর সহিত যুদ্ধ, সুবাহু-বধ—জনক-সভায় গমন। তারপর হরধনুর্ভঙ্গ হইবার আগে অনেকগুলি কাহিনী আছে। সে কাহিনীগুলি এই—বিশ্বামিত্র নিজ বংশের উৎপত্তি, কুশনাভের কন্যাদের শাপ ও শাপ-মোচন, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, সগর রাজার উপাখ্যান, গঙ্গাবতরণ, সগর-বংশের

* পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে' দিলীপ রঘুর কাহিনী অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে উহা সংক্ষিপ্ত হইয়া আদি কাণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে।

উদ্ধার, সমুদ্রমন্থন, ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যান। পথে অহল্যার শাপ-মোচন। অহল্যার পুত্র শতানন্দ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান আমূল বর্ণনা করিতেছেন। তারপর হরধনুর্ভঙ্গ—রামাদির বিবাহ, পরশুরামের দর্পহরণ।

বাঙ্গালী কবি তাড়কা রাক্ষসীবধ হইতে পরশুরামের দর্পহরণ পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। মূল রামায়ণে আদিকাণ্ডে রাবণের উল্লেখ মাত্র আছে। বাঙ্গালা রামায়ণে রামের জন্মে রাবণের মস্তকের মুকুটস্খলন—অশুভের কারণ-নির্দ্দেশের জন্য শুকসারণের পৃথিবী-পর্য্যটন—এবং বিষ্ণুরূপ শ্রীরাম দর্শন এবং সে কথার গোপন ইত্যাদির কাহিনী আছে।

বাঙ্গালী কবি প্রথমেই লবকুশের রামায়ণ গানের কথা উল্লেখ করেন নাই। দশরথ রাজার আদর্শ রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাই বলেন নাই। রাজা কুশনাভের কথা, সমুদ্রমন্থন, মরুদ্গণের জন্ম, অম্বরীষ উপাখ্যান ইত্যাদিও কবি বর্জ্জন করিয়াছেন। কবি অঙ্গরাজ, অহল্যা ও অসমঞ্জকে স্ব স্ব অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তারপর বিশ্বামিত্র যে সকল উপাখ্যান বলিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে সগর-ভগীরথের উপাখ্যান বাঙ্গালী কবি পূর্ব্বেই বলিয়া লইয়াছেন। অন্যান্য উপাখ্যান বর্জ্জন করিয়াছেন। শতানন্দ-কথিত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের কথা যাহা বাল্মীকির রামায়ণে অনেকাংশ অধিকার করিয়াছে—বাঙ্গালী কবি তাহা বাদ দিয়াছেন। কেবল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বাল্মীকির রামায়ণে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গে নাই।

বাঙ্গালা রামায়ণে নূতন উপাখ্যান অনেক। ১। রত্নাকরের উপাখ্যান। ২। খাণ্ডদণ্ড, মান্ধাতা ও হারীতের উপাখ্যান। ৩। সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী। ৪। অজ ইন্দুমতী কাহিনী। ৫। দশরথের তিন বিবাহ। ৬। দশরথের

রাজ্যে শনির দৃষ্টি। ৭। গণেশের জন্ম। ৮। সম্বরাসুর বধ। ৯। কৈকেয়ীর বরলাভ। ১০। গুহকের সঙ্গে মিতালি ইত্যাদি।

বাল্মীকি বিবাহিত পূর্ণবয়স্ক দশরথের রাজত্বকাল হইতে রামায়ণের মূল গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস সূর্য্যবংশের অন্যান্য রাজাদের কথা বলিয়া ক্রমে দশরথে আসিয়াছেন। ইহাতে পাঠকগণের সুবিধাই হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটি ইহার মধ্যে চমৎকার। সগর-ভগীরথের উপাখ্যান এই প্রসঙ্গে আগে বলিয়া লওয়াও সঙ্গত হইয়াছে। ভগীরথের জন্মের অদ্ভুত কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণে নাই—বাঙ্গালী কবি ইহা বাশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ হইতে পাইয়াছেন। দিলীপ ভগীরথকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথ বিধবার সন্তান নয়। ঐরাবতের গঙ্গাপ্রবাহরোধের কাহিনীও বাল্মীকির রামায়ণে নাই। বাল্মীকির রামায়ণে গঙ্গাকে জহ্নুমুনি কর্ণবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। বাঙ্গালা রামায়ণে আছে—মুনি জানু চিরিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। গঙ্গার মহিমার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য বাঙ্গালা রামায়ণে কাণ্ডার মুনির গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গল্পটি ভগীরথের জন্মের গল্পের চেয়েও আজগবি। এই গল্প বাঙ্গালী কবি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড হইতে পাইয়াছেন। গঙ্গাবতরণের কাহিনী কবি অন্যান্য পুরাণ হইতে লইয়াছেন। মূল রামায়ণে গঙ্গার পথ এত দুর্গম নয়। দণ্ডের কাহিনী ও দণ্ডকারণ্য সৃষ্টির কাহিনী বাল্মীকি উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। পরিষদের রামায়ণেও সেইরূপ। দিলীপ রঘুর কাহিনী পরিষদের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে অতি বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

কালিদাস রঘুবংশে অজবিলাপ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি অজকে বিলাপ করিবার অবসর দেন নাই; কারণ, যে পারিজাত-মালার স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু হইল—অজ সেই মালা নিজে স্পর্শ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। বাঙ্গালী কবি দশরথের বিবাহের বর্ণনাচ্ছলে বাঙ্গালীর বৈবাহিক

অনুষ্ঠানের একটা চিত্র দিয়াছেন। কবি কৈকেয়ীর স্বয়ংবরেরও একটা বর্ণনা দিয়াছেন। বাল্মীকির মতে কৈকেয়ীর বিবাহ স্বয়ংবরের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই —অযোধ্যাকাণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে কৈকেয়ীর বিবাহের কথা আছে। এ বিবাহে একটি শর্ত্ত ছিল। কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্য-সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অশ্বপতি বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে কৈকেয়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ব্যাপার স্মরণ করিয়া দশরথ রামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং ভরতকে সন্দেহ করিতেন। বাঙ্গালা রামায়ণে একথার উল্লেখ নাই।

বাঙ্গালী কবি সিংহল-রাজকন্যার সঙ্গে দশরথের বিবাহ দিয়া সিংহল আর লঙ্কা যে এক নয় তাহাই বলিয়াছেন। এ সিংহল ভারতের মধ্যেই একটা প্রদেশ, মৃগয়া করিতে করিতে সেখানে পৌছানো যায়। দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি হইল—বহু বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি। দশরথ ইন্দ্র ও শনির সঙ্গে দেখা করিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিলেন। দশরথের রথ শনির দৃষ্টিতে আট-আটটা ঘোড়া লইয়া আকাশ হইতে পড়িতেছিল। জটায়ু পাখা দিয়া বাঁচান। জটায়ুর সঙ্গে দশরথের এইসূত্রে মৈত্রী হইল। বাঙ্গালী জাতির শনিভীতি অত্যন্ত। এই ভীতি হইতেই এই উপাখ্যান রামায়ণের অন্তর্গত হইয়াছে। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়িয়া গিয়াছিল, তাহার কাহিনীও এই প্রসঙ্গে আছে।

তারপর অন্ধক মুনির পুত্রবধের একটি করুণ চিত্র বাঙ্গালী কবি অঙ্কন করিয়াছেন ইহাতে কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের মৃত্যুর আগে দশরথের মুখে বাল্মীকি এই কাহিনী বসাইয়াছেন। পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাহাই আছে। বাঙ্গালী-কবি তৎপরে সম্বরাসুর বধ ও কৈকেয়ীর একটি বর লাভের বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথের নখ ব্রণের পুঁজরক্ত মুখ দিয়া শোষণ করিয়া কৈকেয়ী আর একটি বর লাভ করেন। কৃত্তিবাসের ঢাকাই সংস্করণে

এই ব্রণ-শোষণের ব্যাপারটিকে আরও বীভৎস করিয়া দেখানো হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে এই বর লাভের উল্লেখ মাত্র আছে।

বাঙ্গালী কবি বাল্মীকির ঋষ্যশৃঙ্গকাহিনীটিকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। প্রথমতঃ ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মের একটা অদ্ভুত গল্প বলিয়াছেন— তারপর বারাঙ্গনাদের সাহায্যে একটি বৃদ্ধা কি করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিল—তাহার একটা কদর্য্য বর্ণনা দিয়াছেন। বাল্মীকি বলিয়াছেন—নানাবিধ মোদক বা মিঠাই দানে (অথাস্মৈ প্রদদুঃ স্বাদূন্ মোদকান্ ফলসন্নিভান্) ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালী কবি সে মোদককে কামেশ্বর মোদকে পরিণত করিয়াছেন।

বাঙ্গালী কবি এই সঙ্গে বিভাণ্ডক মুনির একটা করুণ খেদোক্তি যোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রোধশান্তির একটা গল্পও রচনা করিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে বোধ হয় ইহা প্রচলিত রামায়ণে আসিয়া থাকিবে। কৌশল্যার গর্ভসঞ্চার ও তাঁহার গর্ভাবস্থার খুঁটিনাটি বর্ণনা প্রচলিত রামায়ণে আছে। রামাদি চারি ভ্রাতার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান একটি নূতন সংযোজন। বাল্মীকি হরধনুর ইতিহাস অতিসংক্ষেপেই সারিয়াছেন—বাঙ্গালী কবি ইহার একটা ফলাও করিয়া বর্ণনা দিয়া রাবণকে ধনুক ভাঙ্গিবার জন্য টানিয়া আনিয়াছেন। রাবণ টানাটানি করিয়া ধনুক তুলিতেই পারিলেন না। মোটকথা, এই উপাখ্যানে কবি কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

বশিষ্ঠের পুত্র বামদেব দাশরথকে তিনবার রাম নাম শুনাইয়াছিল। একবার 'রাম নামে' কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়—সেই নাম তিনবার শোনানোর অপরাধে বশিষ্ঠ বামদেবকে অভিশাপ দিলেন—'চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' রাম-ভক্তির বাড়াবাড়ি বাঙ্গালা রামায়ণের একটা বৈশিষ্ট্য। বামদেব গুহক হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই গুহকের সঙ্গে রামের মিতালির একটা কাহিনী বাঙ্গালা রামায়ণে আছে।

আর্ষ রামায়ণে আছে—বিশ্বামিত্র আসিলেন রামচন্দ্রকে লইবার জন্য—তপস্যার বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বধ করিয়া রামচন্দ্র নিরুপদ্রব করিতে পারিবেন এই ভরসায়। বাঙ্গালী কবি দশরথের অতিরিক্ত রামবৎসলতা দেখাইবার জন্য দশরথকে প্রবঞ্চক বানাইয়াছেন—তিনি রামলক্ষ্মণকে পাঠাইতেছি বলিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। ঋষির কাছে প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া গেল। ইহাতে ভরতেরও কাপুরুষতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মূল রামায়ণে নাই, কোন পুঁথিতেও নাই।

বাঙ্গালী কবি তাড়কা বধের যে বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা শিশুদের জন্য রচিত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শে বিশ্বামিত্রকে অযথা ভীরু কাপুরুষ করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে, ঢাকাই সংস্করণে, পরিষদের রামায়ণে ও তুলসীদাসের রামায়ণে আছে, অহল্যা গৌতমের অভিশাপে পাষাণ হইয়া শায়িত ছিলেন—রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তিনি পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং শাপমুক্ত হইলেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের অহল্যা নামক চমৎকার কবিতার সৃষ্টি। বাল্মীকির রামায়ণে অহল্যার উপাখ্যান দুইবার আছে, একবার বিশ্বামিত্রের মুখে বালকাণ্ডে আর একবার ব্রহ্মার মুখে উত্তরাকাণ্ডে। দুইটির মধ্যে কিছু অমিল আছে সত্য—কিন্তু কোনটাতেই অহল্যার পাষাণ হইবার কথা নাই। তিনি ভস্মরাশিতে শয়ন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনে তাঁহার শাপাবসান হইল বটে, কিন্তু রামচন্দ্রই তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। আর অভিশাপের ফলে ইন্দ্রের সহস্রলোচনত্বের কথা কোনটাতেই নাই। উত্তরাকাণ্ডের উপাখ্যানে আছে—ঐ পাপে ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডেও একথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সহস্রলোচনত্ব লাভের কদর্য্য কাহিনী ইহাতেও আছে।

অহল্যা উদ্ধারের সঙ্গে বেশ আর একটি গল্প সকল বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী রামায়ণেই আছে। বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ নদী পার হইবার জন্য পাটনীকে ডাক দিলেন।

পাটনী ভয়ে পলাইল। পরে ঋষির শাপের ভয়ে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমি কাঁধে করিয়া পার করিতে পারি—নৌকায় উঠিতে দিতে পারি না। যাঁহার পায়ের স্পর্শে পাষাণ মুক্ত হইল—তাঁহার চরণ স্পর্শে যদি কাঠের তরীখানিও মুক্ত হইয়া যায়—তাহা হইলে আমার জীবিকার উপায় থাকিবে না। আমি খাইব কি ?" বিশ্বামিত্র অভয় দিলেন। রামের পদস্পর্শে পাটনীর কাঠের তরী সোনার তরী হইয়া গেল। এসকল কাহিনী রামভক্তি-প্রচারের জন্য রচিত। সীতার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালী জমিদার-কন্যার বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সীতাকে বাঙ্গালী-বধূর সাজসজ্জা পরাইয়াছেন। সীতা কবির লেখনীর ফলার মুখে বাঙ্গালী জন্মলাভ করিয়াছে।

ঢাকার ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত আদিকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রচলিত সংস্করণের উপাখ্যানগুলি মোটামুটি মিলে, কিন্তু ভাষা মিলে না। এই ভাষার অমিল শুধু পংক্তিগত নয়, পরে উপাখ্যানগুলি অর্বাচীন যুগের ভাষায় পুনর্লিখিত করা হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় ভট্টশালী মহাশয়ের সংস্করণে বাল্মীকির অনুস্মৃতি নিকটতর বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রারম্ভ বাল্মীকির রামায়ণের মতই। রত্নাকরের কাহিনী নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা ইহাতে আছে। বিশ্বামিত্র সৌদাস, অম্বরীষ, শুনঃশেফের কাহিনী মূল রামায়ণের মত সুবিস্তৃত না হইলেও ইহাতে আছে। বাল্মীকির রামায়ণে নাই—প্রচলিত রামায়ণে নাই—এমন দুই একটি নিবন্ধও ইহাতে আছে। যেমন—রাবণ ও তাহার ভ্রাতা ভগিনীদের জন্ম কথা। বানরগণের জন্ম প্রচলিত রামায়ণে আদিকাণ্ডেই আছে, ইহাতে নাই। মূল রামায়ণে ও পরিষৎ প্রকাশিত রামায়ণে এসমস্ত উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্গত। প্রচলিত রামায়ণে চন্দ্রবংশের রাজাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার পরে দশরথের কথা আছে। এই রামায়ণে এ বিষয়ে বাল্মীকিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে আর্য রামায়ণের মত অযোধ্যা বর্ণনা আছে—কিন্তু তাহার সহিত মূলের কোন

মিল নাই। এ বর্ণনা বাঙ্গালার অন্যান্য কাব্যের নগর-বর্ণনারই প্রতিধ্বনি।

প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় ভট্টশালী-সম্পাদিত প্রাচীন রামায়ণে সুমিত্রা-প্রসঙ্গ অনেকটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে—সুমিত্রার বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গর্ভধারণ পর্য্যন্ত বেশ একটি কাহিনী ইহাতে আছে। প্রচলিত রামায়ণে ঐ প্রসঙ্গ সংক্ষেপেই বিবৃত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপে এবং ইহার সঙ্গে উর্ব্বসীর কথা ও জনকের ব্রহ্মচর্য্যহানির কথা আছে। এই রামায়ণে উর্ব্বসী-প্রসঙ্গ নাই, রাবণ-ধর্ষিতা বেদবতী পুড়িয়া মরিলে চিতায় একটি অগ্নিপুতলা থাকিয়া গেল। রাবণ সিন্ধুকে পূরিয়া উহাকে সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিল। তাহাই ভাসিতে ভাসিতে কূলে ঠেকিয়া সমুদ্রের চড়ায় নিহিত ছিল। জনকের হলের মুখে ঐ সিন্ধুক উঠিল। মূল রামায়ণে এসব কিছুই নাই। কেবল হলমুখে মৃত্তিকা হইতে সীতার উত্থানের কথা আছে। বেদবতীর উপাখ্যান মূল রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে আছে। *

প্রচলিত রামায়ণে গুহকের সহিত রামের মিতালি-প্রসঙ্গে ভক্তির বড় বাড়াবাড়ি আছে, ইহাতে তাহা নাই। বলিবামনের উপাখ্যান ও রাম লক্ষ্মণের বামনপুরী-দর্শন প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। সীতার বিবাহানুষ্ঠান পুঁথিগুলিতে খুব বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে সংক্ষিপ্ত।

কৃত্তিবাস অযোধ্যা কাণ্ডের উপাখ্যানের সাহিত্যাংশ বাদ দিয়া উপাখ্যানাংশ মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। মন্থরার চরিত্র কৃত্তিবাসে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মন্থরার যুক্তিগুলি এমনই চোখা চোখা যে, কৈকেয়ীর চিত্ত

* পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও আছে। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণের তুলনায় তাহাতে বেদবতীর সতী-মর্য্যাদায় ক্ষুণ্ণতা দেখানো হইয়াছে।

তাহাতে বিচলিত না হইয়া পারে না। বাল্মীকি কৈকেয়ীকে দশরথের মুখ দিয়া অনেক কটুকথা শুনাইয়াছেন, ভক্ত কৃত্তিবাস সেগুলিকে দশগুণ তীব্র করিয়া তুলিয়াছেন।

পরিষদের রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমেই আছে,—ভরত-শত্রুঘ্নকে কেকয়দেশে প্রেরণের কথা। প্রচলিত রামায়ণে তাহা নাই। দশরথের কু-স্বপ্নের কথা দুই রামায়ণেই আছে—কিন্তু স্বপ্ন এক নয়। আসল রামায়ণে কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা-পর্ব্ব সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়াছে—প্রচলিত রামায়ণে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা আছে। প্রচলিত রামায়ণে রামকে না পাঠাইয়া সুমন্ত্রকে আগে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে পাঠানো হইয়াছে। রাম সীতার নিকটে বিদায় লইতে গেলেন,—

সীতা বলেন তুমি যদি হবে বনবাসী।
ঠাকুর বনে গেলে ঘরে কি করিবে দাসী।
সীতার কথা শুনিলেন কমল-লোচন।
আমার সহিত সীতা তুমি যাবে বন ॥—

এই চারি চরণেই পুঁথির্ রামায়ণে সীতার বনগমন-সমস্যার সমাধান হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বাল্মীকির অনুসরণে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক আছে। পরিষদের রামায়ণে লক্ষ্মণের আস্ফালনের কথাও নাই। এই রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির অলৌকিক শক্তির কথা ও অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুর বধ-কাহিনীও নাই। পরিষদের রামায়ণে অনেক বিষয়ের উল্লেখমাত্র আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা ফলাও করিয়া লেখা হইয়াছে। মনে হয় পরিষদের সংগৃহীত পুঁথি খণ্ডিত। পুঁথির রামায়ণে দশরথের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ, সীতার বালির পিণ্ডদান ও তুলসী, ফল্গু ও ব্রাহ্মণের প্রতি অভিশাপের একটি কাহিনী আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা নাই।

ভরদ্বাজের আশ্রমে সৈন্যবাহিনীর অতিথি-সৎকার লইয়া বাল্মীকি অত্যন্ত

বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—কৃত্তিবাস সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। কিন্তু তারপর কৃত্তিবাসের শক্তির দারিদ্র্য বড়ই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণের চিত্রকূটের অপূর্ব্ব বর্ণনার বিন্দুমাত্রও কৃত্তিবাসের পুস্তকে নাই। বাল্মীকির রামায়ণে চিত্রকূটের রাম-ভরত-মিলনের চিত্র জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। বাঙ্গালী কবি ইহার শুধু কঙ্কালটুকু লইয়াছেন। জাবালি ও বশিষ্ঠের যুক্তি-পরম্পরা, ভরতের আকিঞ্চন ও দৈন্য, রাজ্যশাসনে ভরতের প্রতি শ্রীরামের উপদেশ ইত্যাদির কিছুই কৃত্তিবাসে নাই।

প্রচলিত রামায়ণে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের আতিথ্যের কথা নাই। অগস্ত্যের প্রসঙ্গে ইল্বল বাতাপির গল্প বাঙ্গালা রামায়ণে আছে—কিন্তু অগস্ত্যের অন্যান্য মহিমার কথা নাই। ঋষিকে লইয়া একটু রঙ্গ করাই ছিল বাঙ্গালী কবির উদ্দেশ্য। সূর্পণখার দুর্বুদ্ধি লইয়াও কবি একটু রঙ্গরহস্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের ও পঞ্চবটীর অপূর্ব্ব বনশ্রী একেবারেই ফুটে নাই। ইহা ছাড়া, তপোবনের শুচিসুন্দর আবেষ্টনী কোথাও অঙ্কিত করিবার প্রয়াস দেখা যায় না। বাল্মীকির অরণ্য-কাণ্ড কবিত্ব-রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার—বাঙ্গালী কবি তাহার কিছুই পান নাই। সীতাহরণের প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—রাবণেরে গালি দেয় যত আসে মনে। কিন্তু এই তিরস্কার রামায়ণের একটি চমৎকার কবিতা। কবি এই কবিতাটির একটা অনুবাদ দিলে চমৎকার হইত।

বাঙ্গালা রামায়ণে দনুকবন্ধের কাহিনী নাই। রাম-শবরী-সংবাদ রামায়ণের একটি অপূর্ব্ব চিত্র, প্রচলিত রামায়ণে উহা নাই। তুলসী দাসের রামায়ণে আছে। ইহা ছাড়া, পম্পাহ্রদের বর্ণনা, পম্পাতীরে রামের সীতা-বিরহ, বর্ষাগমে রামের চিত্তের অস্থিরতা ইত্যাদি কবিত্বময় অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির একটা যে গভীর যোগ বাণীরূপ লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালা রামায়ণে তাহার

আভাসও নাই। হিন্দী রামায়ণে কিছু আছে। এই রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে কোন নূতন কাহিনী প্রবেশ লাভ করে নাই—বরং অনেক অঙ্গই বর্জ্জিত হইয়াছে। বনবৃক্ষের শ্যামলসুন্দর শাখার পুষ্পপল্লবগুলি ছিঁড়িয়া লইলে তাহার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিতই বাঙ্গালা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

বাল্মীকি হনুমানের পরিচয়ের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ইনি যেরূপ কথা কহিলেন,—ঋক্, যজু ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না।" বাঙ্গালী কবি হনুমানের বিক্রমের কথাই বলিয়াছেন,—পাণ্ডিত্যের কথা কিছু বলেন নাই।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের গোড়ায় বাল্মীকি বর্ষা-বর্ণন করিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ে প্রকৃতির প্রভাব-সঞ্চার ও সেই সঙ্গে অনঙ্গপীড়া-সঞ্চারের একটি চিত্র দিয়াছেন। ইহাতে রামচন্দ্র সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালী কবির রামচন্দ্র সর্ব্বদাই স্বয়ং ভগবান। কাজেই তিনি রামের এই চিত্ত-বিকারের কথা যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়াছেন।

বর্ষা বিগত হইল—শরৎ আসিল। বর্ষায় সীতান্বেষণ ও যুদ্ধোদ্যম বন্ধ ছিল। এখন সময় উপস্থিত। শরতের বর্ণনা ও তাহার প্রভাবেও রামচন্দ্রের চিত্ত-বিকারের ও কামার্ত্তি-সঞ্চারের কথা বাল্মীকির রামায়ণে আছে। বাঙ্গালী কবি ইহা পরিহার করিয়া সংসারযাত্রায় স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা ও শ্রাদ্ধাদির জন্য পুত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বক্তৃতা রামের মুখে বসাইয়াছেন। কিষ্কিন্ধ্যার ঐশ্বর্য্য ও সুগ্রীবের অতিরিক্ত ভোগাসক্তির ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই কবি অগ্রসর হইয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে এই দুই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে আসন্নমৃত্যু বালী রামচন্দ্রকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছেন তাহা যেমন যুক্তিগর্ভ—তেমনি করুণ। বাঙ্গালী কবি ইহাকে রোষমিশ্র তিরস্কারে পরিণত করিয়াছেন। সীতান্বেষণ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতের একটা ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছেন। প্রচলিত রামায়ণে ঐ প্রসঙ্গ একেবারেই অনুসৃত হয় নাই।

বাল্মীকির রামায়ণে ময়দানব-রচিত একটি স্বপ্নপুরীর বর্ণনা আছে—সেই পুরীর রক্ষয়িত্রী স্বয়ংপ্রভা নামক তাপসী। বানরগণ এই তাপসীর আতিথ্য লাভ করিয়া বিন্ধ্যগিরির সন্ধান পাইয়া উপকৃত হইল। বাঙ্গালী কবি এই তাপসীকে এক অপূর্ব্বরূপবতী সম্ভবা-নাম্নী নারীতে পরিণত করিয়া মামুলী ধরণে তাঁহার একদফা রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহাকে বাঙ্গালী বেশভূষায় সাজাইয়াছেন এবং হেমা নামিকা অপ্সরীর একটা কদর্য্য কাহিনী এই সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে সম্পাতির উপাখ্যান এইরূপ—সম্পাতি জটায়ুর বড় ভাই। জটায়ুকে সূর্য্যের অগ্নিজ্বালা হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার পক্ষদ্বয় দগ্ধ হয়। তারপর হইতে সম্পাতি বিন্ধ্যপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিল। নিশাকর নামে এক ঋষির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। নিশাকর বলিয়াছিলেন—"তুমি এখানে অপেক্ষা কর, একদিন রাবণ সীতাহরণ করিয়া পলাইবে। তাহার সন্ধানে বানরগণ এখানে আসিবে। তাহাদিগকে সীতার সন্ধান দিলে তোমার পক্ষোদ্গম হইবে। আমি তোমাকে এক্ষণি পক্ষ দুটি ফিরাইয়া দিতে পারিতাম—তাহা হইলে তুমি কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, বানরগণ তোমার সন্ধান পাইবে না। তুমি এখানেই এই অবস্থাতেই অপেক্ষা কর।" সম্পাতি ঋষির কথামত অপেক্ষা করিতেছিলেন—সৌপর্ণ-বিদ্যা প্রভাবে সম্পাতি দিব্য চক্ষু পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি সীতার সন্ধান দিতে পারিলেন।

প্রচলিত রামায়ণে আছে—হনুমান সপ্তকাণ্ড রামচরিত সম্পাতির কাছে বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শুনিয়া সম্পাতির পক্ষোদ্গম হইল। তখন পক্ষবলে ঊর্দ্ধে উঠিয়া সম্পাতি সীতার বর্ত্তমান অবস্থিতি বলিয়া দিলেন।

হনুমান রামায়ণ-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে রত্নাকরের উপাখ্যানটিও সম্পাতিকে শুনাইলেন।

হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত বাঙ্গালী কবি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালা রামায়ণে ইহা সুন্দরাকাণ্ডে জাম্ববানের মুখে এবং তাহার নিজের মুখে বসানো হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে ইহা অগস্ত্যের মুখে কথিত। হনুমান লম্ফ দিয়া সাগর উত্তরণ করিলে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর সহিত (তুলসীদাসের রামায়ণে লঙ্কিনী রাক্ষসী) তাঁহার একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হয় এবং রাক্ষসী পরাভূতা হয়। বাঙ্গালী কবি এই রাক্ষসীকে চামুণ্ডা-রূপা শঙ্করীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। চামুণ্ডা হনুমানকে রামচন্দ্রের দূত বলিয়া জানিতে পারিয়া লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

বাল্মীকি লঙ্কার ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় লঙ্কাসুন্দরীদের রূপযৌবন ও ভোগলীলার বর্ণনায় বহু পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি এই অংশ একপ্রকার বর্জ্জনই করিয়াছেন। আর্ষ-রামায়ণে আছে—রাবণ সীতাকে বশীভূত করিবার জন্য নানা ভাবে প্রলুব্ধ করিতেছে—সীতা কটুবাক্যে রাবণকে যথোচিত তিরস্কার করিতেছে। বাঙ্গালীকবি এস্থলে সীতার মুখে যে কথাগুলি বসাইয়াছেন—তাহা বাল্মীকির রামায়ণে সীতাহরণের সময় বিবৃত সীতার কটূক্তিরই (অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারে রচিত) প্রতিধ্বনি। বাল্মীকির রামায়ণে ধান্যমালিনী রাবণকে ভুলাইয়া সীতার নিকট হইতে লইয়া গেল। প্রচলিত রামায়ণে আছে মন্দোদরী নলকুবরের অভিশাপের কথা স্মরণ করাইয়া সীতার উপর অত্যাচারের ব্যাপারে রাবণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে। বাল্মীকির রামায়ণে রাবণ নিজেই বলিয়াছে—'ব্রহ্মার অভিশাপ আছে, কোন নারীর অনিচ্ছায় আমি যদি তাহার উপর অত্যাচার করি, তবে আমার মুণ্ডপাত হইবে।'

বাঙ্গালী কবি ত্রিজটার স্বপ্নকে সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লঙ্কাদহন ব্যাপার লইয়া কবি রঙ্গরহস্য করিয়াছেন—তাহা এক হিসাবে উপাদেয়ই হইয়াছে।

হনুমান সীতার বার্ত্তা জ্ঞাপনের সময় প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য একটি কাহিনী রামকে বলেন—এই কাহিনীই জয়ন্তকাকের নেত্রভেদ-কাহিনী। পুঁথির রামায়ণে দেখা যায়—এই কাহিনীটি কৃত্তিবাস চিত্রকূটে অবস্থিতির প্রসঙ্গে আগেই বলিয়া লইয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে বিভীষণ কয়েকটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের জন্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। রাবণ তাহাতে বিভীষণকে কুপিত কণ্ঠে বলিল—"তুমি জ্ঞাতি, তুমি হিংসা-বশতঃ এ কথা বলিতেছ।" ইহাতে বিভীষণ ব্যথিত হইয়া চারিজন অনুচর সহ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রামের নিকট চলিয়া আসেন।

বাঙ্গালী কবি বিভীষণের উপদেশ অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। রাবণ দুই চারিটি অপ্রিয় সত্য-কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বিভীষণকে পদাঘাত করিল। ইহাতে অভিমানে বিভীষণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুবেরের কাছে চলিয়া যান এবং কুবেরের উপদেশে রাম-পক্ষে যোগ দেন। বিভীষণ রামের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য বলিলেন—'আমি যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন কলির ব্রাহ্মণ হই।' এই সূত্রে বাংলা রামায়ণে কবি খুব একচোট সেকালের বাংলার ব্রাহ্মণদের গালাগালি করিয়া লইয়াছেন।

কৃত্তিবাসের মতে কুম্ভকর্ণের ধারণা ছিল—রামচন্দ্র স্বয়ং নারায়ণ। কুম্ভকর্ণ যে রাবণকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন—সে কথা কিন্তু প্রচলিত রামায়ণে নাই। সেতু বন্ধনের ব্যাপারে কাঠবিড়ালীর কাহিনীটি বাঙ্গালী কবির নিজস্ব।

বাল্মীকির রামায়ণে মাল্যবানের সদুপদেশ দানের কথা আছে। বাঙ্গালী কবি সে উপদেশ নিকষার (কৈকসীর) মুখে আরোপ করিয়াছেন। রাবণের সভায় অঙ্গদের দৌত্যের কথা আর্ষ রামায়ণে আছে কিন্তু, তাহাতে আছে অঙ্গদ রামের প্রেরিত বার্ত্তা রাবণকে জানাইয়া রাবণের প্রাসাদ-শিখর চূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রচলিত রামায়ণে যে অঙ্গদ-রায়বার সংযোজিত

হইয়াছে—তাহা একটি চমৎকার তরজা। এখানে রাবণ ও অঙ্গদের কথা-কাটাকাটির মধ্যে কবি রাবণের উপর যত রাগ ছিল সব ঝাড়িয়াছেন। ইহা কবিচন্দ্রের রামায়ণ হইতে প্রচলিত রামায়ণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অঙ্গদ রাবণকে অকথ্য গালাগালি দিয়া তাহার মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়া এক লাফে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীদাসের রামায়ণেও অঙ্গদ ও রাবণের কথা-কাটাকাটি একটি সরস রচনা।

কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রয়াস লইয়া বাঙ্গালী কবি একটু রঙ্গরহস্য করিয়াছেন। কুম্ভকর্ণ-বধে চৌশট্টি যোগিনীর আবির্ভাব অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত।

মূল রামায়ণে কুম্ভকর্ণের পর ত্রিশিরা নরান্তক, দেবান্তক, ঋষভ, মত্ত, অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ, মকরাক্ষ, বিরূপাক্ষ, মহোদর, মহাপার্শ্ব ইত্যাদি রাক্ষসগণের সেনাপতিত্ব ও পতনের কথা আছে।

প্রচলিত রামায়ণে যথাক্রমে ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, মহাপার্শ্ব, অতিকায়, তরণীসেন, বীরবাহু, ধূম্রাক্ষ, ভস্মলোচন, মহিরাবণ, অহিরাবণের যুদ্ধ ও পতনের কথা বিবৃত হইয়াছে।

তুলসীদাসে এতগুলি রাক্ষসের পৃথক পৃথক যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় নাই।

বিভীষণের পুত্র তরণীসেন যুদ্ধে গেলেন। ইচ্ছা—'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে।' 'মরিলে রামের হাতে গোলোক-নিবাস।' 'আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রাম নাম।' কিন্তু সে ভীষণ যুদ্ধ করিল। রামের দেহে তরণীসেন বিশ্বরূপ দেখিল। সে যোড়হাতে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিল। রাম ভক্তের প্রতি সদয় হইলেন—তাহাকে বধ করিবেন কি করিয়া? তরণী দেখিল—তবে ত গোলোক-বাস হয় না। তখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া রামকে গালাগালি দিতে লাগিল। রামচন্দ্র ভাবিলেন—'তবে ত এ বেটা ভণ্ড। এক্ষণি ইহাকে বধ করিতে হয়।' পিতা বিভীষণ বলিলেন—ব্রহ্মাস্ত্র

ছাড়া অন্য অস্ত্রে ইহার মৃত্যু হইবে না। রাম ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। তরণীর কাটা মুণ্ড রাম-নাম করিতে লাগিল। বিভীষণ কাঁদিতে লাগিল। তরণী যে বিভীষণের পুত্র বিভীষণ পূর্ব্বে একথা গোপন রাখিয়াছিলেন। পুত্রের বৈকুণ্ঠবাসে বাধা দিবেন কি করিয়া? বলা বাহুল্য, এসব কথা বাল্মীকির রামায়ণে নাই। রামভক্তির এমনি শক্তি যে পিতা অনায়াসে পুত্রবধের সহায়তা করিলেন।

প্রচলিত রামায়ণে আছে—মকরাক্ষ যুদ্ধে আসিল—ষাঁড়ে-টানা রথে এবং রথের চারিপাশে গোরু বাঁধিয়া। "মকরাক্ষ এসেছিল, বুদ্ধিবল সরু। যুদ্ধ জিন্তে এসেছিল রথে বেঁধে গরু।" রামচন্দ্র গোবধ করিবেন কি করিয়া? অতএব সে গো-দুর্গে থাকিয়া জয়ী হইবে। বায়ুবাণে আগে গোরুগুলিকে উড়াইয়া তাহাকে বধ করিতে হইল। শুনিয়াছি, রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠানরা এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহা হইতেই বাংলার কবি ইঙ্গিত পান নাই ত?

আর একটি বৈষ্ণব-রাক্ষস বীরচূড়ামণি বীরবাহু। সে তপস্যা করিয়া পাইয়াছিল একটি অজেয় হস্তী,—বর লাভ করিয়াছিল নারায়ণের হাতে মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাস। সেও তরণীসেনের মত রামচন্দ্রে নারায়ণ দর্শন করিয়া রণক্ষেত্রে স্তবস্তুতি করিল এবং বৈষ্ণবাস্ত্রে যে তাহার মৃত্যু হইবে রামচন্দ্রকে একথাও বলিয়া দিল। তাহারও কাটামুণ্ড রাম নাম করিতে লাগিল। এই বীর-বাহুর কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণেই পাঠ করিয়া মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যের গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু গেল যমপুরে—বীরবাহু কিন্তু 'যমপুরে' না গিয়া বৈকুণ্ঠপুরে চলিয়া গেল।

প্রচলিত রামায়ণেই আমরা ভস্মলোচনের সাক্ষাৎ পাই। এই রাক্ষস বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বর পাইয়াছিল—'সে যাহার পানে চাহিবে সেই পুড়িয়া মরিবে।' বিভীষণের উপদেশে রাম মন্ত্রময় অস্ত্র প্রয়োগে

রণক্ষেত্র দর্পণময় করিলেন। বোকা রাক্ষস দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই পুড়িয়া মরিল।

শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার জন্য হনুমান ওষধি-পর্ব্বত আনয়ন করেন। এই ব্যাপার লইয়া বাল্মীকির কয়েকটি মাত্র শ্লোক আছে। বাঙ্গালী কবি এই ব্যাপারটি লইয়া একখানি ছোট শিশুরঞ্জন কাব্য লিখিয়াছেন।

রাবণ কালনেমিকে পাঠাইলেন বাধা দিবার জন্য। কালনেমি যদি হনুমানকে সেখানকার কুম্ভীরিণীর কবলে পাঠাইতে পারেন—তাহা হইলে সে লঙ্কার অর্দ্ধেক অংশ পাইবে। কালনেমি অর্দ্ধেক লঙ্কা কিভাবে ভাগ করিয়া লইয়া কিরূপে ভোগ করিবে তাহারই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ইহা হইতেই—'কালনেমির লঙ্কা ভাগ' এই চলতি গতের সৃষ্টি হইয়াছে। গন্ধমাদন পর্ব্বতে কুম্ভীরিণী বধ, সূর্য্যদেবের বাধা দান—সূর্য্যকে কক্ষতল গত করা—তিনলক্ষ গন্ধর্ব্ব বধ—কালনেমি বধ ইত্যাদি লইয়া রচিত উপাখ্যানটি বাঙ্গালা রামায়ণে দেখা যায়। হনুমান অযোধ্যার উপর দিয়া গন্ধমাদন বহিয়া আনিতেছিল —ভরতের বাঁটুলে (ইহা একরূপ anti-air craft ?) হনুমান ধরাশায়ী হইল। বশিষ্ঠের প্রভাবে হনুমান রক্ষা পাইল—ইত্যাদি অনেক আজগুবি কথা এই প্রসঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। যতই আজগুবি হোক, বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন—'শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন। অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ'॥ কৃত্তিবাস নিজেই বলিয়াছেন—"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে। বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।" কালনেমি ও কুম্ভীরিণীর কথা তুলসীদাসের রামায়ণেও আছে। কালনেমির বাধাদানের কথা তুলসীদাস সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে পাইয়াছেন।

তারপর পাতাল হইতে শাক্ত মহীরাবণের আগমন, তাহার ছলনা, রাম-লক্ষ্মণের অপহরণ, হনুমানের পাতাল-গমন, সেখানে কৌশলে মহী-রাবণ বধ, রাণীর যুদ্ধ—হনুমানের পদাঘাতে অহিরাবণের জন্ম—সদ্যোজাত

অহিরাবণের ভীষণ যুদ্ধ ও মৃত্যু—বাঙ্গালা রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত কিংবা সংযোজিত হইয়াছে।

মূল রামায়ণে রাবণ-বধের জন্য বিশেষ কিছু নূতন আয়োজন নাই। অগস্ত্য আসিয়া আদিত্য-হৃদয় স্তব শুনাইয়া গেলেন। তাহাতে সূর্য্য প্রসন্ন হইলেন। ইন্দ্র রথ পাঠাইলেন। রাম ব্রহ্মাস্ত্রের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন—ইন্দ্ররথের সারথি মাতলি ঐ অস্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই অস্ত্র রামচন্দ্র অগস্ত্যের নিকট হইতে পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই রাবণের মৃত্যু হইল।

তুলসীদাস বলিয়াছেন—বিজয় লাভের জন্য রাবণ যজ্ঞ করিতেছিল—বিভীষণের উপদেশে বানরগণ যজ্ঞ ধ্বংস করিল। যুদ্ধে রাবণ নানা মায়ার সৃষ্টি করিতে লাগিল, কিছুতেই মরে না। তখন বিভীষণ বলিলেন—রাবণের নাভিতে অমৃত-কুণ্ড আছে, নাভিকুণ্ড ভেদ করিলে মৃত্যু হইবে। রাম নাভিকুণ্ডে বাণ মারিয়া রাবণবধ করিলেন।

বাঙ্গালীকবি এত সহজে রাবণকে বধ করিতে দেন নাই। রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে অম্বিকার স্তব করিল। অম্বিকা আসিয়া রথে রাবণকে কোলে করিয়া বসিলেন। রাম নিরুপায়। ব্রহ্মা আসিয়া অম্বিকার পূজা করিবার জন্য রামকে উপদেশ দিলেন। অকালে দেবীর বোধন ও পূজার কথা কৃত্তিবাস বৃহদ্ধর্ম পুরাণ হইতে পাইয়াছেন। ব্রহ্মা দেবীকে বলিয়াছেন—রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতোময়া॥ এই সুযোগে কবি দেবীর কাছে নিজের দুঃখের কথাটাও বলিয়া লইয়াছেন "অশনবিহীন তনু জীর্ণ শীর্ণ মোর। কৃত্তিবাস কহে মা দুঃখের নাহি ওর।" বলা বাহুল্য নীলপদ্মের গল্প কৃত্তিবাসের নিজের কল্পনা-প্রসূত। এখন শরৎকাল, —অকাল। অকালে বোধন করিয়া রাম দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন—১০৮টি নীল পদ্মের একটি অম্বিকা চুরি করিলেন—রাম নিজের নীলপদ্মের মত চক্ষু

উপড়াইয়া উপমেয়ের দ্বারা উপমানের অনুকল্প সাধন করিতে গেলেন—তখন অম্বিকা প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু তখনও তিনি রাবণকে ত্যাগ করেন নাই। হনুমান চণ্ডী অশুদ্ধ করিলেন,—তখন অম্বিকা রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিষ্পত্তি হইল না। যে অস্ত্রে রাবণ মরিবে সে অস্ত্র ব্রহ্মা রাবণকে দিয়াছিলেন, সে অস্ত্র রাবণের গৃহে ছিল। হনুমান মন্দোদরীকে ভুলাইয়া সে অস্ত্র লইয়া আসিল।

বাঙ্গালী কবি শেষ পর্য্যন্ত রাবণকে রামভক্ত বানাইয়াছেন। যুদ্ধযাত্রা-কালে মন্দোদরী বলিলেন—"শ্রীরাম মনুষ্য নয় বিষ্ণু অবতার।" রাবণ বলিল—"তাহা আমি জানি—মরিব রামের হাতে যদি ভাগ্যে আছে।—তাহার পর বৈকুণ্ঠে যাইব। আমার মত ভাগ্যবান্ কে?" রণস্থলে রাবণ রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিল। রাম প্রসন্ন হইয়া অস্ত্র সংবরণ করিলেন। তখন দেবগণ দুষ্টা সরস্বতীকে রাবণের কণ্ঠে পাঠাইলেন। রাবণ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া বলিল—"এ সময়ে মোর মাথে দেহ শ্রীচরণ। অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।" রাম বলিলেন—'রাজনীতি কিছু জানি না—মরিবার আগে কিছু উপদেশ দিয়া যাও।' রাবণ একটি উপদেশ দিয়া চক্ষু মুদিলেন।

রাবণবধের পর যুদ্ধকাণ্ডের শেষাংশে বাঙ্গালীকবি কয়েকটি ছোটখাটো নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। মন্দোদরী আসিয়া রামকে প্রণাম করিলেন। রাম বাঙ্গালী পিসিমার মত আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন—"জন্ম এয়ো হও।" শেষকালে তিনি রাবণের চিতা অনির্বাণ রাখিয়া এবং মন্দোদরীকে বিভীষণের রাণী করিয়া নিজের বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

সীতা আসিতেছিলেন—রামদর্শনে, মন্দোদরী মধ্যপথে সীতাকে অভিশাপ দিল—"বিষ দৃষ্টে তোমারে হেরিবে রঘুনাথ।" সীতা আসিলেন সোনার চতুর্দ্দোলায়। বানরেরা সীতাকে দেখিবার জন্য ভিড় করিতেছিল। বিভীষণ তাহাদিগকে কশার আঘাতে দূর করিয়া দিতেছিল। রাম নিষেধ

করিয়া বলিলেন—"রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী, মাতারে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি।" বাল্মীকি এখানে বলিয়াছেন—"গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়—এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র। চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ।" রামের কঠোরোক্তির উত্তরে কৃত্তিবাসের সীতা যাহা বলিয়াছেন—তাহা বাঙ্গালীর মেয়েরই মত।

ইন্দ্রের বরে সুধাবৃষ্টির ফলে মৃত বানরগণ জীবিত হইল—মৃত রাক্ষসগণ পুনর্জীবিত হইল না। রাম কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন—"রামে মার শব্দ ক'রে মরেছে রাক্ষস। রাম নাম শব্দ ক'রে গেছে স্বর্গবাস। শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার। অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার।" সেজন্য রাক্ষসগণ আর ভৌতিক দেহে জীবন লাভ করিল না। ইহা বাঙ্গালী কবির রামভক্তি-প্রচারের একটি কৌশল।

বানরদের পরিতুষ্টির জন্য বাঙ্গালী কবি একটা বাঙ্গালী ধরণের ভোজ দিয়াছেন। তারপর রাক্ষস ও বানরগণ রামের সঙ্গে অযোধ্যায় গেলেন। "চলিল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর। এতেক চড়িল গিয়া রথের উপর।" পুষ্পক রথে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যত লোক, তত লোকই চড়িল। লক্ষ্মণ সাগরের অনুরোধে সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন।

পথে ভরদ্বাজের আশ্রমে বাঙ্গালী মতে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন হইল। স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়া রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইলেন। তারপর গুহকের দেশে রাম আসিলেন। এখানে বাঙ্গালীকবি বাঙ্গালার বাগ্দীপাড়ার একটা নৃত্যোৎসবের (রায়বেঁশে নাচ ?) বর্ণনা করিয়াছেন।

রামের কৈকেয়ী-সম্ভাষণ বাঙ্গালা রামায়ণের একটি চমৎকার অংশ। সীতা বানরগণকে নানা উপহার দিলেন—হনুমানকে তাঁহার কণ্ঠের হার দিলেন, হনুমান তাহা দাঁতে ছিঁড়িয়া ফেলিল। ইহা হইতে 'বানরের গলে মুক্তাহার' এই চলতি গতের সৃষ্টি। হনুমান বলিলেন, যাহাতে রাম-নাম নাই তাহা

তাহার কাছে তুচ্ছ। লক্ষ্মণ বলিলেন—তোমার দেহেও ত রামনাম নাই—তবে কেন তাহা ধারণ কর? হনুমান বুক চিরিয়া দেখাইলেন—'পঞ্জরে পঞ্জরে শত রাম নাম লেখা।' যাত্রার অভিনয়ে এই উপাখ্যানটি বাঙ্গালীর রামভক্ত মনকে কি আনন্দই না দেয়!

এই সঙ্গে হনুমানের ভোজনের একটি গল্প আছে। কিছুতেই হনুমানের পেট ভরে না। শেষে সীতা নমঃ শিবায় বলিয়া হনুমানের মাথায় অন্ন দিলেন—তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল অর্থাৎ হনুমান শিবাবতার।

বাঙ্গালী কবি লক্ষ্মণের চৌদ্দবৎসর ধরিয়া অনশন ও অনিদ্রার একটি কাহিনী বলিয়াছেন। তারপর লক্ষ্মণ-ভোজন। এখানে একদফা খুব বাঙ্গালী ভোজের বর্ণনা আছে।

উত্তরাকাণ্ডের অধিকাংশ রাবণের কাহিনী। সীতাহরণের সময় হইতে রাবণের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়াছে। এত কাল রাবণ কি কি করিয়াছে অগস্ত্য রামচন্দ্রের সভায় সমস্ত বলিলেন। বাঙ্গালী কবি মোটামুটি বাল্মীকিকেই এই ব্যাপারে অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যাপারে বাঙ্গালী কবির নিজস্বতা আছে। যেমন—রম্ভার কাহিনী। ইহা অতি সংক্ষেপেই বাল্মীকি সারিয়াছেন। এই ব্যাপারটা লইয়া বাঙ্গালী কবি বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন এবং কাহিনীটিকে কদর্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নারীজাতির সম্বন্ধে যে সকল উক্তি সংযোজিত হইয়াছে—তাহাতে নারীত্বের অবমাননাই হইয়াছে।

হনুমানের উপাখ্যান সম্বন্ধে আর্ষ রামায়ণে আছে—দেবতাদের বরে হনুমান অজেয় হইয়া ঋষিদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ঋষিরা অভিশাপ দিলেন—তোমার এই অমিত শক্তির কথা তুমি বহুকাল পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। তোমার চিত্ত সর্ব্বদা ভৃত্য-ভাবে (Slave mentality) আবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন—হনুমান গুরুর আশ্রমে পঠদ্দশায় "গুরু পড়াইতে মারে তারে ঘৃণা করে" এই অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মূল রামায়ণে হনুমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। বাঙ্গালী কবি হনুমানের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মিতবাক। তাহা ছাড়া, অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে হনুমানের আত্মবিস্মৃতি ও ভৃত্য-ভাবের মধ্যে যে মনস্তত্ত্বগত সম্বন্ধ আছে আত্মবিস্মৃত জাতির কবি তাহা ধরিতে পারেন নাই।

সীতা-বর্জ্জনের ঘটনায় বাঙ্গালী কবি রাবণের চিত্রাঙ্কনের একটা ধূয়া তুলিয়াছেন। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সীতা-বর্জ্জনের পর রামের সান্ত্বনার জন্য হিরণ্ময়ী সীতা-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল—এইরূপ কথা বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন। মূল রামায়ণে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যই এই মূর্ত্তি পরিকল্পিত।

মূল রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্পের আগে যাঁহারা অশ্বমেধ করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের কাহিনী রামচন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালা রামায়ণে সে সব কাহিনীর কথা নাই। বাঙ্গালা রামায়ণে যজ্ঞাশ্ব বাল্মীকির আশ্রমে গেল,—লবকুশ অশ্ব ধরিল,—কোশলরাজ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ হইল,—লবকুশ দুই ভাইএ সমস্ত ধ্বংস করিল। ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ ও তাঁহাদের পুত্রগণের পতন হইল—রামচন্দ্রও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শেষে বাল্মীকি সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এসমস্ত আজগুবি ব্যাপার বাল্মীকির রামায়ণে নাই। কাহিনী শেষ করিয়া কৃত্তিবাস বলিয়াছেন—

এসব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে। সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে।

লবকুশের যুদ্ধ ভবভূতির উত্তররাম চরিতের একটি বিশিষ্ট অংশ। ভবভূতি সম্ভবতঃ পদ্ম পুরাণ হইতে উহা পাইয়াছিলেন।

এইবার পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডের সহিত প্রচলিত রামায়ণের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। উত্তরাকাণ্ডের প্রারম্ভ দুই

রামায়ণেই এক কাহিনী লইয়া। পরিষদের সংস্করণে মুনিগণের একটা প্রকাণ্ড তালিকা আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা নাই,—ইহার প্রারম্ভ কবিত্বময়। ইন্দ্রজিৎ বধের যোগ্যতা প্রসঙ্গে পরিষদের সংস্করণে লক্ষ্মণের সংক্ষিপ্ত কৈফেয়তেই রামচন্দ্র পরিতুষ্ট। প্রচলিত রামায়ণে এই প্রসঙ্গ রামচন্দ্রের জেরা ও লক্ষ্মণের বিস্তৃত কৈফেয়তে দীর্ঘ। কাহিনীটি অতিরিক্ত অলৌকিক এবং শিশুরঞ্জন হইয়া উঠিয়াছে।

পরিষদের সংস্করণে হরগৌরীর বিবাহের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। তুলসীদাসের রামায়ণে ইহা বালকাণ্ডে আছে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে শিবের উপাখ্যান অপরিহার্য্য ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে শিব ধর্ম্মঠাকুরের দৌহিত্র—ইনি ক্ষেত্রপাল, কৃষির দেবতা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবের পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও লৌকিক রূপের একটা মিশ্রণ দেখা যায়। লৌকিক রূপে নিঃসম্বল ভিখারী শিবের বিবাহ ও অশান্তিময় সংসার-যাত্রার কল্পনা করা হইয়াছে। কৃত্তিবাসেও শিবের লৌকিক রূপকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—ইহার সঙ্গে পৌরাণিক নারদ ও বৌদ্ধ ভীম (ভৃত্য) আছেন। প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলিতে শিবের বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া রঙ্গরহস্য করা হইয়াছে—বাঙ্গালী সংসারের একটা বৈবাহিক চিত্রেরও আভাস দেওয়া হইয়াছে। কৃত্তিবাস সেই প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন, এক হিসাবে প্রবর্ত্তনই করিয়াছেন—বলা যায়। রামায়ণের মূল গল্পের সঙ্গে ইহার যোগ নাই—এই কাহিনী কেবল সে-কালের আদর্শের কাব্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল উপাখ্যানের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া ইহা বর্জ্জিত হইয়াছে।

পরিষদের সংস্করণে সুমেরুর শৃঙ্গ হরণ, লঙ্কা-নির্ম্মাণ, পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে—প্রচলিত রামায়ণে এইগুলির বদলে আছে,—গজকচ্ছপের যুদ্ধ, গরুড়পবনের যুদ্ধ ইত্যাদি। কুবের ও রাবণ ইত্যাদির জন্ম—রাবণের

লঙ্কাপুরী অধিকার, কুবের-বিজয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ দুই রামায়ণেই প্রায় এক, ভাষা বিভিন্ন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয়, জমদগ্নিমুনির আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণ, রাজার কপিলা প্রার্থনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ, জমদগ্নিবধ, পরশুরামের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুনবধ, পরশুরামের ক্ষত্রিয়-বংশধ্বংসের জন্য অভিযান, শরণাগত দশরথের অব্যাহতি ইত্যাদি কাহিনী বিস্তৃত ভাবে দেখা যায়—প্রচলিত রামায়ণে এই সমস্ত বর্জ্জিত হইয়াছে।

রেণুকার সহমরণ-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস সহমরণের উচ্ছ্বসিত মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন। যমের সহিত যুদ্ধ-প্রসঙ্গে আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি দানধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন—বৌদ্ধনীতির প্রভাব বলিয়া মনে হয়। এই রামায়ণে নিবাত-কবচের সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী, নাগরাজের সহিত যুদ্ধ ও নাগরাজকন্যা-বিবাহ, বরুণপুরী জয় ইত্যাদির কাহিনী আছে। এগুলি প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে।

আসল রামায়ণে কৃত্তিবাস বলিরাজের পুরীতে রাবণকে লইয়া গিয়া মনের সাধে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছেন। বলিরাজের সহিত যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হইয়া খাঁচায় বন্দী হইয়া তাঁহার আস্তাবলে বৎসর খানেক বাস করিল। খাঁচার ভিতরে রাবণ ক্ষুধায় কাতর। "অন্ন হাথে করিয়া বলিছে দাসীগণ। হের অন্ন হাথে নৃত্য করহ রাবণ। খাঁচার ভিতরে নাচে রাক্ষসের নাথ। ক্ষুধাতে ব্যাকুল হঞা পাতে কুড়ি হাত।" শুধু তাহাই নয়—"বলির দাসীর আঁঠ্য খাইল দশানন।" "কুপিল বলির দাসী ঝাঁটা নিল হাতে। আথালি পাথালি মারে রাবণের মাথে॥ বাড়ি হাথে করি খোঁচা মারে কোন জনা। খাঁচাতে ভরিআ হাথ কেহো মারে ঠোনা॥ মারণে কাতর হঞা রাজা দশানন। বলিরাজা সোঙরিআ জুড়িল ক্রন্দন॥"

ভাগ্যে মাইকেল কৃত্তিবাসের আসল পুঁথি দেখিতে পান নাই—তাই কৃত্তিবাস মাইকেলের লেখনী হইতে সনেট উপহার পাইয়াছিলেন। রাবণকে

কৃত্তিবাস এতই হীনচেতা করিয়াছেন যে খাঁচা হইতে অব্যাহতি পাইয়া—

রথে চড়ি রাবণ বাজায় জয়ঢোল। বলিকে জিনিল বলি করে গণ্ডগোল।"

মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ, কপিলদেবের কাছে রাবণের পরাজয়, রাবণের লক্ষলক্ষ নারী হরণ, নারীগণের উদ্ধারের জন্য কালকেয়ের মহারণ, রাবণের ভগিনীপতিবধ, সূর্পণখার অভিযোগ ও তাহার দণ্ডকারণ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণের আদেশ।" হনুমানের জন্মকথা, হনুমানের বাল্য ও যৌবনের কথা, বালী-সুগ্রীবের জন্ম ও তাহাদের দ্বন্দ্ব, দিলীপের অশ্বমেধ, রঘুর ইন্দ্রজয়, আত্মদান, গুরুদক্ষিণাদান—এইগুলি প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। কোন কোনটি অবশ্য অন্যান্য কাণ্ডে আছে। আসল রামায়ণে রাবণের স্বর্গ-বিজয়ের কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ—কৃত্তিবাস চণ্ডীকেও যুদ্ধে নামাইয়াছেন।

আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল রামায়ণের অনুসরণে ইন্দ্রের লঙ্কাপুরে বন্দীদশায় অবস্থান—ব্রহ্মার চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধার এবং ইন্দ্রের বন্ধনের কারণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে এ সমস্ত বর্জ্জিত হইয়াছে। বানর-রাক্ষসদের বিদায়-দৃশ্য কৃত্তিবাস বড়ই করুণ করিয়া আঁকিয়াছেন—ইহাতে রামচন্দ্রের চরিত্রের 'কুসুমাদপি মৃদুত্ব' ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণে মৃগরাজার কথা, যযাতির জরহরণ, অগস্ত্য বশিষ্টের জন্ম, নিমির কাহিনী, ব্রাহ্মণ ও কুকুরের কাহিনী ইত্যাদি আছে—এসব প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে শম্বুক ঋষির তপস্যা, ব্রাহ্মণপুত্রের অকাল মৃত্যু, শম্বুক বধ, শম্বুকের উদ্ধার, মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের পুনর্জীবন ইত্যাদি কাহিনী আছে—পরিষদের রামায়ণেও বিস্তৃত ভাবেই আছে। প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বর্দ্ধমান জেলার আগরি জাতির একটা ইতিহাস দিয়াছেন। শূদ্র শম্বুকের দুই পত্নী

ছিল—একটি শূদ্রী, একটি ব্রাহ্মণী। তাহাদের বাইশ জন পুত্রকে হনুমান বর্দ্ধমান জেলায় উপনিবিষ্ট করিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণই আগরি। এই অদ্ভুত কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের কোন সম্পর্ক নাই। কৃত্তিবাস ইহা রামায়ণে জোর করিয়া প্রবিষ্ট করিয়াছেন। প্রচলিত রামায়ণে এ কাহিনী বর্জ্জিত হইয়াছে। তারপর কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে—ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান, শ্বেতরাজার উপাখ্যান, দণ্ডের উপাখ্যান ও দণ্ডকারণ্য সৃষ্টির কাহিনী, বৃত্রাসুরের কাহিনী, ইন্দ্রীপের কাহিনী বা ইলার উপাখ্যান। শ্বেতের উপাখ্যান ছাড়া অন্যগুলি প্রচলিত রামায়ণে বর্জ্জিত।

পরিষদের রামায়ণে লবকুশের যুদ্ধ ও অযোধ্যা-ভ্রমণ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত। প্রচলিত রামায়ণে সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাস এই প্রসঙ্গের কিছু অংশ দীর্ঘ ত্রিপদীতে রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাস এই প্রসঙ্গে বাণিয়া ও মালিনীর বিবাদের অবতারণা করিয়া অযোধ্যাকে প্রায় বর্দ্ধমান করিয়া তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের শেষাংশ সম্পূর্ণ বাল্মীকির অনুসরণ। প্রচলিত রামায়ণে অতি সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাস শেষে নিজের রামায়ণের মহিমাগান করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের গীত শুনি বড়ই মধুর। শুনিআ গীতিকা পুণ্য পাপ হয় দূর॥
তালশব্দে বাজে নূপুর ঝন ঝন। গীতশব্দে গাইল শুন রামায়ণ।
ব্রাহ্মণে শুনিলে পায় গুরুর পূজা। ক্ষেত্রি শুনিলে হয় পৃথিবীর রাজা॥
বৈশ্য শুনিলে নানা ধনে বাঢ়য় ঘর। শূদ্র শুনিলে হয় ভকতি বিস্তর॥
সংসারে ভ্রমিয়ে বুলে কৃত্তিবাস পাঁচালী। যাহার প্রসাদে শুনি নানা অর্থকেলি॥
যাহার প্রসাদে শুনি এই রামায়ণ। হেন পণ্ডিতে আশিস করে দেব নারায়ণ।
রামের গমনে রামায়ণ করি সকলি। সাতকাণ্ডে পোথাগান রচিল পাঁচালী।

আসল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যে সকল কথা সংক্ষেপে আছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা বিস্তৃত করিয়া বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। উত্তরাকাণ্ডে

যে সকল কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে—প্রচলিত রামায়ণে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

আসল রামায়ণে পয়ার পংক্তিগুলিতে মাত্রার বেশি কম আছে—প্রচলিত রামায়ণে সেগুলিকে চৌদ্দ মাত্রায় পরিণত করা হইয়াছে। আসল রামায়ণে খাঁটি বাংলা শব্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়—প্রচলিত রামায়ণে সেগুলির বদলে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রচলিত রামায়ণে বহুস্থলে রসান দেওয়া হইয়াছে এবং রঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবিত্বের দিক হইতে অনেকস্থল যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়। আবার অনেক স্থলে অতিরিক্ত কুরুচি-বিড়ম্বিত হওয়ায় কৃত্তিবাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনকাব্যে আমরা দেখিতে পাই—এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা ধরিয়া নামের তালিকা। কৃত্তিবাস সেকালের প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রচলিত সংস্করণে নামের তালিকাগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে।

আসল রামায়ণে সংজ্ঞাবাচক নামগুলির বিকৃত বানান দৃষ্ট হয়। যেমন—কার্ত্তিকবীর্য্য (কার্ত্তবীর্য্য), হরিহয় (হৈহয়), পৌলম (পুলমা), ঋষ্যামুখ (ঋষ্যমূক), মেঘবান (মঘবান্), জরাসিন্ধু (জরাসন্ধ)। কৃত্তিবাসের আসল রামায়ণের ভাষা অনেকস্থলে দুর্বোধ্য। যেমন—লেঙ্গে ডাবুশ মারে কাণ্ড চিয়াড়ি। পারা মাদল ভেরু, দোসরি কাহাল। হাত কুড়াইলেক রাজা নিকলিল পানি। বিহন্দে বিহন্দে বার সাণ্ডাইল ভিতরে। গাহুল ধৌম্বল পড়িল চিলচণ্ডা জাতি। কৃত্তিবাসের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ নগরে অপরিচিত হইয়া গিয়াছে—আমাদের পল্লীঅঞ্চলে আজিও চলে। যেমন—রা কাঢ়া, হাঁকার, গোহারি, বিঁহান, ঝিল (চিতা), কাঁকতলী, খাম্বা, ডাঙ্গ, রাঁড়, অথান্তরে, জুয়ায়, ডাগর, পাতিল, প্যাখলানো। *

* বাঙ্গালী কৃত্তিবাস দেব, দানব, রাক্ষস, বানর যাহাদের কথাই বলুন না কেন—ভোজনের কথাটা কোথাও ভুলেন নাই। মধু দৈত্যের গৃহে রাবণ কুম্ভিনসীর পাক-করা

কৃত্তিবাসের নিজস্ব ভাষা কিরূপ ছিল, ঢাকাই সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

(১) রাত্রিদিন বাঞা গিঞা পাইল তপোবন। আশ্রম নিকটে বাসা কৈল ততক্ষণ॥ বুড়ী বেশ্যা বোলে এখন নহে গীদ নাচন। বিভাণ্ডক শাপিঞা পাছে লএত জীবন। কালি বিহানে যাব মুনির তপোবন। সেই কালে দেখিব গিঞা মুনির নন্দন। নিশবদে রহিলা সব নাহিক প্রকাশ। বিভাণ্ডকে শাপিঞা পাছে করে সর্ব্বনাশ। বসিঞাছেন ঋষ্যশৃঙ্গ বেদ উচারিতে। বেশ্যা সব দেখিয়া মুনি উঠিলা আস্তেবেস্তে। আগু বাঢ়াঞা জোড় হাতে করিছেন বিনয়। কোথা হৈতে জায় তোমরা কোনরূপ হয়। বুঢ়ি বেশ্যা বুলিতে লাগিলা হাস্য অভিলাষে। আমি সব মুনি ভ্রমি নানা দেশে।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা

ভাত-ডাল না খাইয়া বল পাইতেছে না। পাতালে বলির গৃহে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রাবণ দাসীদের দেওয়া এঁটো ভাত খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রের মহিষী শচীর গর্ভাবস্থায় পরমান্ন চাই। 'পরমান্নে সম্ভাষণা জানে দেবগণ। সেই পরমান্ন শচী করিল ভক্ষণ'।

ঋষি গৌতম অহল্যার স্বামী হিসাবে ব্রহ্মার জামাতা। তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন—ব্রহ্মা তখন—"ব্রহ্মাণীরে বলে ঝাট করহ রন্ধন। জামাতারে নানা দ্রব্য করাও ভক্ষণ।" হিমালয় গৃহে নারদের সঙ্গে শিব আহারে বসিয়াছেন—নারদ বলিতেছেন—'পিষ্টক পরমান্ন আনিআ তাহাতে দেহ ভাত। দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিও হেলা। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্ত্তমান কলা।" বানরদেরও ফলমূলে চলিতেছে না। "অঞ্জনা রন্ধন কৈল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। চারি বীর মহাসুখে করিল ভোজন।" অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি ইত্যাদি মুনির আশ্রমের আতিথ্যে ভোজনেরই বাড়াবাড়ি। রামসীতা অযোধ্যায় অশোক-কাননে নর্ম্মবিলাসের জীবন-যাপন করিতেছেন—"লক্ষ্মীরূপা সীতা তথা করেন রন্ধন। পায়স পিষ্টক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।" লবকুশ অযোধ্যায় রামায়ণ গান করিতে আসিয়াছেন—কৃত্তিবাস তাহাদিগকেও রন্ধন হইতে অব্যাহতি দেন নাই। "স্নান করিআ আইলা ভাই দুইজন। মায়ে সোঙরিয়া দোঁহে চড়াইল রন্ধন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সুবর্ণের থালে। ভোজন করিআ দোঁহে হইল সুশীতলে।"

সুসংস্কৃত ও সংক্ষেপে সম্পাদিত এবং পরে বটতলায় মোহনচাঁদ শীল কর্ত্তৃক নিয়োজিত পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত পুস্তক বুঝায়।

উভয় রামায়ণের ভাষার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিই—

পরিষদের রামায়ণ

পূর্ব্বজন্মে ছিল কুঁজী ইন্দ্রের অপ্সরা। রামের বনবাস হেতু নাম মন্থরা॥
কেকয়ীর চেড়ী সে ভরতের ধাত্রীমাতা। রামসীতার দুঃখ হেতু সৃজিল বিধাতা॥
বিভাকালে দশরথ দান পাইল চেড়ী। রাম রাজা হব বলি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতি কুচ্ছিত দেখি তারে। সব নষ্ট হঅ কুঁজী থাকে যার ঘরে।
যেমতে মরিব রাবণ ধাতা তাহা জানে। বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥

প্রচলিত রামায়ণ

পূর্ব্বজন্মে ছিল দুন্দুভি নামে অপ্সরা। জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা।
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা। রামের দুঃখের লাগি সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী। রাম রাজা হ'ন দেখি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে। সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে। বিধাতা সৃজিল তারে সেই সে কারণে॥

পরিষৎ—

কি ব্যথা হইল প্রিয়ে তোমার শরীরে। বৈদ্য আনিয়া দড় করিব তোমারে॥
কোন কার্য্য লাগি তুমি কর অভিমান। জে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান।
এত শুনি কেকয়ী রাজার পাল্য আশ। পূর্ব্বকথা রাজার ঠাঞি করিল প্রকাশ।
ব্যাধিপীড়া হঞা নাঞি পায়াছি অপমান। আগে সত্য কর রাজা পিছে মাগি দান।
কেকয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাঞি জানে। সত্য করিল রাজা স্ত্রীয়ের বচনে।
মায়াপাশ জালে জেন বনে মৃগী ঠেকে। প্রমাদ পড়িল রাজা পাছু নাঞি দেখে॥
রাজা কঅ কেকয়ী তুমি কি বলিবি বল। দুই সত্য করি আসি ইথে নাঞি চল॥
জে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান। আছুক অন্যের দায় দিতে পারি প্রাণ॥

প্রচলিত—

ব্যাধিপীড়া হয় যদি তোমার শরীরে। বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে॥
কোন কার্য্যে কৈকেয়ী কর অভিমান। আজ্ঞা কর তাহা তোমা করি আজি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ। পূর্ব্ব কথা তার আগে করিল প্রকাশ॥
রোগ পীড়া নাই মোর পাই অপমান। আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান।
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে। সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে।
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে। প্রমাদ পাড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে॥
ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল। সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছ'ল।
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান। আছুক অন্যের কার্য্য দিতে পারি প্রাণ॥

পরিষৎ—

আর জত রাজকুমার তাহা নাহি গণি। দুর্জয় ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবনে জানি॥
ইন্দ্রজিতের ডরে কেহ নহে স্থির। ত্রিভুবন জিনিঞা কুম্ভকর্ণের শরীর।
মাথা কাটিলে না মরে বৈরী না ধরে টান।
হেন বীর থাকিতে কৈলে ইন্দ্রজিতের বাখান॥
কোন তপ করিলেক কাহার পাইলেক বর।
সভা থাকিতে বাখান কেন রাবণকোঙর॥

প্রচলিত—

মারিল এসব বীর তাহা নাহি গণি। ইন্দ্রজিতে মারিল যে তাহার বাখানি॥
রাবণ-ভ্রাতার ভয়ে কেহ নহে স্থির। ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর।
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান। কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান।
দশমুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর। তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥

পরিষৎ—

কুম্ভকর্ণ তপ করিল অগ্নি চারি পাশে। গ্রীষ্মকালে মাথার উপর সূর্য্য আকাশে॥
বর্ষাকালে কুম্ভকর্ণ থাকে একাসনে। বরিষণের পানিতে বিরতি রাত্রি দিনে॥

শীতকালে থাকে রাত্রে পানির ভিতর। হেন তপ করিল দশ সহস্র বৎসর ॥
দশসহস্র বৎসর তপ কৈল রাক্ষস বিভীষণ।
গন্ধর্ব্ব গীত গায় দেব করে পুষ্পবরিষণ॥

প্রচলিত—

গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে। উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারিমাস থাকে অনশনে। শিলা বরিষণ ধারা সহে রাত্রি দিনে॥
শীতকালে স্নিগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর। এইরূপে তপ করে নিযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ॥

পরিষৎ—

ইন্দ্র-ময়ূর হৈলা কুবের কেকলাস। যম কাক হৈলা বরুণ হৈলা হাঁস।
মরুতরাজা যজ্ঞ করে বেড়িঞা লোকে।
সংগ্রাম দেহ সংগ্রাম দেহ রাবণ রাজা ডাকে।
মরুত বলে আমি তোমা নাহি জানি। পরিচয় দেও যেন আমি চিহ্নি—

*   *   *   *

পূর্ব্বে ময়ূর ছিল নীল আকার। ইন্দ্রের বরে সহস্র লোচন হইল তাহার।

প্রচলিত—

ইন্দ্র হ'ন ময়ূর কুবের কাঁকলাস। যম কাকরূপ হ'ন বরুণ সে হাঁস।
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে। রণং দেহি বলি রাবণ মরুত্তেরে ডাকে।
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি। পরিচয় দেহ আগে তবে আমি জিনি।

*   *   *   *

পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার। ইন্দ্রবরে সহস্র লোচন হৈল তার।

এই সকল প্রচলিত পাঠ জয়গোপালী পাঠও নয়, ইহাকে মোহনচাঁদী পাঠ বলা যাইতে পারে। জয়গোপালের পাঠ মোহনচাঁদ পণ্ডিতদের সাহায্যে কালোপযোগী করাইয়াছেন। জয়গোপালী পাঠে ছিল—পাকল চক্ষে রামের

পানে চাহিলেন বালী। দন্ত কড়মড়ায় বীর রামকে পাড়ে গালি। ইহার মোহনচাঁদী পাঠ হইয়াছে—রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী। দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি।

তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পার্থক্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। প্রধান প্রভেদ—তুলসীদাসের মতে রাবণ ছায়া-সীতা হরণ করিয়াছিল—আসল সীতা অগ্নির মধ্যে রহিয়া গেলেন। অগ্নিপরীক্ষার সময়ে ছায়া-সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলেন, তখন প্রকৃত সীতা অগ্নি হইতে বহির্গত হইলেন। এইভাবে তিনি সীতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত কবির পক্ষে সাক্ষাৎ নারায়ণী সীতার অবমাননার বর্ণনা করা অসম্ভব। জয়ন্ত কাকের উপাখ্যানে তুলসীদাস লিখিয়াছেন—কাক চঞ্চু দ্বারা সীতার চরণ বিদারণ করিল। বাল্মীকি স্তনের কথা লিখিয়াছেন। ভক্ত ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। দুই গ্রন্থের উপাখ্যানাংশে মোটামুটি মিল আছে। বালকাণ্ডের প্রথমাংশে ও উত্তরাকাণ্ডে খুব বেশি অমিল। তুলসীদাসে বালকাণ্ডের প্রথমাংশে হরপার্ব্বতী-লীলা অনেকটুকু স্থান জুড়িয়া আছে। প্রতাপভানু রাজা ও স্বায়ম্ভুব-শতরূপার কাহিনী আছে। প্রতাপভানু ব্রহ্মশাপে রাবণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যার দ্বারা দশরথ হইয়া বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন।

উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামের রাজ্যাভিষেক, রাম-রাজ্যের মহিমা, ভূষণ্ডী কাকের বিবরণ ও নানা-প্রকার তত্ত্ব-কথায় তুলসীদাসের রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞ, লবকুশের যুদ্ধ, শূদ্রকবধ, লবণবধ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, অগস্ত্যের বিবৃত রাবণাদির কাহিনী ইত্যাদি কিছুই নাই। এ সকলের বদলে বহু নৈতিক উপদেশ ও তত্ত্ব-কথা আছে। মাঝে মাঝে শ্রীরামের স্তব আছে। নারদ, সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণ শ্রীরামের স্তব করিতেছে। সীতা-বর্জ্জনের কথাই নাই। ছায়া-সীতা গেল লঙ্কাপুরে কায়া

সীতা কেন বর্জ্জিত হইবে? সীতা-বর্জ্জনও সীতার অবমাননা। ভক্ত কবি সে কথা লিখিতে পারেন না।

তুলসীদাস বালী বা তারার মুখেও রামচন্দ্রের উদ্দেশে একটি কটু কথাও বসান নাই। তিনি আপন উপাস্য দেবতাকে শত্রুর মারফতেও ভক্তিবিরোধী কথা বলিতে চাহেন না। তুলসীদাসের রামায়ণের কোথাও অশ্লীলতা বা কুরুচি নাই। ইহার সর্ব্বত্রই কেবল রামের গুণগান—কেবল মিত্রের মুখে নয়, শত্রুরও মুখে। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থের মত। আবার এক হিসাবে ইহা কাব্যাংশেও চমৎকার। এমন ছন্দোবৈচিত্র্য ও ভাষার পরিপাট্য কৃত্তিবাসে নাই। তবে কৃত্তিবাসে যেরূপ মানব-হৃদয়ের মাধুরী-বৈচিত্র্য আছে, তুলসীদাসে তাহা নাই। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে অনেক স্থলে মানবরূপেই দেখিয়াছেন —তুলসীদাস সর্ব্বত্রই রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন।

(কৃত্তিবাস অনেক স্থলে সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের শ্লোকের অনুবাদ করিয়া ভাষাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ভাষাকে অনলঙ্কৃত ভাষা বলা যাইতে পারে। তবে সুলভ শ্রেণীর উপমা উৎপ্রেক্ষা মাঝে মাঝে যে নাই তাহা নয়। মেঘ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, গঙ্গাধারা এইগুলিই তাঁহার উপমার অবলম্বন। স্থলে স্থলে একটু আধটু বৈচিত্র্য আছে। যেমন—সীতা যার দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ। অলসের বিদ্যা যথা ক্ষীণ দিন দিন।)

বাঙ্গালা রামায়ণের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। ইহাতে বার বার অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। যে দুর্ঘটনা ঘটিবে, পূর্ব্বে তাহার প্রাগাভাস-সূচক একটা করিয়া স্বপ্ন সংযোজিত হইয়াছে। যে যাত্রায় কুফল হইবে—সে যাত্রার প্রারম্ভে কতকগুলি দুর্লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। সকল দুর্ঘটনা কাহারও না কাহারও অভিশাপের ফলেই ঘটিতেছে—এইরূপ দেখানো হইতেছে। মূল রামায়ণে এসমস্ত একেবারে নাই তাহা নহে। কৃত্তিবাস এইগুলির সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। যেমন তুলসী, ফল্গু ইত্যাদির প্রতি সীতার অভিশাপ, তারার

অভিশাপ ও মন্দোদরীর অভিশাপ মূল রামায়ণে নাই। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব বাঙ্গালা রামায়ণে কিছু বেশি। বাঙ্গালা দেশের অনেক কুসংস্কারের কথাও বাঙ্গালা রামায়ণে ঢুকিয়াছে। যেমন—বাসিবিবাহের দিনে দশরথের পত্নীসম্ভাষণের ফলে সুমিত্রার দুর্ভাগ্য, অবিবাহিতা অবস্থায় কোন বালিকার রজস্বলা হওয়ার জন্য অঙ্গরাজ্যে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি ইত্যাদি।

বাঙ্গালা রামায়ণে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বর্জ্জিত হইয়াছে। এই আবেষ্টনীর পট-পরিবর্ত্তনে দেশকালের যে নির্দিষ্ট পরিচয় মূল রামায়ণে দেওয়া আছে—বাঙ্গালা রামায়ণে তাহা পাওয়া যায় না। তাহাতে মনে হয়, সমস্ত ঘটনাই যেন বাঙ্গালা দেশেই ঘটিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও পটভূমিকা যে কবিত্ব সৃষ্টির সহায়তা করে—চরিত্রও চিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিতে সহায়তা করে—বাঙ্গালী কবি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের, মানব-চরিত্রের ও মানব-হৃদয়ের যে সুগভীর যোগ মূল রামায়ণে দেখা যায়, বাঙ্গালা রামায়ণে তাহা নাই। ঋতুতে ঋতুতে মানুষের বেদনারও রঙ বদলায়, একথা বাঙ্গালী কবিরা যে বুঝিতেন না তাহা নয়। বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহারা বারমাস্যা রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। রামায়ণের বাঙ্গালী কবি সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই। মূল রামায়ণে শীত, বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে বিরহ-বেদনার কি রূপ-রূপান্তর ঘটে, তাহা নানা বর্ণ-সম্পাতে অতি সরস ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে অরণ্য কাণ্ডের শেষাংশ ও কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের অধিকাংশ কাব্যাংশে এই জন্যই চমৎকার।

(বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শমানুষ, পুরুষোত্তম, তিনি যে স্বয়ং ভগবান একথা তাঁহার মনেই থাকিত না।) বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কোঽস্মিন প্রথিতো লোকে সদ্‌গুণৈর্গুণিসত্তমঃ।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥

উদারাচার-সম্পন্নঃ সর্ব্বভূত-হিতে রতঃ।
বীর্য্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কশ্চাপি প্রিয়দর্শনঃ॥
জিতক্রোধো মহান্ কশ্চ ধৃতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
সঞ্জাত রোষাৎ কস্মাচ্চ দেবতা অপি বিভ্যতি॥
ক উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নিধির্গুণসম্পদাম্॥

ইহা আদর্শ মহাপুরুষেরই স্বরূপ বর্ণনা—ভগবানের নয়।

তাহার উত্তরে নারদ রামের নাম করিয়াছিলেন। রাম নিজেও নিজের ভগবত্তা সম্বন্ধে সচেতন নহেন। অগস্ত্য নানা উপাখ্যান বিবৃত করিয়া রামচন্দ্রকে উত্তরাকাণ্ডে বুঝাইয়া দিলেন—তিনি স্বয়ং ভগবান।

কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র গোড়া হইতেই ভক্তবৎসল ভগবান। তাঁহাকে একথা মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি বৈরীও রণক্ষেত্রে সেকথা তাঁহাকে স্তবস্তুতির দ্বারা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তা ও রুক্ষতাকে অনেকটা কোমলান্বিত করিয়া আনিয়াছেন। বাল্মীকির সীতা তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালা, কৃত্তিবাসের সীতা চিরভয়াতুরা চিরদুঃখিনী বঙ্গবধূ। রাবণের সম্মুখে বাল্মীকির সীতা দর্পিতা সর্পীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কৃত্তিবাসের সীতা—'কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।'

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নাই, বিষয়বস্তুর অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন নাই—উপাখ্যানগুলির মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, অনেক আখ্যানকে আগে পিছে বসাইয়া লইয়াছেন, কোন আখ্যানকে অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন—কোনটিকে অতি বিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন—বাল্মীকির অনেক আখ্যান অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন এবং নানা পুরাণ হইতে নূতন নূতন গল্প সংযোজন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য পুরাণের কথা বলিয়া লিখিয়াছেন—

"পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥"
ফলে, এ গ্রন্থকে নূতন সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। তপোবনবাসী বাল্মীকির রামায়ণের বাঙ্গালার চালাঘরে পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। মনে হয়—বাঙ্গালার মাটি চিরিয়া সীতাদেবীর মত এই রামায়ণী কথার জন্ম হইয়াছে। বাল্মীকির তাপসী বেদবতী যেন হলের মুখে মাটি হইতে কৃত্তিবাসের সীতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

(বাঙ্গালার আবহাওয়া, ফলফুল, ঘরদ্বার, বেশভূষা, ভক্ষ্যভোজ্য, আচার অনুষ্ঠান, উৎসব-আমোদ, রীতি-নীতি, নারী-প্রকৃতি সমস্তই ওতপ্রোত ভাবে এই রামায়ণের মধ্যে অনুস্যূত। ফলে ইহা বাঙ্গালারই নিজস্ব সম্পদ।)

(কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের দার্শনিক অংশ, তত্ত্বমূলক বাদানুবাদের অংশ, বিচার-বিশ্লেষণের অংশ ও সর্ব্ববিধ আলঙ্কারিকতা বাদ দিয়াছেন। কেবল কাঠামোটিই লইয়াছেন। এই কাঠামো অবলম্বন করিয়া তিনি বাঙ্গালার মাটি দিয়া প্রতিমা গড়িয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণী কথা চিন্ময়ী নয়, শিলাময়ী নয়, ধাতুময়ী নয়, দারুময়ীও নয়, মৃন্ময়ী।)

এই রামায়ণের অনেকাংশ শিশু চিত্তরঞ্জনের জন্য লিখিত। কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালী জাতির চিত্তটা অনেকটা শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনা-প্রবণ ও কৌতূহলী ছিল। সে চিত্তের বিশ্বাস করিবার শক্তিও ছিল যেমন অগাধ, যে-কোন সত্যাসত্য প্রাকৃত অপ্রাকৃত কাহিনী হইতে আনন্দ পাইবার শক্তিও ছিল তেমনি অপরিসীম।

তাহাদের কাছে পৃথিবীটা খুব বড় ছিল না। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সব ছিল যেন একটি দেশেরই অন্তর্গত—ত্রিলোকের মধ্যে যাতায়াতের কাল্পনিক পথটাও বিশেষ দুর্গম ছিল না। দেব নর যক্ষ রক্ষঃ অপ্সর কিন্নর পশুপক্ষী দৈত্য দানব সমস্তই তাহাদের কল্পনয়নে একই গোষ্ঠীর জীব ছিল। এক মহাজাতির মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকে—ইহাও যেন তেমনি। সুখদুঃখ,

আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি সকলেরই অভিন্ন এবং আত্মপ্রকাশের জ্বালা হইতে কেহই বঞ্চিত নয়। দেশ ও কালের দূরত্ব তাহাদের কল্পনাপ্রবণ চিত্তে যেন লোপ পাইয়াছিল। কখনও তাহারা এ দূরত্ব লৌকিক মাপকাঠির সাহায্যে মাপে নাই। তাহাদের কল্পনার মতই যক্ষ, রক্ষ, নর, পশুপাখী —সকলেই ছিল কামচারী ও কামরূপ। কোন আকৃতি কোন আয়তনই তাহাদের কাছে অসম্ভব ছিল না। 'বহু' বুঝাইতে তাহারা যে কোন সংখ্যা ব্যবহার করিতে পারিত। বহুদিন তপস্যা বলিতে তাহারা বুঝিত দশ হাজার বৎসর তপস্যা, বহুদিন রাজত্ব বলিতে বুঝিত ষাট হাজার বৎসর রাজত্ব, বহুক্রোশ বলিতে তাহারা বুঝিত লক্ষ যোজন, বহুলোক বলিতে বুঝিত বিশ কোটি লোক। সূর্য্য চন্দ্র ছিল ঘরের অতিথির মত। অক্ষুন্ন যৌবন, অলৌকিক রূপ-লাবণ্য, কুবেরের সম্পদ—এসব এত দুর্লভ ছিল না। অসম্ভব হইতে আনন্দলাভে তাহাদের কোন বাধাই ছিল না।

এইরূপ পাঠক পাইয়াছিলেন বলিয়াই কৃত্তিবাস এই ধরণের রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার রামায়ণ এত লোকবল্লভ হইয়াছিল। এখনও যে আমরা আনন্দ পাই, তাহা শুধু উপাখ্যান-ভাগের জন্য নয়—এ রামায়ণ হাতে করিয়া আমরা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় শিশুচিত্তকে আগেই উদ্বোধন করিয়া লই বলিয়া এবং সেই অগাধ বিশ্বাসের স্বপ্নযুগে ফিরিয়া যাইতে পারি বলিয়া।

(কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে জীবন্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দেশকালের দূরত্ব বিলোপ করিয়া আমাদের ঘরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কবি চরিত্রগুলির পৌরাণিকতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে ঐতিহাসিকতা—ঐতিহাসিকতা কেন প্রত্যক্ষ বাস্তবতা—দান করিয়াছেন। ইহা সম্ভব হইয়াছে—আমাদের নিজেদের চিরন্তন সুখ-দুঃখ চিন্তা-অনুভূতি, বৃত্তি-প্রবৃত্তি কবি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন বলিয়া

এবং আমাদের মুখের বাণীই তাহাদের মুখে বসাইয়াছেন বলিয়া। জীবন্ত মানুষের মুখের বাণীই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।)

কেবল তাহাই নয়, তাঁহার দরদী কবিহৃদয়খানি ধর্ম্মপথচারী ব্যথার্ত্ত চরিত্রগুলির সহিত অনুস্যূত হইয়া আছে। ব্যথিতের মুখ দিয়া তাঁহার নিজেরই বেদনা ও চোখ দিয়া নিজেরই অশ্রু ঝরিয়াছে। রাম বালিবধ করিলেন গুপ্তবাণে, ভক্ত কৃত্তিবাস শুধু বালীর জন্য নয়—রামের জন্যও ব্যথা পাইলেন —"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ। ধার্ম্মিক রামের কেন ঘটিল প্রমাদ।" কবির দরদী হৃদয়ের ব্যাকুলতা রামায়ণকে রসসাহিত্য করিয়া তুলিয়াছে।

(রাম-ভক্তিপ্রচার কৃত্তিবাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ভক্তিধর্ম্ম তিনি নিজের জবানীতে ও ভক্তের সাহায্যেও যেমন প্রচার করিয়াছেন—মহাবৈরীর মুখ দিয়াও তেমনি প্রচার করিয়াছেন। রামচন্দ্র যে স্বয়ং ভগবান একথা আমাদিগকে এক মুহূর্ত্তও কবি ভুলিতে দেন নাই। তাহার ফলে, রামচন্দ্র-প্রসঙ্গের কোন কথাই আমাদের কাছে অসম্ভব হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভগবান্, কিন্তু তপস্যাগম্য, ব্রহ্মজ্ঞ-ধ্যেয় ভগবান্ নহেন—তিনি ভক্তবৎসল মানবধর্ম্মা ভগবান। তাই কবি তাঁহার জীবনে অলৌকিকতার সহিত অতি সাধারণ লৌকিক জীবনের একটা সমন্বয় ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। *)

---

* রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রামায়ণের আদি কবি গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দুসমাজের যত কিছু ধর্ম্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষকরূপে অবশেষে রাজরূপে বাল্মীকির রাম লোক-পূজ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। * * আদি কবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন যদিচ রামের চরিত্রে অতি-প্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়াই চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন। তখন রামায়ণের মূল সুরটার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রাবণ বধ করিবার জন্যই ভগবান অবতীর্ণ, পাছে এ কথা রামের মনে না থাকে, সেজন্য মাঝে মাঝে দেবতাদের ষড়্‌যন্ত্রের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। রামের জীবনে দুর্ঘটনা না ঘটিলে রাবণ-বধ হইবে না—দেবতারা দুর্ঘটনা ঘটাইবার জন্য ও তাঁহার শত্রু-সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। ফলে, রামের সকল শত্রুই একটি বিরাট মঙ্গলময়ী পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

রামের জন্য ও সীতার জন্য আমরা যত অশ্রুপাতই করি, রামের মহাশত্রুর উপরও আমাদের রাগ করিবার উপায় নাই। কৈকেয়ী বলিতেছেন—"বনে গেলে দেবতার কার্য্য-সিদ্ধি লাগি। আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী।"

ইহা ছাড়া, বাঙ্গালীর মজ্জাগত অদৃষ্টবাদ আছে। সবই যখন নিয়তির লীলা, স্বয়ং ভগবানও যখন এই নিয়তির হাত হইতে নিস্তার পাইতেছেন না। রাগ করিবে কাহার উপর? অশ্রুপাত ছাড়া আর উপায় কি?

চিরদুঃখী জাতি স্বয়ং ভগবানেরও দারুণ দুঃখ ক্লেশ, অপরাজেয় মহাবীরেরও পতন, স্বয়ং লক্ষ্মীরও ভিখারিণীবেশ, রাজকন্যা, রাজমহিষী, রাজবধূরও দারুণ যাতনা-পীড়ন ইত্যাদির কথা শুনিয়া সান্ত্বনাই পাইয়াছে। এমন কি মহা-মহাতপস্বীরও পদস্খলনের কাহিনী শুনিয়া নির্বেদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে—নিজেরা আশ্বস্ত হইয়াছে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনা আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় বস্তু হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইল। এই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরগণকে তিনি প্রেম দিয়া ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাঁহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার হাতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার পাইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করি—কলহ, গালাগালি, ভোজন-লুব্ধতা, স্বর্ণলোভ ও নারীপীড়ন—এই কয়টি বিশেষ প্রবল। জাতির রুচি-প্রবৃত্তির চাহিদাতেই এইগুলি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে বলিলে কি খুব অন্যায় হইবে? কৃত্তিবাসের কাব্যে এইগুলির সম্বন্ধে ব্যত্যয় হয় নাই। যেখানে কলহ ও গালাগালির প্রয়োজন হইয়াছে, কৃত্তিবাস সেখানে খুবই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এসকল ক্ষেত্রে তাঁহার রচনা খুবই জোরালো ও জীবন্ত হইয়াছে। ভোজনের চিত্রগুলিও ভোজনলুব্ধ জাতির প্রীতিকরই হইয়াছে। সমগ্র কাব্যে যেরূপ সোনার ছড়াছড়ি—সেরূপ অন্য কাব্যে দেখা যায় না। দরিদ্রজাতি সাহিত্যেই স্বর্ণতৃষ্ণা মিটাইতে চায়। আর নারী-পীড়নের ত কথাই নাই।

আর একটি অঙ্গ অশ্লীলতা। রামায়ণে অশ্লীলতা স্বাভাবিক ভাবে আসিবার কথা নয়। মূল উপাখ্যানাংশে কোথাও অশ্লীলতার অবসর নাই। তুলসীদাসের রামায়ণে একেবারেই অশ্লীলতা নাই। ইহাও বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূল রামায়ণে যে যে অবান্তর উপাখ্যানে অশ্লীলতা নাই—বাঙ্গালীকবি সে সে অঙ্গেও অশ্লীলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল রামায়ণে যেখানে অশ্লীল অংশ ঐতিহাসিক ঔদাসীন্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে, বাঙ্গালী কবি তাহাকে রসালো ও ঘোরালো করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, মূল রামায়ণে সংস্কৃত ভাষায় যাহা কুরুচিকর ছিল না—তাহা আমাদের গ্রাম্য সহজ সরল ভাষায় কুরুচিকর হইয়া পড়িয়াছে। অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল ভাষায় লিখিতে গেলে এ বিপদ আছেই।

কবি বাঙ্গালী-চরিত্র বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কি চায় তাহা জানিতেন, তাই তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে মুখরোচক অনেক নব নব নিবন্ধ ইহাতে যোগ দিয়াছেন—নানা পুরাণ হইতেও তদুপযোগী উপাদান আহরণ করিয়াছেন এবং আটচালা-ভরা বাঙ্গালী শ্রোতাদের যাহা রোচনীয়

হইবে না তাহা বাদ দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইশ্রেণীর লোক আছে। এমনভাবে গ্রন্থখানি উপন্যস্ত হইয়াছে—যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের লোকের অপ্রীতিকর হইবার কথা নয়। রামায়ণ প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ্য হইতে পারিয়াছে—চৈতন্য-ভাগবত তাহা হয় নাই—শিবায়ন তাহা হয় নাই।

বাঙ্গালায় যদি কোন মহাকাব্য থাকে—তবে তাহা এই কৃত্তিবাসের তথাকথিত রামায়ণ। আমি মহাকাব্য বলিতে গ্রীক বা সংস্কৃত আলঙ্কারিকের সংজ্ঞা অনুসরণ করিতেছি না। ইহাতে একটি মহাদেশের, মহাজাতির, মহাপুরুষের, মহীয়সী মহিলার ও মহাবীরের জীবন-কাহিনী বাণীরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"মূল আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।"

(রামায়ণে যত যুদ্ধবিগ্রহই থাকুক, যত ঘটনা-জটিলতাই থাকুক, যত জ্ঞান-ভক্তির কথাই থাকুক, মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিই ইহাতে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী, ভক্তি, দাস্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তিগুলি সমগ্র কাব্যখানিকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছে।) সমস্ত ঘটনা অসত্য হইতে পারে, এগুলি অসত্য নয়, নিজস্ব চিরন্তনতা ও সার্ব্বজনীনতা এইগুলিকে পরম সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, রাবণের চিতা আজিও জ্বলিতেছে। এ চিতার সমিধ কি? দশরথের হাহাকার, সীতার আর্ত্তনাদ, রামের প্রেমোন্মাদ, লক্ষ্মণের নেত্রবহ্নি, ভরতের তপশ্ছটা, সুগ্রীব-বিভীষণের আকিঞ্চন, হনুমানের অন্তর্গূঢ় বেদনা সমস্ত মিলাইয়া এই চিতার সৃষ্টি করিয়াছে।

(কৃত্তিবাসের রামায়ণ এ দেশের লোককে শুধু আনন্দ দেয় নাই, ইহা লোকশিক্ষার একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠানের কাজ করিয়াছে। বাঙ্গালী জনসাধারণ ইহা হইতে গার্হস্থ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি লাভ করিয়াছে এবং সত্যনিষ্ঠতায় দীক্ষা লাভ করিয়াছে। কৃত্তিবাস রামায়ণের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত সত্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।)

এ রামায়ণ আমাদের দেশের ভাষারও পুষ্টিসাধন করিয়াছে—ভাবপ্রকাশের বহু ব্যঞ্জনাময় সঙ্কেত আমরা এই রামায়ণ হইতে পাইয়াছি—তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বহু লক্ষ্যার্থক বাক্যগুচ্ছের সৃষ্টি। কালনেমির লঙ্কাভাগ, রাবণের চিতা, কাঠবিড়ালীর সাগরবন্ধন, ঘরের শত্রু বিভীষণ, বানরের গলে মুক্তার মালা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে, দেবর লক্ষ্মণ, ধনুর্ভঙ্গ পণ, মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ, রামরাজত্ব, লঙ্কাকাণ্ড, ব্রহ্মাস্ত্র, ধর লক্ষ্মণ ফল ধর, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস, রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, গন্ধমাদন ইত্যাদি বহু লক্ষ্যার্থক পদগুচ্ছ আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতেই আমাদের দেশে বহু কাব্য, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, ঝুমুর, কবির গান, তরজা ইত্যাদির মধ্য দিয়া শতধা হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

স্বয়ং মাইকেল বাল্মীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাসের কাছে অধিকতর ঋণী।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের

অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত। যাহা আজ আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।"

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই :—এ দেশে কৃত্তিবাসের সমাদর এবং রামায়ণ-কথার আরো বেশি প্রচার হওয়া উচিত ছিল। এ দেশে বহু কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে এবং রামায়ণী কথা আমাদের দেশের সাহিত্যকে আরো বেশি প্রভাবান্বিত করিলে ভাল হইত। সাহিত্যে রামসীতার আদর্শ যদি রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর আদর্শকে ছাড়াইয়া উঠিত, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণই হইত।—

"আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্য্যবৃত্তি ও হরগৌরীর কথায় হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ-স্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্যপ্রেম আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্যপ্রেম অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর, তেমনি স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণ-কথায় একদিকে কর্ত্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য্য একত্র সঙ্কলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়-বন্ধন আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকারের হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎ ধর্ম্ম-নিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচলিত। সর্ব্বতো-ভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী শিক্ষা আর কোন দেশে আর কোন সাহিত্যের নাই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও

কর্ম্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"

কৃত্তিবাসের পয়ারের কি রূপ ছিল দেখাইতে হইলে পুঁথির পাঠ হইতেই দেখাইতে হয়। ঢাকাই সংস্করণ হইতে কয়েক পংক্তি তুলি—

৮+৬—এ-তে-ক ব-লি-য়া রা-জা। গে-ল অ-ন্তঃ-পু-রী।
হে-ন-কা-লে ধাই-য়া আই-ল। সু-মি-ত্রা-সু-ন্দ-রী॥
উ-ভা-ল-ড়ে আই-ল দে-বীর। ব-হে ঘ-ন শ্বা-স।
কি-বা দ্র-ব্য খাই-তে রা-জা। ক-রে-ন আ-শ্বাস
স্বা-মীর অ-প্রি-য় না-রীর জী-। ব-নে নাই-ক কা-জ।
সু-মি-ত্রা-র বা-ক্যে দুই-না-। রী-এ পাই-ল লাজ।

লক্ষ্য করিতে হইবে—অধিকাংশ স্থলে এক একটি পদাংশ (Syllable)কে মাত্রা ধরা হইয়াছে। আই, উই ইত্যাদিকে ঐ, ঔয়ের মত এক একটি দীর্ঘস্বর (Dipthong) বর্ণ ধরা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে আই-কে দুই মাত্রাও ধরা হইয়াছে। যেমন নিম্নলিখিত পংক্তির 'ভাই'।

যা-ইট্-হা-জার্ ভা-ই ভ-স্ম। হ-এ্যা-ছে যে-খা-নে।

মীর্, বীর্, ইত্যাদিকে একমাত্রা ধরা হইয়াছে। এই প্রথা প্রাচীন পয়ারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসৃত হইয়াছিল। পয়ারের এই পদ্ধতি হইতেই পদাংশমাত্রিক পয়ার বা ছড়ার ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ড হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

দুই বা-লক্ গীত্ গা-য়ে-ন। অ-মৃ-তে-র ক-ণা।
স-প্ত-স্ব-রে গী-ত গা-য়ে। বা-জে ম-ধু-বী-ণা।
দ-শ-র-থের ম-রণ গা-য়ে। রা-মের্ ব-ন-বা-স
গী-ত শু-নি লো-ক স-ব। ছা-ড়-য়ে নি-শ্বা-স॥

এখানে দুই, লক, গীত, থের, রণ, মের—এইগুলিকে পদাংশ (Syllable) ধরিয়া একমাত্রায় ধরা হইয়াছে—অবশ্য সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম রক্ষা হয় নাই। যেখানে সে নিয়ম রক্ষা হয় নাই—সেখানে হসন্ত বর্ণকে স্বরান্ত করিয়া পড়া হইত—যেমন—অমৃতেরো কথা, গীতো শুনি লোকো সবো ছাড়য়ে নিশ্বাস —এইরূপ আবৃত্তি করা হইত।

এইবার কৃত্তিবাস যাহাকে লাচাড়ি বলিয়াছেন—সে ছন্দের একটু পরিচয় দিই—

বাছা। আর না জাহিহ তপো। বনে।
জানিআ শুনিআ মুনি। গানে দিলেন মেলানি। ঘরে বসি থাক দুই। জনে।
পূর্ব্বে বিষ্ণু আরাধিআ। পৃথিবীতে জনমিআ। বাড়িলাঙ জনকের। ঘরে।
পিতা বড় নিদারুণ। বিষম করিল পণ। হরধনু ভাঙ্গিবার। তরে।

ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী। আর একপ্রকার লাচাড়ি পুঁথির পাঠে দৃষ্ট হয়—তাহা ৮ মাত্রার পর্ব্ব ও ৭ মাত্রার পর্ব্বের মিশ্রণ।

এহেন পুরীকে আর। কবে বা আসিব আর। শূন্য হইল পুরী। খান
নৃপতি দশরথ। মদনে উন্মত। কেকয়ে দিলেন বর। দান।

ইহা দুই ছন্দের মিশ্রণ। ইহাকে দীর্ঘ ত্রিপদীতে আনিতে লিখিতে হয়—
এ হেন পুরীকে আর। কবে বা আসিব আর। শূন্য হৈল এই পুরী। খান।
নরপতি দশরথ। মদনে উন্মত চিত। কেকয়ে দিলেন বর। দান।

ইহাকে ৭ মাত্রার চর্চ্চরী ছন্দেতে পরিণত করিলে লিখিতে হয়।

এ হেন পুরী আর। আসিব কবে আর। শূন্য হ'ল পুরী। খান
নৃপতি দশরথ। মদনে উন্মত। কেকয়ে দিল বর। দান।

প্রচলিত রামায়ণে লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, পয়ার ইত্যাদি নির্দ্দোষ। জয়গোপাল পণ্ডিত ইহার মধ্যে মাল ঝাঁপ ছন্দও ঢুকাইয়াছেন। গুণপাত্র। বায়ুপুত্র। সিন্ধু তরিবারে। করি লীলা। বাড়াইলা। আপন কায়ারে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালী জাতির জীবন-গঠনে কি সহায়তা করিয়াছে তাহা কবিতায় বলিয়া নিবন্ধের উপহার করি—

বাংলার বাল্মীকি কবি দেবীর আদেশ লভি' শুভক্ষণে কবে নাহি জানি।
সীতার নয়ন-জলে বসিয়া অশোকতলে লিখেছিলে রামায়ণ খানি।
তালপত্রে সেই লেখা সেত অশ্রুজল-রেখা, অনল অক্ষরে আজ জ্বলে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষরে, পাষাণ-হৃদয়ও তায় গলে।
জানকীর আঁখিনীর গৃহে গৃহে গৃহিণীর ক্ষণে ক্ষণে তিতায় বসন,
তাঁদের পায়ের কাছে নত শিরে আজ্ঞা যাচে শত শত দেবর লক্ষ্মণ।
কাঙালের তুচ্ছ পুঁজি তাই নিয়ে যোঝাযুঝি ভায়ে ভায়ে, তা'ত তুচ্ছ নয়,
হে কবি, তোমার গান গলায় তাদের প্রাণ, আঁখিজল দ্বন্দ্ব করে জয়।
শাশুড়ী তোমার গানে বধূরেও বক্ষে টানে ভুলে যায় অবলা-পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা ভুলে যায় সব ব্যথা গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।
কি মহিমা রচনার উদয়ন কথা আর কহেনাক গ্রাম-বৃদ্ধদল,
তাহাদের চারি পাশে যুবা শিশু কেন আসে? তব বাণী তাদের সম্বল।
পশারী পশারা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে শুনে যদি রামায়ণ-পাঠ,
গুহকের ভাগ্য স্মরে দুইচোখে ধারা ঝরে ভুলে যায় বেচা-কেনা-হাট।
বঞ্চক 'মুরারি, শীল' ছাড়ে না যে একতিল সেকি দিতে তারও হাত কাঁপে,
পাপ করি দিন কাটে সাঁঝে রামায়ণ-পাঠে রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে।
শিখাইলে কী যে সত্য গ্রামে গ্রামে 'ভাঁড়ু দত্ত' মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ভুলে যায়,
কৃপণ তোমার গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে যক্ষদেরও হৃদয় গলায়।
দিনে হাটে হট্টগোল কাড়াকাড়ি ডামাডোল সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ।
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি উত্তরাকাণ্ডটি পড়ি দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।
বৈকালে বটের ছায় সুর করি নিতি গায় দা-ঠাকুর কাহিনী সীতার,
কৃষকেরা দলে দলে ভাসিয়া নয়ন-জলে একই কথা শুনে বারবার।
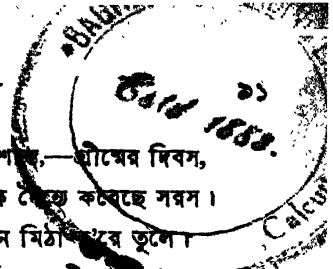
তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা, স্নিগ্ধ শ[illegible],—গ্রীষ্মের দিবস,
জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি কি সুধা তাতে না জানি শুষ্ক [illegible] করেছে সরস।
মোদকের খইচুড, তব গীতি সুমধুর আরো যেন মিঠা [illegible] তুলে।
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বারবারই দাম নিতে মুদী যায় ভুলে।
জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা-নির্যাতন করে তব পুঁথি পড়ে মাত্তা তার,
প্রজারঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর গ'লে যায় তায় কর-ভার।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায় অযোধ্যার নির্ব্বোধ প্রজারা,
আজি বঙ্গ ঘরে ঘরে তারি প্রায়শ্চিত্ত করে, চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।
আর কারে নাহি জানি মানি শুধু তব বাণী, শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি নূতন জনম লভি অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।
এ রাম মোদেরি মত যুঝেছে, কেঁদেছে কত অদৃষ্টেরে দিয়াছে ধিক্কার,
এ রাম মোদেরি মত করিয়াছে ভক্তিনত নীলপদ্মে পূজা অম্বিকার।
এ রামে আপন জানি বক্ষে লইয়াছি টানি, দুঃখে তাঁর হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে অবিরল অশ্রুপাতে পম্পাহ্রদে বাড়ায়েছি নীর।
তুমি রস-গঙ্গা হ'তে আনিলে নূতন স্রোতে আগে আগে দেখাইয়া পথ,
নব রস-ভাগীরথী, উদ্বেল তাহার গতি তুমি তার নব ভগীরথ।
সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খাল বিল, একাকার গোষ্পদ-পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে লতা তৃণে শস্য ফুলে ফলিতেছে সোনার ফসল।
বধূরা গাগরী ভরে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে, তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্য স্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ 'জয় রাম' গায় নরনারী।
সেই রস-ধারা বাহি' জয় সীতারাম গাহি' ভেসে যায় কত মধুকর।
লঙ্কায় বাণিজ্য তরে যুগে যুগে যাত্রা করে ধনপতি চাঁদ সদাগর,
শত শাখা প্রশাখায় সে ধারা বহিয়া যায় বিপ্লাবিত অশ্রুর তুফানে,
'এহো বাহ্য' নহে শেষ, চ'লে যায় নিরুদ্দেশ শেষ ধারা অনন্তের পানে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন

বিশেষজ্ঞদের মতে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইনি বাসলী (বাগীশ্বরী—বাইসরী—বাইসলী—বাসলী) দেবীর পূজারী ছিলেন। বীরভূম জেলায় নান্নুর নামক গ্রামে বাসলী দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি এখনও বিরাজিত। এই গ্রাম চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছিল—ইহাই প্রচলিত মত এবং আমাদেরও মত। ইদানীং সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামেও বাসলীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে —ছাতনার নিকটে নান্নুর হাট বা মাঠ বলিয়া একটি স্থানও আছে। চণ্ডীদাস এইখানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যা গ্রামে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত আদ্যন্ত-খণ্ডিত এক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বঙ্গসাহিত্য-সমুদ্রে প্রায় আমেরিকা আবিষ্কারের মত। ইহার কলম্বস—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বাঁকুড়ায় এই পুঁথির আবিষ্কারে বাঁকুড়ার দাবি বাড়িয়া গিয়াছে। এই পুঁথি বিদ্বদ্বল্লভ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের কথাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার ভাষায় বেশি তফাৎ নাই। (গ্রন্থের ক্রিয়াপদ-গুলিতে চন্দ্রবিন্দুর আধিক্য বীরভূমের দাবীই সমর্থন করে।)

---

* শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে আমরা পাই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ,—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গোবিন্দ বিজয় বা গোবিন্দ মঙ্গল, (শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, রচনা কাল ১৪৭৩—১৪৮১ খৃঃ অঃ) কানা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাইএর মনসামঙ্গল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাড়া—এইগুলির সাহিত্যিক মূল্য অতি সামান্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা প্রাচীন—চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার সহিত তাহার মিল নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে এমন সকল শব্দ আছে যেগুলি এখনও বঙ্গদেশ এমন কি উড়িষ্যা আসামের কোন-না-কোন স্থলে পরিচিত—কোন একটি বিশিষ্ট স্থলের ভাষার সহিত উহার সম্পূর্ণ মিল নাই। তবে অধিকাংশ শব্দ রাঢ়দেশে সুপরিচিত। সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের সময়ে রাঢ়দেশে ঐরূপ ভাষাই প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যেমন কীর্ত্তনীয়াদের মুখে মুখে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা তাহা হয় নাই। তাহার কারণ, ঐ গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল না—কোথাও গাওয়া হইত না। সম্ভবতঃ পুস্তকখানি অশ্লীল, রসাভাসে দুষ্ট ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর উহা আর চলে নাই। অথবা চণ্ডীদাস পরবর্ত্তী জীবনে লীলা-মাধুর্য্যের উচ্চতর রসের আস্বাদ পাইয়া নিজেই উহার প্রচার করেন নাই। সেজন্য ঐ গ্রন্থের ভাষার কোন পরিবর্ত্তন নাই।

চণ্ডীদাসের সময় কৃষ্ণধামালী নামে একপ্রকার অশ্লীল গান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—কেহ কেহ অনুমান করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই ধামালীরই সাহিত্যরূপ। বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাবে সেকালে নৈতিক আদর্শ ও রসের রুচি অত্যন্ত জঘন্য হইয়াছিল—চণ্ডীদাস যুগধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই—ইহাও কাহারও কাহারও মত। চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবি জয়দেবের রুচিও বর্ত্তমান যুগের আদর্শ অনুসারে মার্জ্জিত ও শোভন ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পালা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম জন্মখণ্ড। ইহাতে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি অত্যাচারী পাষণ্ডদের দলন করিবার জন্য ও ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ। দেবগণের অনুরোধে লক্ষ্মী গোকুলে সাগর ও পদ্মার কন্যা লইয়া জন্মিলেন। বৈষ্ণবরা যে বলেন—শ্রীকৃষ্ণ আপনারই হলাদিনী রস উপভোগের জন্য নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণকীর্ত্তনে সে কথা নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম তাম্বূলখণ্ড। এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা

পুস্তকের রুচি যতই জঘন্য হউক—ইহাতে কবিত্বের অভাব নাই। সামসময়িক বিদ্যাপতির রুচিও প্রায় এমনি, তবু বিদ্যাপতির কবিত্বের তুলনা নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকাংশ বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত তুলনায় কবিত্বে অপকৃষ্ট হইলেও, রাধাবিরহ অংশ উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমরা মনে করি। রাধাবিরহে রাধার অন্তর হইতে যে আকুল বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে তাহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর পূর্ব্বাভাস। বাকী অংশের সহিত পদাবলীর সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না। যে চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করিয়াছেন তিনিই দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড লিখিয়াছেন—ভাবিতেও কষ্ট হয়; (কিন্তু রাধাবিরহ অংশের সহিত পদাবলীর কোন অসামঞ্জস্য নাই) এমনকি একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে কবি 'রাধাবিরহ' রচনা করিতে গিয়া যে রসের আস্বাদ পাইলেন, সেই রসকেই তিনি

শুনিয়া রাধার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছেন। রাধার মায়ের পিসী বড়াই বুড়ীর মারফতে শ্রীকৃষ্ণ তাম্বূল পাঠাইয়া নিজের কামাভিপ্রায় জানাইতেছেন। যে ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার দেখানোর প্রথা এখানে সে ভাবে দেখানো হইতেছে না। রাধার পূর্ব্বরাগ ইহাতে একেবারেই নাই। সুবল, শ্রীদাম বা কোন সখী এখানে দৌত্য করিতেছে না। একটি জরতী আসিয়া এখানে দৌত্য করিতেছে। কিশোর-কিশোরীর প্রণয়-লীলার মধ্যে একটি শ্বেতচামর কেশা, কোটরগত-নয়না বিকটদন্তা জরতীর সমাগম একেবারে রসাভাসের সৃষ্টি করিতেছে। ইহাতে কাব্য গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডের নাম দানখণ্ড। রাধা দুধদই বিক্রয় করিতে মথুরায় চলিয়াছেন—বড়ায়ি তাঁহার অভিভাবিকা। শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়া পথে রাধাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে রাধারূপের গুণগান করিলেন, সাধ্যসাধনা করিলেন—কিছুতেই রাধা স্বীকৃত ন'ন। রাধা বলেন—'আমি তোমার মাতুলানী।' শ্রীকৃষ্ণ বলেন—'তুমি কিসের মাতুলানী? তুমি শালী। আমি যশোদা-নন্দের বেটা নই, আমি বসুদেব-দৈবকীর বেটা।' রাধা কত ভয় দেখাইলেন—ধর্ম্মের দোহাই দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ হইতে যত ব্যভিচারের নজির তুলিতে লাগিলেন। শেষে বল প্রয়োগ। রাধা বিপন্ন হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নৌকা-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী সাজিয়া মথুরা যাত্রিণী গোপীগণকে পার করিয়া দিলেন।

শেষ বয়সে পদাবলীতে আরও উচ্চগ্রামে তুলিলেন এবং পদাবলী রচনা করিয়া তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনকে আর প্রাধান্য দেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদকে তিনি নিজেই প্রচার করিয়াছিলেন অথবা অন্যের দ্বারা তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। সেই পদগুলিই কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসের সহিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের মিলন-সূত্র। তাহাদের মধ্যে একটি বিখ্যাত পদ

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আঁরো তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিলোঁ কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে। ইত্যাদি

রাধিকাকে একলা পার হইতে হইল। শ্রীকৃষ্ণ নৌকা ডুবাইয়া রাধার প্রতি যমুনা জলে অত্যাচার করিলেন। রাধার কাকুতি মিনতিতে পাষাণও গলে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় গলিল না।

ভারখণ্ডে ভারবাহী হইয়া মথুরার পথে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পশারা বহিতেছেন। এবং ছত্র খণ্ডে রাধার মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ ছত্র ধরিতেছেন। এই দুই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের এই যে দাক্ষিণ্য তাহাও রাধার মিলন-সুখ-লাভের আশায়। "রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে। রতি আশেঁ না ছাড়এ পাশে।"

বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে বনবিলাস ও রাসলীলা করিতেছেন। এই খণ্ডে কবি ভাগবত ও গীতগোবিন্দ হইতে কতক কতক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলা করিবার জন্য বৃন্দাবন নামে রমণীয় উদ্যান রচনা করিলেন। বড়াই রাধাকে এখানে ভুলাইয়া লইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিলেন। তারপর রাধার সহিত মিলিত হইতে আসিলে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানিনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের বিখ্যাত মানভঞ্জনের পদটিকে বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়া রাধাকে শুনাইলেন। তাহাতেও রাধা অবিচলিত। তখন গোবিন্দ গোঁয়ার গোবিন্দের মত রাধাকে ফুলফল ছেঁড়ার অছিলায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—এমন কি বলিলেন—

যবেঁ তিরী বধে নাহিঁ থাকে ডর। তবে আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর।

যমুনা-খণ্ডের মধ্যে কালিয় দমন। কালিয় নাগকে দমন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কালীদহে

কেবল তাহাই নয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক পংক্তির ভাব ও ভাষা পদাবলীর মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। এই গুলিকেও দুই চণ্ডীদাসের যোগসূত্র বলা যাইতে পারে। (পদাবলীর ভাষাকে যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়—তাহা হইলে রাধা-বিরহের পদের সহিত খুব বেশি তফাৎ হয় বলিয়া মনে হয় না।)

(রাধাবিরহ ছাড়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্যান্য খণ্ডেও কবিত্ব আছে। বৃন্দাবন খণ্ডে মানের দৃশ্য ও মানভঞ্জন কবিত্বময়। অবশ্য ইহাতে জয়দেবের প্রভাব-সম্পাত হইয়াছে—বংশীখণ্ডের পদগুলিতেও কবিত্বের অভাব নাই। অন্যান্য খণ্ডগুলিতে কবিত্ব ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে—এমন বহু

ঝাঁপ দিলেন। এই খণ্ডে এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে রাধা ভয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া শোক করিতে লাগিলেন। ইহাই রাধার পক্ষ হইতে প্রথম অনুরাগ প্রকাশ। এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে যমুনায় জলবিহার করিলেন এবং তাহাদের বস্ত্র হরণ করিলেন; রাধার হার হরণ করিয়া ফেরৎ দিলেন না।

হার খণ্ডে শ্রীরাধা যশোদার কাছে হার-হরণের জন্য অভিযোগ করিতেছেন—বাণ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বড়াইএর উপদেশে রাধাকে মদন-বাণে মুহ্যমান করিতেছেন। ইহার পর হইতে রাধা কৃষ্ণের জন্য আকুল হইলেন। বংশীখণ্ডে বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া রাধার আকুলতা। বড়াই কিন্তু আর রাধাকে আমল দেয় না। নিশীথে রাধার ব্যর্থ অভিসার। যে বংশী এমন করিয়া হৃদয় দংশন করে তাহা চুরি না করিলে আর চলে না। রাধা কৃষ্ণের বংশী হরণ করিলেন।

শেষ খণ্ড রাধা-বিরহ। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধার দারুণ অস্থিরতা। রাধিকা এখন কৃষ্ণগত-প্রাণা। শ্রীকৃষ্ণ এখন বলেন— "রাধে, তুমি আমার প্রেরিত ফুল তাম্বূল প্রত্যাখ্যান করেছিলে—আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ আমাকে দয়ে ভার বইয়েছ। আমি তোমাকে আর চাই না। তুমি মাতুলানী, পরদারা, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই?" রাধা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাময়িক করুণা হইল। শ্রীকৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই অবসরে আস্তে আস্তে মথুরা পলায়ন করিলেন। তারপর রাধা জাগিয়া উঠিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এই হাহাকারেই গ্রন্থের শেষ।

পদাংশের উৎকলন করা যাইতে পারে যাহা রীতিমত সরস। গ্রাম্য রুক্ষতা ও অমার্জিত ভাষার অন্তরালে একটা রসের ফল্গুধারা বহিতেছে। বহু পংক্তি এমন আছে—যেগুলি পল্লবপুঞ্জে পুষ্পের মতই রমণীয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাস, কালিয়দমন ও গোপীদের বস্ত্রহরণের কাহিনী ভাগবত হইতে গৃহীত। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি কোন না কোন পুরাণে আছে—এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণ-ধামালিগানে দেশে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন খণ্ডের কতক অংশ জয়দেব হইতে গৃহীত। রাধাকৃষ্ণের রস-কলহের মধ্যে বহু পৌরাণিক কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

এই গ্রন্থের মূলকথা—দ্বাদশবর্ষবয়স্কা "তীনভুবনজনমোহিনী শিরীষ-কুসুমকোঁঅলী অদভুত কনকপুতলী" রাধাচন্দ্রাবলীর রূপের কথা বড়ায়ির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন। তিনি বড়ায়ির মারফতে তাম্বূল পাঠাইয়া আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বড়ায়ি কৃষ্ণের হাতে রাধাকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। রাধার মনে এখনও কন্দর্পভাব জাগে নাই—তাহা ছাড়া সে আইহনের পত্নী, তাহার সতী-ধর্ম্মের একটা সংস্কার জন্মিয়াছে—রাধা এ প্রস্তাব স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান করিল। মথুরার হাটে দধিদুগ্ধবিক্রয়ের জন্য গোপবধূরা পশারা সাজাইয়া যাতায়াত করে, রাধাকেও যাইতে হইল—বড়ায়ি রাধার অভিভাবিকা হইয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণ যে পথে অপেক্ষা করিতেছেন, বড়ায়ি সেই পথ দিয়া রাধাকে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ দানী, কাণ্ডারী ইত্যাদি সাজিয়া রাধাকে পীড়ন করিয়া তাহার প্রেম আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাধা কিছুতেই বশ মানিবে না—সে গ্রাম্য বালিকার মত গালাগালি দিতে লাগিল, ধর্ম্মের দোহাই দিল—সম্বন্ধ-বিরোধ বুঝাইল—রাজা কংসের কাছে নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইল, শেষে বহু কাকুতিমিনতি করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রত্যেক কথার জবাব দিতে লাগিলেন, প্রহারের ভয় দেখাইলেন,

তিনি নিজে যে স্বয়ং গোলোকপতি বিষ্ণু—কংসবধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন—তিনি যে ভূভার-হরণের জন্য বারবার নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তিনি যে রাখাল মাত্র নন—তিনি যে নন্দযশোদার সন্তান নন—বসুদেব-দেবকীর সন্তান ইত্যাদি অনেক কথাই বলিলেন। রাধা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলপ্রয়োগ করিলেন। বড়ায়ি এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল—রাধা হাহাকার করিতে লাগিল। এইভাবে নানা ছলে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত জোর করিয়া সঙ্গত হইতে লাগিলেন। ক্রমে রাধার অন্তরে কন্দর্পভাব উন্মেষিত হইল। বড়ায়ির কাজ শেষ হইল আর বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইল না—রাধাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যখন রাধা শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে তখন একদিন সুখসুপ্ত রাধাকে কুঞ্জবনে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিলেন। রাধা হাহাকার করিতে লাগিল। এই Tragedyই কাব্যের উপজীব্য।

সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, এইরূপ ভাবে কামের চরিতার্থতায় রসসৃষ্টি হয় না। রতি ভাবকেই রসে উত্তীর্ণ করা চলে, এই ভাবের মধ্যে এক জনের এইরূপ আন্তরিক বিরাগ বা বিমুখতা থাকিলে আদিরসের কাব্যও হয় না। বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ, বর্ব্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে রসাভাস ঘটিয়াছে।

বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দিক হইতেও রসাভাস ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বা দেবত্বের কথা বারবার বলানো হইয়াছে।

বাচ্যার্থের দিক হইতে ইহার রসসৌষ্ঠবের সমর্থন করা যায় না। তবে ইহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক Interpretation দেওয়া যাইতে পারে। লৌকিক ভাবের ব্যাখ্যা এই—

গোড়াতেই কবি বলিয়াছেন—লক্ষ্মী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন নরবিগ্রহধারী বিষ্ণুর প্রেম-রস আস্বাদনের জন্য। একথা রাধা ভুলিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভুলেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারাভিমর্ষণ নয়—নিজ জায়ার নিকটেই অনুরাগ আদায়।

তারপর বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে যাহা হয়, তাহা ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। এদেশে বালিকার সহিত চিরদিন যুবকের বিবাহ হইয়া থাকে। বালিকার হৃদয়ে কন্দর্প-ভাব জাগাইয়া তুলিবার ভার স্বামীই গ্রহণ করে—বালিকা-বধূর তনুমনো মন্থনেই তাহাকে প্রেমসুধার উদ্ধার করিতে হয়—কঠোর পীড়নে তাহার জীবন-অরণিতে লালসার বহ্নিকে জাগাইতে হয়। (কিছুদিন ধরিয়া বালিকার জীবনে দারুণ পরীক্ষা চলিতে থাকে—বালিকার বর্ষীয়সী আত্মীয়ারা বড়ায়ির মতই সহায়তা করে, আর অন্তরালে দাঁড়াইয়া হাসে।) কোন পক্ষ হইতেই দয়া-মমতার কথাই নাই। তারপর কি হয় তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়—অনেক ক্ষেত্রেই রাধার জীবনের মত পরিণামে Tragedyও ঘটে। বঙ্গের ঘরে ঘরে যাহা হয়—কবি তাহাই রাধাশ্যামের মারফতে অত্যন্ত স্থুলভাবেই এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।

(আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই—ভগবান যাহাকে অহৈতুকী কৃপা করেন, তাহাকে নানা দুঃখ দিয়া, নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া, নানা ভাবে পীড়ন করিয়া অগ্নি-শুদ্ধ করিয়া আপনার করিয়া ল'ন। বড়ায়ি যেন ধর্ম্ম-গুরুর স্থলাভিষিক্ত। ভক্তের মনে অনুরাগের সঞ্চার হইলে ভগবান কৃপাহস্ত অপসারণ করেন—তখন ভক্ত হাহাকার করে। তখন তাহার প্রকৃত তপস্যার আরম্ভ হয়—সেই তপস্যার বলেই ভক্ত ভগবানকে চিরদিনের মত লাভ করে।)

বঙ্গদেশের মঙ্গল-কাব্যের মূল তথ্যের আলোকেও ইহার একটা Interpretation দেওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় নানারূপে পীড়ন ও পরীক্ষা করিয়া পূজা-বিমুখ নরনারীর কাছ হইতে পূজা আদায় করিতেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণের একি সেই ভাবে পূজা আদায়? ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের রূপকে কি ঐ-ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে?

পৃথক পৃথক খণ্ডের মধ্যেও একটা আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আবিষ্কার করা যায়। দানখণ্ডে ভগবান ভক্তজীবনের আধ্যাত্মিক শুল্ক দাবি করিতেছেন—গীতার সেই ভগবানে সর্ব্বস্ব নিবেদন ও ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণের কথা।

নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী। ভক্তের ভার তো ভগবানই বহেন—ভক্ত ভগবানে ইহসংসারের সকল ভার সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত—গীতার যোগক্ষেমং বহাম্যহং,—ভারখণ্ডে এইসব কথার ইঙ্গিত। ছত্রখণ্ডে—ভগবান তাঁহার কৃপাচ্ছায়ায় ভক্তকে রক্ষা করেন, এই কথারই ব্যঞ্জনা। এক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। এইখানেই মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাত হইল বলিতে হয়।

মঙ্গলকাব্যের না হউক পদাবলী সাহিত্যের সূত্রপাত যে এখান হইতে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন পূর্ব্ব হইতে পদাবলী-সাহিত্যের একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল—রাধাবিরহের দ্রবীভাব, আকৃতি ও আকুলতাই পদাবলী সাহিত্যের উচ্চতর পরিণতি লাভ করিয়াছে। যে বংশীর ধ্বনিতে বঙ্গদেশ পাগল হইয়াছে—তাহার প্রথম সুর যে পদে সে পদটি এই—

কে না বাঁসি বায় বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁসি বায় বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁসির শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জনগণে জানী।
মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কবি ঋতুরঙ্গ-পটভূমিকার সহিত তাঁহার কাব্যের চিত্রগুলির বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রথম ব্যাকুল হইলেন বসন্তে। গ্রীষ্মে রাধাকে ভুলাইতে কৃষ্ণ সাজিলেন দানী। গ্রীষ্মকালই তপ্তপথের পশারিণীকে তরুতলে আমন্ত্রণ করিবার সময়। বর্ষা আসিল, যমুনা কূলে কূলে ভরা। নৌকা ছাড়া পার হওয়া যায় না। কৃষ্ণ ঘাটদানী সাজিলেন। বর্ষার উত্তাল তরঙ্গপরে কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ—আর সরলা ভয়চকিতা আহীরবালা আরোহিণী। বর্ষা গেল, শরৎ আসিল। যমুনা তরিতে আর তরীর প্রয়োজন নাই। শরতের উত্তপ্ত রৌদ্র শিরীষকুসুমকোঁঅলীকে কাতর করিয়া তুলিল—কৃষ্ণ রাধার মাথায় ধরিলেন ছাতা। ভারী সাজিয়া বাঁকে করিয়া রাধার পশারা বহিলেন। বসন্তে বৃন্দাবনের বন ফুলে ফুলে ভরিয়া গেল—সেই বনে কৃষ্ণের বংশীরবের আমন্ত্রণে রাধা বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবার গ্রীষ্ম,—জলকেলির সময়। জল ছাড়িয়া উঠিতে মন যায় না—বসনের কথা মনেই থাকে না। রাধার বসন চুরি গেল,—শ্রীকৃষ্ণ সাজিলেন চোর। আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল—রাধা আর দ্বাদশী নয়, চতুর্দ্দশী। মদনমোহন মদন ও বসন্তের সহায়তায় রাধাকে পঞ্চবাণে জর্জ্জর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাজ সমাপ্ত হইল—রাধার হৃদয়ে অনঙ্গের লীলা চলিতে লাগিল। বসন্ত ফুরাইল—তপন অকরুণ হইল—শ্রীকৃষ্ণও অকরুণ হইলেন, মথুরায় পলাইলেন। চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—রাধার অন্তরেও বিরহের আগুন জ্বলিল।

'নবনীদলকোঁঅলী' সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাধা সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া গজমোতির সাতেসরী হার গলায় ঝুলাইয়া নেতের আঁচল দিয়া ঢাকা সোনার ভাঁড়ে দুধ, রূপার ভাঁড়ে দইএর পশারা মাথায় করিয়া মথুরার হাটে 'বড়আয়ীর' সঙ্গে বেচিতে যাইতেন। অদ্ভুত বটে! আইহন ছিল মস্তবড় ধনী, তাহার কিশোরী বধূ গ্রাম হইতে নগরের হাটে দইদুধ বেচিয়া

কড়ি আনিলে তবে তাহার অন্ন জুটিত। এ কেমন কথা? বলা বাহুল্য এটা মাটির বৃন্দাবন নয়—ঘোষপাড়ার গোয়ালাদের জনপদ নয়। এটা ভাব-বৃন্দাবন; এখানে সবই সম্ভব। যে বৃন্দাবনে রাজার ছেলে হইয়া সোনার নূপুর পায় সোনার পাঁচনি হাতে কানু দুপুর রৌদ্রে মাঠে মাঠে গোরু চরায়—সে বৃন্দাবনে 'বড়ার বহুআরী বড়ার ঝি' হইয়া রাধা দই-দুধ বেচিতে হাটে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইহাত ভাব-বৃন্দাবনের কথা গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এবং কৃষ্ণ রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি বিদ্যাপতির বা গোবিন্দদাসের বৃন্দাবন হইতে আমাদিগকে একেবারে গোয়ালাপাড়ায় লইয়া যায়। রাধাসুন্দরী বড়ায়ীর গালে চড় মারিয়া আমাদের প্রথমেই ভাবের স্বপ্ন ঘুচাইয়া দিলেন।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের গোঙারতমি, কথায় কথায় মারের ভয় দেখানো, শ্যালী সম্বোধন ও রাধা-পীড়ন আমাদের মনকে আর ভাব-বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইতে দেয় না। বৃন্দাবনখণ্ডে আসিয়া আবার আমরা স্বপ্নলোকে ফিরিয়া আসি। গ্রন্থের রসাভাস মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-সাহিত্যে রসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা-দৃষ্ট হয়। সেই রসাদর্শে আমাদের মন পূর্ব্ব হইতে আবিষ্ট, তাই বোধ হয় অস্বস্তি অনুভব করি। চণ্ডীদাসের যুগের পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই কোন বিক্ষোভ জন্মিত না। Realism ও Idealism এর এই অদ্ভুত সংমিশ্রণকে তাহারা উপভোগ করিতে পারিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকেও সংস্কার-মুক্ত মনে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের রসাবেষ্টনীতে কল্পনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।*

* আমরা উপভোগ করিতে পারি না পারি শ্রীচৈতন্যের সামসময়িক রসিকগণ যে উপভোগ করিত তাহার প্রমাণ আছে। স্বয়ং রূপ সনাতনই ইহার আদর করিতেন। শ্রীচৈতন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, তিনি সমস্তই আপন মনের মাধুরী দিয়া মনের মত করিয়া লইতেন। আর হয়ত তিনি রাধা-বিরহের পদগুলিই উপভোগ করিতেন। ভাগবতে নৌকাখণ্ড দানখণ্ড নাই—ইহা চণ্ডীদাস

(কৃষ্ণকীর্ত্তনে অলঙ্কারের আতিশয্য নাই। গ্রন্থের যে যে অংশ প্রচলিত সংস্কৃত রচনাভঙ্গী-ধারার অনুসৃতি, সেই সেই অংশেই অলঙ্কৃতি আছে। এই অলঙ্করণে কবির মৌলিকতা কিছু নাই।) সেকালে অলঙ্কৃত ভাষা ভিন্ন রূপবর্ণনা করার প্রথা ছিল না, কাজেই রূপবর্ণনায় রাধার অঙ্গের অলঙ্কারের ন্যায় সুলভ অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। (ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক উপমারই আতিশয্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি বিদ্যাপতির মধ্যেও পাওয়া যায়।) কতকগুলির দৃষ্টান্ত দিই—*

১। কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিঁদুর। সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর।
কনক কমল রুচি বিমল বদনে। দেখি লাজে গেল চান্দ দু লাখ যোজনে।
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল। জলে বসি তপ করে নীল উতপল।
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে। অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।

২। লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল। বদন কমল শোভে আলক ভামল।
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড। গণ্ডযুগ শোভে তোর মধুক অখণ্ড।

যেখান হইতেই পান না কেন—তিনিই বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রবর্ত্তক। পরে এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ভবানন্দের হরিবংশে ও কৃষ্ণমঙ্গলের সব গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে এবং এই বিষয় লইয়া বহু পদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। চৈতন্যোত্তর কবিদের হাতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের রুচি ঢের বেশি মার্জ্জিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্তগণই সে সকল পদ রচনা করিয়াছেন।

* রাজহংস, খঞ্জন, গজরাজ, পূর্ণচন্দ্র, নীলোৎপল, স্থলকমল, বাঁধুলী, দাড়িম্ব, নীলজলদ, শিরীষ, নবনী ইত্যাদির সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপমা বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত উপমানের একটা তালিকা পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল। এই কাব্যে দেখা যায় সেই তালিকাই শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপবর্ণনায় বার বার ফিরাইয়া ঘুরাইয়া চালাইতেছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কামনার আতিশয্যই প্রকট হইয়াছে। ইহার উত্তরে নবনীদল কোঁয়লী রাধাও বার বায়ই বলিয়াছে—'আপন মাএর মাঁসে হরিণী বিকলী'। এই পংক্তির ভাব চর্য্যাপদ হইতে প্রাপ্ত।

হাস কুমুদ তোর দশন কেশর। ফুটিল বাঁধুলী ফুল বেকত অধর।
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল। অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।
ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে। কনক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে। আরপিল হেম পাট তোহর জঘনে।
সুন্দরী রাধা ল সরোঅর ময়ী। দুঃসহ বিরহ জরে জরিলা কাহ্নাই।
তোহ্মা ছাড়ি নাহিঁ জ্বর হরণ উপাএ। বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গাএ।

[বাহু দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলা জলং।
শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্র সফরং ধম্মিল্লং শৈবালকম্॥
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ।
র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরোনির্ম্মিতম্॥

শৃঙ্গারতিলকের এই শ্লোক হইতে উহা রচিত।] *

চণ্ডীদাস জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে কিছু কিছু অলঙ্করণ আহরণ করিয়াছেন। জয়দেবের—স্তনবিনিহিতমপি হার মুদারম্। সা মন্থুতে কৃশতনুরিব ভারম্—বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে—তনের উপর হারে। আল মানএ যেহ্ন ভারে। জয়দেবের ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গাণি বাণাঃ—পংক্তিকে মনে পড়ায় চণ্ডীদাসের ভ্রূ হি কামধনু নয়ন বাণে। জয়দেবের 'নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালং' আর চণ্ডীদাসের 'নালহীন কৈল নীলনলিনে'—একই কথা।

বিরহে চন্দ্র, চন্দন, কিসলয়-শয়ন, মলয় পবন ইত্যাদি অগ্নিসম জ্বালাময়—ইহা কেবল জয়দেব নয়, সংস্কৃত কবিদেরও কাব্যে কবিসময়প্রসিদ্ধির মত।

* রূপ গোস্বামীর রচনাতেও এইরূপ প্রথমোক্তি অলঙ্কারের শ্লোক দৃষ্ট হয়।

যস্যাং শৈবাল মঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ম্।
ফুল্ল পঙ্কজপঙ্কজ বিসয়োর্যুগ্মং চ মূলেন তম্॥
উন্মীলতাতিচঞ্চলঞ্চ শফরীদ্বয়ং ব্রজে ভ্রাজতে।
সেয়ং শুদ্ধতরাঽনুরাগ পয়সা পূর্ণা পুরোদীর্ঘিকা॥

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই কবিই এই কবিপ্রসিদ্ধি অন্ধভাবেই অনুকরণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস জয়দেবের অনেক পংক্তি ও পদের অনুবাদও করিয়াছেন। এই অনুবাদে চণ্ডীদাস জয়দেবের অলঙ্কৃত সমাসঘন বাক্যগুলির অতি সরল রূপ দান করিয়াছেন। যেমন—

জয়দেব—রতি সুখসারে গত মভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥

চণ্ডীদাস—তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেত বেণু বাজএ যতনে ॥

জয়দেব—মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম্ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি বিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে।

চণ্ডীদাস—তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর। সত্বরে চলঅ কুঞ্জ এ ঘোর তিমির।
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে। শোভে মেঘমালে যেহ্ন তড়িতে ॥

জয়দেব—বদসি যদি কিঞ্চিদপি……তিমিরমতি ঘোরম্।

চণ্ডীদাস—যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥

জয়দেব—নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্ ॥

চণ্ডীদাস—নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।

জয়দেব—বহতি মলয় সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুম নিকরে বিরহি-হৃদয়-দলনায় ॥

চণ্ডীদাস—এবে মলয় পবন ধীরে বহে মনমথক জাগাএ।
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ ফুটি বিরহি হৃদয়ে॥

বিদ্যাপতির অনেক পংক্তির সহিত চণ্ডীদাসের পংক্তির মিল আছে।

বিদ্যাপতি—নিন্দয় চন্দন পরিহর ভূষণ চাঁদ মানএ যেন আগি।

চণ্ডীদাস—নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।

বিদ্যাপতি—সিরীষকুসুম তনি। অতি সুকুমার ধনি।

চণ্ডীদাস—শিরীষ কুসুম কোঁঅলী অদভুত কনক পুতলি।

বিদ্যাপতি—পীনপয়োধর অপরুবসুন্দর উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমলজল দুই বহ সুরসরিধার।

চণ্ডীদাস—কনককুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োধরে
তাহাতে উপর গজ মুকুতার হারে
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।

বিদ্যাপতি—সাহর মজর ভ্রমর গুঁজর কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন নিঠুর কন্ত ন আব।

চণ্ডীদাস—মুকুলিল আম্ব শাহারে। মধুলোভে ভ্রমর গুঁজরে।
ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ॥

বিদ্যাপতি—শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙারে যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীঁথার সিন্দুর পোছি কর দূর পিয়া বব নৈরাশরে।

চণ্ডীদাস—এ ধন যৌবন বড়ায়ি সকলি অসার।
ছিণ্ডিআ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার।
মুছিঅাঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচুর।

বিদ্যাপতি—পাখী জাতি যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাউ সব দুখ কহোঁ তছু পাশে।

চণ্ডীদাস—পাখীজাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী যাঁও তথা
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ।

বিদ্যাপতি—বড়েও ভুখল নহি ছুহু কওরে খাএ।

চণ্ডীদাস—ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ।

(কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু পংক্তিতে বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনের প্রচলিত বক্রোক্তি, প্রবাদ-প্রবচন, ও সরস বচনের পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে কাব্যরসের ছিটেফোঁটা বেশ মিলিবে। ১। কার কাঁচা আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ। ২। দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে। ৩। বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন হাকল বিকল। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল॥ ৪। দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ। ৫। পোএর মুখে পরবত টলে। ৬। যৌবন পড়িলে তোর তনু হইবে লাউ। যাবত যৌবনে রাধে নাহিঁ লাগে ঘুণ। ৭। মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকল। ৮। তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মঞ্জরে সুখানো কাঠে। ৯। মল্লিকা কলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে। ১০। ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ। ১১। মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। ১২। প্রবল আনল কাহ্নাঞি না নিবাএ ঘৃতে। ১৩। এ তোর আড়নয়নে পাঞ্জর বিঁধিল ঘুনে। ১৪। এবেঁ মোর মনের পোড়নী যেন উয়ে কুম্ভরের পণী। ১৫। সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে। পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে। ১৬। যে ডাল করো মো ভরে। সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে। নাহি হেন ডাল যাতে করো বিসরামে।)

কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড অযথা দীর্ঘ। একই কথার পুনরাবৃত্তির ফলে ইহা দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও রস-কলহ পুনরাবৃত্তি-দোষ সত্ত্বেও শ্রোতৃবৃন্দের নিশ্চয়ই প্রীতিকর হইত। সাহিত্যরসের দিকে কবির দৃষ্টি ছিল না—শ্রোতাদের মনোরঞ্জনই ছিল উদ্দেশ্য। সেকালের শ্রোতাদের যেমন রসবোধ,—রচনাও তদুপযোগী হইয়াছে। এই প্রকারের

রস-কলহের বাণীরূপ পরে শুকসারীর মুখ দিয়া প্রদর্শিত হইত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহ. Lyrical—দানখণ্ড dramatic. এই দানখণ্ডের রস কলহের একটু নমুনা দিই,

কৃষ্ণ—আহ্মে সে কানাঞি গোয়াল নাগর তোহ্মার বার বরিষে।
নহুলী যৌবন অতি সুশোভন সুরভি দেহ হরিষে।
রাধা—প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার তাত না সান্ধাএ চুরী।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।
কৃষ্ণ—আহ্মে সে কানাঞি তোহ্মে চন্দ্রাবলী মরণে তোহ্মা না ছাড়ী
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম আহ্মে হো ভাল গারুড়ী (ওঝা)।
রাধা—তপত দুধ নালে না পীএ জুড়াইলে সোআদ তাএ।
নহলী যৌবন কাঁচা শিরিফল তাহাক কেহো নাহি খাএ।
কৃষ্ণ—যাত খিদা বসে নাগরি রাধা কিবা তার কাঁচ পাকাএ।
যেমন পাএ তেমন খাএ যা নাহি খিদা পালাএ।
রাধা—দীঠি দীঠি চাহি বোলোঁ মো কাহ্নাঞি আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ।
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত ভুখিল বাঘে না খাএ।
রাধা বলিতেছে—কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ কালো মেঘের ছায়া নাহি জাওঁ
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর না খাওঁ কাল কাজল নয়নে না লওঁ
কাল বাহ্নাঞিঁ তোক বড় ডরাওঁ। *

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে কালোর মহিমা প্রচারের জন্য লম্বা একটি তালিকা দিলেন। "কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার। কালো মেঘের জলে জীএ সংসার। *** এহা বুঝি না কর রাধা তোঁ মন মন্দ।" ইহাতে কাল গাই, ভ্রমর, কাজল, ভ্রূ,

* পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণ কালো বলিয়া কালো রঙের প্রতি অভিমানিনী শ্রীমতীর বিমুখতার কথা বারবারই আছে।

চিকুর, চন্দ্রে মৃগলাঞ্ছন, ইন্দীবর ইত্যাদির গুণগানে একটু কবিত্বের আমেজও আছে। এইরূপ তালিকা দিয়া কোন বিষয়ের বর্ণনা বা কোন কিছুর গুণগানের প্রথা বঙ্গ সাহিত্যে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর তিরস্কারের ভাষা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে প্রায় একরূপ। অথচ দুইএ যথেষ্ট প্রভেদ। এই প্রভেদ কাহিনীর পারম্পর্য্য ও আবেষ্টনীর উপর নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাপতির অনুযোগ মানিনীর রসালাপ মাত্র। *

গোপপল্লীর দুগ্ধদধিঘোলের পশারা এই কাব্যখানির নায়িকা চন্দ্রাবলী রাধা—খাঁটি গোয়ালার মেয়ে। অঙ্গে সে নবনীদল কোঁয়লী, কিন্তু মনে মনে সে তেজস্বিনী কম নয়। কাহ্নাইএর ফুল তাম্বূল রাধা বড়াইএর মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিল। বলিল—

দারুণী বুড়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ। তে কারণে মোক করালি হেন কাজ।
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস। আবাস করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ।

বড়াইএর প্রস্তাব শুনিয়া রাধার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল—

যত নানা ফুল পান করপূর সব পেলাইল পাএ।

বড়াই বলিল—যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হও মুকুতি।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হয়ে বিষ্ণুপুরে স্থিতি।

রাধার তেজস্বী উত্তর—

ধিক যাউ নারীর জীবন দহে পশু তার পতি।
পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতি।

* গাব চরাবএ গোকুল বাস। গোপক সঙ্গম কর পরিহাস।
সজনি বোলহ কানু সঞো মেলি। গোপবধূ সঞো বহিকা কেলি।
গ্রামকে বসলে বোলিয় গমার। নগরহ নাগর বোলিয় সংসার।
বস বথান শালি ছুহ গাএ। তহি কি বিলসবি নাগরী পাএ।

কাহ্নাই, নিজে স্বয়ং ভগবান, দৈবকীজঠরে কংসবধের জন্য অবতীর্ণ, কত বার অবতীর্ণ হইয়া কত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, যশোদা তাঁহার জননী নয়, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া রাধাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বৃন্দাবনেও তিনি কত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন—সেকথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন—রাধা তাহাতে একেবারেই ভয় পাইল না। কাহ্নাই রাধাকে মারিয়া ফেলার ভয়ও দেখাইলেন—তাহাতেও রাধা বিচলিত হইল না। রাধা সতীধর্ম্মকে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিত—সে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাধা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে এবং সম্বন্ধে সে মাতুলানী, তাহার প্রতি লালসা অত্যন্ত অধর্ম্মসূচক ও অশোভন—রাধা বারবার এই কথা কাহ্নাইকে শুনাইয়াছে। বারো বছরের বালিকা একাকিনী অসহায়া অবস্থাতেও কামোন্মত্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিয়াছে। তারপর রাধার যে পরিণতি—তাহা সরলা গোপবালিকার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের গোবিন্দ বৃন্দাবনের রসলীলা উপভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই—কংসবধের জন্য অবতীর্ণ। এ গোবিন্দ রীতিমত গোঁয়ার গোবিন্দ। গোপপল্লীতে প্রতিপালিত হইয়া অমার্জ্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর। এই গোপপল্লী সেই যমুনাতীরের বিদগ্ধ ভাবাপন্ন আভীরপল্লী নয়—এ যেন বাঙ্গালার ভাগীরথীতীরের অশিক্ষিত গোপপল্লী। রাধা বড়ায়িকে ভাগীরথী কূলে গোবিন্দকে খুঁজিতে বলিয়াছিল—সেটা অসঙ্গত কথা নয়। প্রথম যৌবনের উদ্দীপ্ত লালসার তৃপ্তির জন্য এই যুবক উদ্‌গ্রীব, প্রেমের মর্য্যাদা সে বুঝে না। সে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শঠ। রাধা তাহার ফুল তাম্বূল উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তাহার অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছিল—তাহার দম্ভ ও প্রতিহিংসা যেন তাহার লালসাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। এই শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্র যেমন দীনপ্রাণা হরিণীকে

আক্রমণ করে—সেই ভাবে নির্জ্জন বনপথে অসহায়া সাশ্রুনয়না বালিকা রাধাকে আক্রমণ করিতেছে।

সে দীনা বালিকার কাছে কেবল নিজের বলবীর্য্যের আস্ফালন করিতেছে—সতীধর্ম্মকে উড়াইয়া দিতেছে—পরদারগমনকে পুরাণের উপাখ্যান তুলিয়া সমর্থন করিতেছে। সে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে—ছল করিয়া মহাদানী সাজিতেছে—কাণ্ডারী সাজিতেছে—মাঝ যমুনায় নৌকা ডুবাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ করিতেছে—রাধার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতেছে। রাধার জীবন লইয়া সে বিড়াল যেমন ইঁদুর লইয়া খেলা করে, তেমনি করিয়া খেলা করিতেছে—রাধার দেহের উপর অত্যাচারের ত কথাই নাই—বার বার তাহার জীবন-সংশয় হইতেছে।

এই শ্রীকৃষ্ণ সাধ করিয়া আবার রাধার ভার বহন করিতেছেন তাহার মাথায় ছাতা ধরিতেছেন। আবার রোষ প্রকাশের সময় বলিতেছেন—"আমাকে দিয়া সে ভার বইয়েছে—ছাতা ধরিয়েছে—তাকে আমি ক্ষমা করব না।" শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসেন মনে করিয়া সরলা রাধা একবার মান করিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ মামুলী বচনে একবার মানভঙ্গের চেষ্টা করিয়া শেষে উগ্রমূর্ত্তি ধরিলেন—বনের ফুলফল ভাঙ্গার মিথ্যা দোষারোপ দিয়া রাধাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। ক্ষণিক মিলনের পর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া লুকাইলেন।

রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে পাগলিনী, তখন এই শ্রীকৃষ্ণই আবার সাধু সাজিয়া বলিলেন—"আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে পারি না—তুমি মাতুলানী—'এবে সে জানিল হইল কলি অবতার। সবজন থাকিতে ভাগিনা চাহে জার।' আমি এখন যোগ অভ্যাস করিতেছি—আমি এখন জিতেন্দ্রিয়।" এসব কথা নিদারুণ ব্যঙ্গ।

অনেক সাধাসাধির পর বড়ায়ির অনুরোধে কৃষ্ণের দয়া হইল। কৃষ্ণের

উরুতে মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িল। সেই সুযোগে কৃষ্ণ মথুরায় পলায়ন করিলেন। লম্পট বন্ধু ফাঁকি দিয়া চম্পট দিলেন। রাধা হাহাকার করিতে লাগিল—বড়াই তাহার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখের কথা বলিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাধার আচরণ আমি ভুলিব না—তাহার মুখের কথা বড়ই কড়া কড়া, সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে—আমার অপমান করিয়াছে। তাহাকে আর আমি চাই না। আমার এখানে গুরুতর কাজ আছে। কংসবধ করিতে হইবে।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম যৌবনের প্রচণ্ড লালসার তৃপ্তির জন্যই যেন রাধাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন লালসানল নির্বাপিত হইয়াছে আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। একটা অজুহাত দেখাইয়া রাধার প্রতি কৃষ্ণ অক্লেশে ঘৃণাবিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলেন। উৎসব-নিশীথের উপভুক্ত মালতীমালার ন্যায় শ্রীমতী বৃন্দাবনে ধূলিশয্যায় পড়িয়া থাকিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কি আসে যায়?

এই শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপের যদি একটা রূপকার্থ কল্পনা করা না যায়—তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কি গতি হইবে? তার পর কবি রাধিকার দুর্দশার কথা বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। বসন্তকাল আসিলে—রাধার তাপ ও অনুতাপ দুইই দেখা দিল। শ্রীমতী আক্ষেপ করিয়া বলিল—"কেন কালঘুম ঘুমাইলাম! কেন কৃষ্ণের ফুল তাম্বূলের অসম্মান করিয়াছিলাম! সাগরসঙ্গমে গিয়া গায়ের মাংস কাটিয়া মকরের ভোজ দিব—আর জন্মে যেন এ বিচ্ছেদ না হয়।" শ্রীমতী স্বপ্ন দেখিল—প্রথম প্রহরে কৃষ্ণ চুম্বন করিলেন—দ্বিতীয় প্রহরে তিনি আত্মসমর্পণ চাহিলেন, আমি অনুমতি দিলাম না—তৃতীয় প্রহরে আমার চিত্ত চঞ্চল হইল।

চউঠ পহরে কাণ করিল অধর পান মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আমার নিঁদে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

এই স্বপ্নই সমস্ত কাব্যখানির মর্ম্মকথা।

(রাধার আক্ষেপের ক্ষতে বড়াই ছুটের ছিটা দিয়া বলিল—

কাহ্নের তাম্বূল রাধা দিলোঁ মোর হাথে। সে তাম্বূল তো ভাঁগিলি মোর মাথে
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।

ইহার উত্তরে শ্রীমতী যাহা বলিল তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মান রাখিয়াছে—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার। ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান। আপনার দৈবদোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন।
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর। যোগিনী রূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর।
যবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে। হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।

এই কথাইত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিরা বিভিন্ন ভাষায় বলিয়াছেন।

একে একে সব কথা মনে পড়িতেছে—আর শ্রীমতীর অনুতাপ জ্বালা 'তুসির আগুন যেহ্ন দহদহ জ্বলে।' প্রত্যেক ত্রুটির জন্য রাধা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—আমি তখন নিতান্ত 'শিশুমতী' ছিলাম তোমার মহিমা বুঝি নাই।

পানফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী। সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতি॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদম্বের তলে। সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জানিলোঁ ভোলে॥
বারে বারে যত তোক বুইলোঁ আহঙ্কারে। সেহো দোষ খণ্ড মোর দেবগদাধরে॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হইতে নাএ। সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ॥
আর দুখ দিলো তোক বহায়িগোঁ ভার। সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার।
অনাথী নারীর কত থাকে অভিমান। আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্নে রাখহ পরাণ।

রাধাবিরহ শেষ হইয়াছে—শ্রীরাধার বারমাস্যা গানে। এই 'বারমাস্য' রচনার পদ্ধতি সাহিত্যে এইখান হইতে সুরু হইয়াছে।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হয়। প্রাকৃত-পিঙ্গলের পজ্ঝটিকা বিদ্যাপতিতে তরলায়িত হইয়া বাঙ্গালা পয়ারের কাছাকাছি

আসিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে চর্য্যাপদের পজ্ঝাটিকা হইতে পয়ারের জন্মের মাঝামাঝি অবস্থাগুলির পরিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গল ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পয়ার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ারের পরের অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসের আসল রচনা পাওয়া যায় না। ঢাকা হইতে যে কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পয়ারের রূপ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ারের রূপ একই প্রকারের। তবে চণ্ডীদাসের একটি পদে পজ্ঝাটিকার আসল রূপ পাওয়া যায়। "নীলজলদসম কুন্তলভারা। বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা। শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দুর। প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুর ৮ ইহাতে 'নীলের' ঈকারের দীর্ঘ উচ্চারণ ধরা হইয়াছে এবং কুন্তল, চম্পক ও সিন্দুর এই তিনটি শব্দে যুক্তাক্ষরের জন্য দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পয়ারে ১৩—১৪—১৫—১৬ অক্ষর পর্য্যন্ত আছে। যেখানে ১৩ অক্ষর আছে—যেখানে একটি দীর্ঘস্বরকে পজ্ঝাটিকার মত দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। যেমন—

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে। মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী।
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী। সুদ্ধি কেতকী সম সজাইআঁ দহী।
দধি বিকে যা আজি মথুরার রাজ। কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।

যেখানে ১২টি অক্ষর সেখানে দুইটি দীর্ঘস্বরকে দুই দুই মাত্রায় ধরা হইয়াছে। ইহা রীতিমত পজ্ঝাটিকারই মত। যেমন—

এ যুগতী পুতা বোলহ্ আহ্মারে। রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর।
কালমেঘের জলে জীএ সংসার। গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।
সুন্দরী রাধা ল সরোবরময়ী।

যেখানে ১৫ বা ১৬ অক্ষরে পংক্তি রচিত হইয়াছে সেখানে—আই-আউ ইত্যাদিকে একটি অক্ষর ধরা হইয়াছে অথবা পরবর্ত্তী হসন্তবর্ণ সহ ব্যঞ্জনবর্ণকে একমাত্রায় ধরা হইয়াছে। এপ্রথা পরবর্ত্তী কাব্য-সাহিত্যে খুব চলিয়াছিল।

বড়ায়ি (বড়াই) ও কাহ্নাঞি শব্দ দুটিকে মাঝে মাঝে দুই মাত্রায় ধরা হইয়াছে, বাসলীকে সর্ব্বত্রই চারি মাত্রা ধরা হইয়াছে।

১। রাধার পন্থ নেহালিঞা রহিলা কাহ্নাঞি। ২। কোন বাটে আন্ধা লঞা জাইবেঁ ল বড়ায়ি। ৩। যমুনার ঘাট জাইতেঁ আছে পথ দুই। ৪। হাট জাইতেঁ নিষধল সাসুড়ী আইহনে। ৫। আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে। ৬। আনাইআঁ জানাইল সব গোআলিনী সহী। ৭। ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার। ৮। কালমেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ। ৯। বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।

দীর্ঘস্বর যুক্ত শেষাক্ষরকে দুই মাত্রায় ধরিয়া ১৩ অক্ষরেও পংক্তি গঠন করা হইয়াছে। ইহা 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' ইত্যাদির পূর্ব্বাভাস।

সোনার চুপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী। নেতের আঁচল তাত দিআঁ ওহাড়ী।

একই চরণে দীর্ঘস্বরকে দুইমাত্রা—অথচ হসন্ত-অক্ষরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে এক মাত্রাও ধরা হইয়াছে।

প্রচলিত পয়ারে যেরূপ শব্দের আক্ষরিক বিন্যাসের প্রথা নিয়মিত হইয়াছে, চণ্ডীদাস সে প্রথা বহু পংক্তিতেই অনুসরণ করেন নাই। শব্দের মধ্যে যতি সংস্থানেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। বলা বাহুল্য সুর করিয়া পড়িলে বা গাহিলে ইহাকে ত্রুটী বলিয়া ধরা যায় না। তবে একথা এখানে বলিতে হয়—চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পয়ার-পংক্তিই বর্ত্তমান প্রথার বিচারেও নির্দোষ।

চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার পংক্তির সঙ্গে দশ অক্ষরের পংক্তির মিল দিয়াও চণ্ডীদাস ছন্দ রচনা করিয়াছেন।

১৪+১০ কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে। জাইবোঁ ঝাঁট মথুরার হাটে।
মতি খাঞা মোরে তোএঁ করসি ধামালী।
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালি।
গরু রাখি তোর কাছে গেলিরে জরমে। তেঁসি তোর এসব করমে।

এঁবে যমুনার ঘাটে ভৈলা মহাদানী। দান ছলেঁ বোল পাপবাণী।

দশ অক্ষরের পংক্তির হ্রস্ব পয়ারও কৃষ্ণকীর্ত্তনে যথেষ্ট।

চাহ মোরে মুখশশী তুলী। তোহ্মে রাধা আহ্মে বনমালী।

তোর মোর ভৈল পরিচএ। এবে পরিহর তোহ্মে ভএ॥

বারো অক্ষরের অর্থাৎ ৬+৬ অক্ষরের হ্রস্ব পয়ারও পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পংক্তি পরে লঘু ত্রিপদীর স্তবকে অন্তরার কাজ করিয়াছে।

৬+৫ অক্ষরের একাবলী ছন্দও পাওয়া যায়। তবে ৬+৬ এর সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্রিত।

শুনীএ যবেঁ সে আইহন বীর। করেতে তোহ্মা করিব চীর।

মাণিক জিনিআঁ দশন তোরে। তা দেখি দাড়িম ফল বিদরে।

কম্বু সম তোর শোভএ গলে। কুচ যুগ রাধা যোড় শ্রীফলে।

প্রাকৃত বৃত্তনরেন্দ্র ও ভরহট্টা ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মাঝামাঝি অবস্থার ত্রিপদী কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়।

৮+৮+৮+৪--জাইবার না দিলি। মথুরার হাটে ল। দানছলে রোদসি। বাটে।

গোপীগণ সঙ্গে আহ্মে। ছছন্দে বুলিলোঁ ল। বিকো জাওঁ মথুরার। হাটে।

দুই পর্ব্বে মিল-দেওয়া সম্পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদীও কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়। তবে এই ছন্দে অনেকস্থলে মাত্রার নিয়ম রক্ষা করা হয় নাই।

৮+৮+(৮+২)১০—

পামরি হেনারি নারী। হআঁ বড় আছিদরী।

অসহন বোলহ সকলে।

তোর ভাল রিত নহে। কে তোহোর হেন সহে।

দান লৈবোঁ ধরিআ অঞ্চলে।

আইহন সে জীএ কিকে। হেন নারী পাঠাএ বিকে।

গোপজাতি ধনের কাভরে॥

যার ঘরে হেন নারী। সে কেহে ধনভিখারী।
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে।

রাধা-বিরহের—আছিলো সোঁ শিশুমতী—না জানি গো রঙ্গবতী—ইত্যাদি পদটি এই ছন্দের প্রায় নিখুঁত নিদর্শন। ভুজযুগ ধরি কাহ্নে আল কৈল আলিঙ্গনে—পদটিতে অনিয়মিত হইলেও ৮+৮+৮+৬ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাকৃত দোহা ছন্দের অনুসরণও ২।১টি পদে দেখা যায়। দোহা ছন্দের নিয়ম কবি কাঁটায় কাঁটায় রক্ষা করিতে পারেন নাই।

৮+৬+৮+৪—পূরুব জরমে। কাহ্নাঞি ল। আল আছিলোঁ তোর। নারী।
ইহ জরমে কেবা। পাতিআএ। আপণে বুঝহ মু। রারী।
মো নাহিঁ নাশি তোর। বৃন্দাবনে। সুনল সুন্দর কা। হ্নাই।
পথিক লোক তাক। উপভোগল। তাত মোর দোষ। নাই ॥

কবির লঘু ত্রিপদী ছন্দটি বড়ই অনিয়মিত। ইহাতে দীর্ঘস্বরকে কখনও কখনও দুইমাত্রা ধরা হইয়াছে—অনেকস্থলে পদাংশকেও (Syllable) একমাত্রায় ধরা হইয়াছে—ফলে অক্ষর-মাত্রা, স্বরমাত্রা ও পদাংশমাত্রা—তিন প্রকার মাত্রারই সমবায় হইয়াছে—ইহার ফলে এই ছন্দের কবিতাগুলি একেবারেই সুশ্রাব্য নয়। মাঝে মাঝে সুনিয়মিত পংক্তিও পাওয়া যায়।

প্রাচীন লঘুত্রিপদী—চারি দিগেঁ তরু। পুষ্প মুকুলিল। বহে বসন্তের। বাএ
আম্বডালে বসি। কুয়িলী কুহলে। লাগে বিষবাণ। ঘাএ

বর্ত্তমান যুগের " —হাসিতেঁ খেলিতেঁ। গোপনারীগণ। লাগিলা যমুনা। তীরে
কাহ্নাইর মুখ। কমল দেখিআঁ। কেহো না ভরিল। নীরে।

প্রাকৃত রূপের অনুস্মৃতি—পাইল রাধা। কালীদহকূল। লইআঁ সখি-স। মাজে
ঘাটত ভেটিল। নান্দের পো। কাজ না বুঝিল। লাজে।

ত্রিপদী ছন্দের অধিকাংশ স্থলে এই তিন রীতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

এই বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন কিনা ইহা লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ডাঃ সুনীতিকুমার ও হরেকৃষ্ণ বাবু বহু সতর্কতার সহিত চণ্ডীদাসের শতশত পদ হইতে ২৪টি পদকে বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচনা বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন। ভাবে, ভাষায় বিষয়বস্তুর অবতারণার প্রকারে ও অলঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত যে পদগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন কেবল সেই পদগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেব কেবল ভণিতার দিক হইতে বিচার করিয়া ঐ ২৪টি পদের অধিকাংশকেই বড়ু চণ্ডীদাসের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই দীন চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের বহুপরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার রচনা অপকৃষ্ট শ্রেণীর। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলিকে ইহার রচিত বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না। ফলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির জন্য ইহারা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া তৃতীয় চণ্ডীদাসের কল্পনা করিয়াছেন। এই চণ্ডীদাস বড়ু ও দীনের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। ইতিমধ্যে ইহাদের বিচারে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু পদ অন্যান্য কবির ভণিতায় কোথাও না কোথাও পাওয়া যাওয়ার জন্য সেগুলিকে কোন চণ্ডীদাসেরই নয় বলিয়া ইহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গে পদাবলীর কোন পদেরই আলোচনা নিরাপদ নয় বলিয়া মনে করি।

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের পরিচয় নরহরিদাসের পদের দ্বারাই দেওয়া যাইতে পারে।—

রামচন্দ্র কবিরাজ বিখ্যাত ধরণীমাঝ তাহার কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ।
চিরঞ্জীব সেন পুত কবিরাজ নামে খ্যাত শ্রীনিবাস শিষ্য কবিচন্দ্র।
তেলিয়া বুধরিগ্রামে জন্মিলেন শুভক্ষণে মহা শাক্ত বংশে * দুইভাই।
পরে পিতৃধর্ম্মত্যাগী ঘোরতর পীড়া লাগি বৈষ্ণব হইলা দোঁহে তাই।
হইল আকাশবাণী কহিলেন কাত্যায়নী গোবিন্দ গোবিন্দপদ ভজ।
বিপত্তে মধুসূদন বিনে নাই অন্যজন সার কর তাঁর পদরজ।
শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিকুলে শ্রেষ্ঠতর গোবিন্দের হন মাতামহ।
সুরগুরু সঙ্গে যার তুলনায় বারবার লোকে যশ গায় অহরহ।
বুঝি মাতামহ হৈতে কবিকীর্ত্তি বিধিমতে পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।
কহে দীন নরহরি তাই ধন্য ধন্য করি গায় গুণ পণ্ডিত-সমাজ।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়—শ্রীখণ্ডেই গোবিন্দদাসের জন্ম। বাড়ী কুমারনগর, তেলিয়া বুধরিগ্রামে পরে বাস করেন।

---

* গোবিন্দদাস যে প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটি পদ হরেকৃষ্ণবাবু বৃন্দাবনদাসের রস-নির্য্যাস হইতে উৎকলিত করিয়াছেন—

হেমহিমগিরি দুই তনু ছিরি আধ নর আধ নারী।
আধেক উজর আধ কাজর তিনই লোচন ধারী।
না দেব কামিনী না দেব কামুক কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর কহই গোবিন্দদাস।

এই পদ হইতে গোবিন্দদাসের পরিকল্পিত কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমের একটি মনোরম

গোবিন্দদাস তিন জন। একজন গোবিন্দদাস ঝা ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির অনুসরণে ইহার লিখিত মৈথিলী ভাষার কয়েকটি পদ বঙ্গদেশেও প্রচলিত আছে। আর একজন গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী। ইনিও পদকর্ত্তাদের মধ্যে বিখ্যাত কবি। ইহার রচিত পদগুলি প্রধানতঃ বাঙ্গালাভাষায় লিখিত। তৃতীয় গোবিন্দদাস তেলিয়া বুধরি (মুর্শিদাবাদ) গ্রাম নিবাসী ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে ইহার জন্ম ও প্রতিপালন। গোবিন্দদাস বাংলায় ২।৪টি ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দ দাস বঙ্গের একজন মহাকবি। ইহার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। নিজে খুব বড় ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ইনি ভক্তির ভাবাকুলতা সংবরণ করিতে পারিতেন। ফলে, ইহার পদে কবিত্বের অবাধ স্ফুরণ হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কবিত্ব প্রাণের গভীর আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ নয়—সেজন্য বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবিত্ব-মহিমা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে ইনি আর্টের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করেন। কবিতার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব-সাধনে কবির কোথাও অঙ্গহানি হয় নাই। যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য, তেমনি পদবিন্যাসের চাতুর্য্য, তেমনি ভাব-প্রকাশের কৌশল, তেমনই আলঙ্কারিকতা। কোথাও কোথাও অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে ও অর্থালঙ্কারের জটিলতায় তাঁহার কোনকোন পদ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। স্থলে স্থলে Strained

চিত্র পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস যে ব্রজলীলা বর্ণনার আগেই ব্রজবুলিতে গৌরীশঙ্করের মহিমা গান করিতেন—তাহারও প্রমাণ পাই। সেকালে ব্রজবুলিই সকলপ্রকার কবিতা রচনার ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর একজন বড় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও একজন ভক্ত ও পণ্ডিতলোক ছিলেন।

Mataphorও আছে। গোবিন্দদাস তাঁহার পদে অর্থশ্লেষ, রূপকালঙ্কার, কাব্যলিঙ্গ, মালারূপক, অতিশয়োক্তি, বিষম, সূক্ষ্ম, সন্দেহ, মীলিত, লুপ্তোৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের ভূরি ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমা যদি কালিদাসস্য হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা গোবিন্দদাসস্য বলিতে হয়। গোবিন্দদাসের কবিতায় সংস্কৃত কবিদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি বহু সংস্কৃত শ্লোককে পদের রূপ দান করিয়াছিলেন—বহু সংস্কৃত কবির অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বহু সংস্কৃত কবি প্রৌঢ়োক্তি তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাপতির কাছেও গোবিন্দদাস ঋণী, শুধু ভাষা ও ছন্দের জন্য নয়—বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী ও পদবিন্যাস-চাতুর্য্যও তিনি অধিগত করিয়াছিলেন—অবশ্য বহুস্থলেই শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ছন্দ ও পদলালিত্যের জন্য গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছেও ঋণী। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস সম্ভোগের কবি, উল্লাসরসের কবি। রাসারম্ভের "শরদচন্দ্র পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ ফুল্ল মল্লী মালতীযূথী মত্ত মধুপ ভোরনি" ইত্যাদি পদের মত উল্লাস রসের পদ পদাবলী-সাহিত্যেও নাই। 'বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ' একটি উল্লাসের পদ। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে দেখা যায় না। বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত বাৎসায়নী স্বাধীনতা কাহারও পদে দেখা যায় না,—প্রকাশের ভাষার আলঙ্কারিকতা ও মণ্ডনকলার গুণে অশ্লীলতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাসের রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস্য, প্রেমবিহ্বলতা, মোহমাদকতা, মিলনাকুলতা ও স্বপ্নমাধুর্য্যের পদগুলি জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের সম্পদ। গোবিন্দদাসের গোষ্ঠবিহারের পদও চমৎকার। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা গানে যে ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসের ঐশ্বর্য্য তাহা যদি কেহ বুঝে তবে কীর্ত্তনীয়ার মৃদঙ্গই বুঝে। চাতুর্য্যের দ্বারা যে কতটা মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিতে

পারা যায় তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণও যে এই গানে গলিয়া যাইত—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

গোবিন্দদাসের কবিতা যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল—তাহার অনেক প্রমাণ আছে—

অনুরাগ-বল্লীতে দেখিতে পাই—

বড় কবিরাজ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাঁর গুণগ্রাম।
তিহোঁ গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞির স্থান।
তাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ।
গোসাঞি সগণ তাহা কৈল আস্বাদন।
বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিজ মন।

আমরা ভক্তি-রত্নাকরে দেখিতে পাই—

গোবিন্দ শ্রীরাম চন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞা কবি সবে প্রশংসয়।
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঁই।

সেই শ্লোকটি এই—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলৈ-
রানীতঃ কবিতাবলী-পরিমল কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।
শ্রীবজ্জীব সুরাব্ধি পাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমদ্ভুৎ পরম্॥

কবি নরহরি বলিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি ধীর মহামন গৌর চরিত্র।
নির্ম্মল প্রেম প্রচার চারুগুণ যাক কাব্য করুভুবন পবিত্র।

কবিবল্লভ একটি পদে তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগেদবী যাঁহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে অলৌকিক কবিশিরোমণি।
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশ ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে সে সকল করিল পূরণ।
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্য-রত্ন শুনি যাহা চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে উপাধিটি করিলা প্রদানে।
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্তি অতুলন এমহী মণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি এ বল্লভ দঢ় করি বলে।

আলঙ্কারিকতার জন্য গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয়। অলঙ্কৃত করিয়া না বলিলে কোন বক্তব্য কাব্য হইয়া উঠে না তাহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি অতি দুর্লভ অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া রাজ রাজেশ্বরী রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই আলঙ্কারিকতা কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের মত স্বাভাবিক ভাবে প্রবুদ্ধ হয় নাই। মনে হয় তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক,—বিশেষতঃ উজ্জ্বলনীলমণি, রসমঞ্জরী, অলঙ্কারকৌস্তুভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তক মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়া অলঙ্কার-প্রয়োগে পারদর্শী হ'ন। অনেক সময় মনে হয়, অলঙ্কার-প্রয়োগের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্যই কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। অনলঙ্কৃত সরল ভাষায় বৃন্দাবনলীলার কোন কোন অঙ্গকে প্রকাশ করিলে তাহা অশ্লীল হইয়া উঠে, গোবিন্দদাস

বৃন্দাবনলীলার অতি গুহ্যতম অংশকেও বাণীরূপ দিয়াছেন—কিন্তু আভরণের আবরণে সে সমস্ত বিশেষ অশ্লীল হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গোবিন্দদাসের অলঙ্কার কঠোর স্বর্ণহীরকের অলঙ্কার নয়—ফুলের অলঙ্কার। তাই ইহার সৌরভ আছে। অলঙ্কারগুলির ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিই এই সৌরভ। কবির একটি ব্যঞ্জনাগর্ভ পদের এখানে উদাহরণ দিই—এখানে সুরভিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যবধরি পেখলুঁ কান।
কতশত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাত পরাণ।
সজনি, জানলুঁ বিধি মোহে বাম।
তুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম।
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি।
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রস মরিযাদ॥

ভাবাকুলতার সংযমের সহিত অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে গোবিন্দদাসের পদে যেরূপ পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ কোন বৈষ্ণব কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না। গোবিন্দদাসের অনেক পদে অলঙ্কার-প্রয়োগেরও ক্রম-শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়।

১। ভীতক চিতভুজগ হেরি যো ধনি চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ।
মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরি জীবই বহু পুন ভাগ॥
যো পদতল থলকমল সুকোমল ধরনি পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি আয়ত যায়ত নিঃশঙ্ক।

মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজই দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনি চলয়ে একাকিনি গোবিন্দদাস কহ ক্রূর।

২। যোমুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ মধুকর ধনি ভেল দন্দ।
যো কর কিসলয় পরশ উপেখলুঁ অব কিসলয়ে তনু ফোর।
নব নব মেহ সুধারস নিরসলুঁ গরলে ভরল তনু মোর।
সো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দ দাস কহ সো অতিদুরগহ যো ঐছন মতি দেল।

এই দুইটী পদের পংক্তিপরম্পরা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক ক্রম (Rhetorical Sequence) অবলম্বনে রচিত। একই অলঙ্কারের মালিকা। অলঙ্কার ও ফুরাইল পদও শেষ হইল। এখানে আবেগাত্মক (Emotional Sequence) ক্রম আলঙ্কারিক ক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই Rhetorical Sequence এর দৃষ্টান্ত—'ভাল ভেল মাধব তুঁহু রহুঁ দূর।' পদটিতেও দেখা যায়। কবি এই ক্রম-শৃঙ্খলা সংজ্ঞাবাচক শব্দের বিশিষ্টার্থক সুপ্রয়োগেও রক্ষা করিয়াছেন—নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যো সম সো আওল ব্রজমাঝ এই পদটি তাহার দৃষ্টান্ত। গোবিন্দ দাসের অধিকাংশ রচনার Sequenee Emotional নয়, Intellectual ও নয়—Rhetorical. অলঙ্কৃত বাক্যধারায় নিজস্ব একটা ক্রম আছে—গোবিন্দদাস সেই ক্রমই অবলম্বন করিয়াছেন—আলঙ্কারিক ভঙ্গী যে ভাবে কবিকে পরিচালিত করিয়াছে—কবির লেখনী সেই ভাবেই চলিয়াছে। অলঙ্কারের দিক হইতেই ইহাদের উৎকর্ষের সন্ধান করিতে হইবে।

গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিকতার উদাহরণ—

রূপক-মূলক কাব্যলিঙ্গ—

যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদরস আশে।

যো অব নয়ন নীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দদাসে।

তব অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন অব সুপুরুষ বধ জান।

উচ কুচ চুম্বক সরস পরশ দেই উদঘাটহ দিঠি বান।

শ্লেষ—কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি·········পূজহ পশুপতি নিজ তনুদান ইত্যাদি পদটি শ্লেষের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ—

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি কনকলতা সম সাজ।

হরি চন্দন বলি কোলে আগোরল কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজ।

শ্লেষ—যা কর লাগি মনহি মন পোই। গড়ল মনোরথ না চড়ল সোই।

অতিশয়োক্তি—এসখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর

কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর।

মালারূপক—অধর পঙার দশন মণি জোতি

রোচন তিলক মৈনাকক জোতি।

শ্লেষমূলক বিষমালঙ্কার—

যো গিরি গোচর বিপিন হি সঞ্চরু কৃশ কটি কর অবগাহ।

চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥

সুন্দরি, ভালে তুহুঁ হরিণ নয়ানি

সো চঞ্চল হরি হিয়া পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সেয়ানি।

সূক্ষ্ম অলঙ্কার—

বিঘটি মনোরথ আন চপল হরি তাহি তুহুঁ সঙ্কেত রাখি,

কুসুম হার অরু মুকুলিত সরসিজ গোবিন্দদাস এক সাখী।

মালোপমা—

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেড়ল হেম।

কনকলতায় জনু তরুণ তমাল। নব জলধরে জনু বিজুরি রসাল।

কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। তুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥

সামান্য –

চান্দ নিরজনি উজোরোলি গোরি। হরি অভিসার বড় সরস ভোরি।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলিত জনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুর। রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর।

[জ্যোৎস্নার মধ্যে ধবলবসনা গৌরাঙ্গী রাধিকাকে চেনা যাইতেছে না। যেন রাঙের পুতুল পারদের মধ্যে ডুবিয়াছে।]

রূপক—

(১) বেণুক ফুকে ফুকে মদনানল কুল ইন্ধন মাহাজারি।
দরশ পানি দুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রমজল জোরনবারি।

(১) কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল প্রেমপবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোল॥

(৩) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাবকদম্ব।

* * *

চঞ্চল চরণ কমলদলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

সাঙ্গরূপক—মাধব মনমথ ফিরত আহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর পন্থ নেহারত তেরা।
ইত্যাদি পদ।

শ্লিষ্ট রূপক—কিসলয় দহন শেজ অব সাজহ আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজকুল নাদমন্ত্রে তনু জারব দূরে যাউ প্রেম কলঙ্কা॥

পরম্পরিত রূপক—

অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥

ভ্রান্তি—হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাখ

সমুচ্চয়—কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল তাহে পুন কুল মরিযাদ
তাহে পুন হরি সঞে নেহ ঘটায়ল তাহে বিঘটন পরমাদ ॥

পর্য্যায়োক্ত

এবহুঁ বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত। বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ ॥

বিশেষোক্তি—

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম।
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥

ব্যাজস্তুতি (১) পুর নাগরি সঞে রসিক শিরোমণি পুরহ মনমথ কেলি।
বনচরি নারি তোহারি গুণ গাওব পুতনিক সঞে মেলি ॥
(২) ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পূর ইত্যাদি।

সন্দেহ—(১) সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরীত।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সংবাদ।
তনু জিবন দুহুঁ ধনিক বিবাদ।
(২) ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ ভেল দুহুঁ বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল কো বিধুমণি কো ইন্দু।

মীলিত—কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই।

উৎপ্রেক্ষামূলক ব্যতিরেক—

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ।
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশি-ষোলকলা।

বিনোক্ত—তনুমন জোরি গোরি তোহে সোঁপল কনয়া জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দ দাস ভান কনয়া বিহনে মণি কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ।

ধ্বনিগর্ভ সামান্য অলঙ্কার—

যাবক চীত চরণ পর লীখই মদনপরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল কানুক আরকত হাত।

[রক্তবর্ণ হস্তে আলতার দাগ বুঝা যাইবে না।]

নিদর্শনা—রসিক শিরোমণি নাগর-নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়।
জনু বাওন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চঢ়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোঁজব মিলব কল্পতরু নিকরে।

ব্যতিরেক—(১) জলদহি জলদ বিজুরি দিঠিতাপক মরকত কনয় কঠোর।
এ দুহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন নিরুপম নওল কিশোর।
(২) ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতি লাজ।

পরিণাম—যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হউ মঝু গাত। যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হউ তছু মাহ। ইত্যাদি—

রূপকাত্মক পর্য্যায়—

মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার-তটিনি তট কুচ ঘট উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল নাভি সরোবর মাহ্।
তাহিঁ লোমাবলি ভুজগি সঙ্গ ভয়ে ত্রিবলি বেণি অবগাহ।

উপমাত্মক—

নীল অলকাকুল অনিলে হিলোলত নীলতিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনি জনু শামর সায়রে লখই না পারই কোই।

শ্লিষ্ট বিরোধাভাস—তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম।
সংসৃষ্টি— অব কিয়ে করব উ-পায়।
কালভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধি সখি গমন যুগতি না যুয়ায়।
চন্দ্রকচারু ফণাগণ মণ্ডিত বিষ বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মীঠ।
[বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কারের মিশ্রণ।]

পুনরুক্তবদাভাস যুক্ত বিরোধাভাস—
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী সুরস্রুতা স্রবে নয়নে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল সোই নয়নবর বয়নে।

উৎপ্রেক্ষা—
ঘনঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি মুহরি রাখিল কত বেরি।

ধ্বনিগর্ভ অতিশয়োক্তি—
(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ দুহুঁ পাদুক করি নেল।
(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান
কতশত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ।

বিষমালঙ্কার—
(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই কৈছে করব অভিসার।
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত উতপত দীঘ নিশাসে।
(২) যো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভেল।

\

অসঙ্গতি—

পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর।
হাম উজাগরি রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি।
হামারি রোদন অভিলাষ। তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ।

একাবলী—কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান।

রূপকাতিশয়োক্তিমূলক উৎপ্রেক্ষা—

সো মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ নয়ন দহন ভেল চন্দ ইত্যাদি পদটি।

ভ্রান্তি—সুন্দরি জানলি তুয়া দুরভান।
হরিউর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি তাহে সৌতিনি করি মান। *

গোবিন্দদাস রচনার উপাদান, উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেন নাই যে তাহা নয়। রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, অভিসারের আয়োজন-উপকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা হইতেই লইয়াছেন, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি-প্রকৃতি বিষয়েও নূতনত্ব কিছুই দেখান নাই, মানভঞ্জন,

---

* এইসঙ্গে আছে—কাহে মিনতি কর কান। তুহুঁ হাম এক পরাণ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধার রোষের অবধি নাই।—এই দুই চরণে কি দারুণ শ্লেষই না ব্যক্ত হইয়াছে! কাব্যপ্রকাশে এই অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ আছে—গোবিন্দদাস তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

জস্‌সেঅ বণো তস্‌সেঅ বেঅনা ভণই তং জণো অলিঅম্।
দন্তকৃখঅং কবোলে বহুএ বেঅনা সবত্তীণম্॥

[লোকে বলে যার ব্রণ তাহারি বেদনা,—কাজে দেখি ইহা মিথ্যা কথা।
বধূর অধরে হেরি দশনের ক্ষত তবে কেন সপত্নীর ব্যথা?]

সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় যে মামুলি রীতি আছে তাঁহার রচনায় তাহার বৈতথ্য দেখি না। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই,—পুরাতন উপাদান উপকরণ লইয়া তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। অধিকাংশ পদেই তাঁহার নিজস্ব শক্তির একটা মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অনুসারক বা অনুকারক মাত্র নহেন—তিনি একজন স্রষ্টা। পুরাতন উপকরণে তিনি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়িলে চিরপুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি রমণীয় রসঘন রূপ ধরিতে পারে—তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উপমানগুলি সংস্কৃত কবিরা প্রয়োগ করিয়াছেন—গোবিন্দদাস সেই উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে মামুলী ব্যতিরেক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারা রূপবর্ণনা করিতেন, গোবিন্দদাস তাহা না করিয়া ঐগুলি লইয়া নানা কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বিরহিণী রাধার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

> এত দিনে গগনে অখিণ বহু হিমকর জলদে বিজুরি রহু থীর।
> চামরি চমরু নগরে পরবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥
>
> মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
>
> এক বিয়াগে বহুত সিধি সাধলি অতয়ে উপখলি রাই॥
> কুমুদিনিবৃন্দ দিনহি অব হাসউ বান্ধুলি ধরু নব রঙ্গ।
> মোতিম পাতি কাঁতি ধরু উজর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ॥

গোবিন্দদাস বিয়োগের কথা বলিয়া এখানে অবশ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন—বিদ্যাপতি এখানে বিরহিণী রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তি শোকে দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া উপমেয় অপেক্ষা উপমানের প্রাধান্যজনিত ব্যতিরেক অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শরদক শশধর মুখরুচি সৌঁপলক হরিণক লোচন লীলা।

কেশ পাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল........ ইত্যাদি—

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস একটি কৌশলের প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপকাত্মক পর্য্যায় অলঙ্কারের সাহায্যে 'মনমথ মকর ডরহিঁ ডর কাতর' ইত্যাদি পদটিতে কৌশলে মনোমীনের নানা অঙ্গে আশ্রয়ের উল্লেখচ্ছলে রূপবর্ণনার একটি কৌশল দেখাইয়াছেন। 'ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন। নিমগন কতহুঁ রমনিমনোমীন,'—এই রূপকাত্মক পদে কৌশলে কবি কতকগুলি উপমাকে গাঁথিয়াছেন অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনার জন্য। গোবিন্দদাস অনেক সময় বক্তব্যকে জোরালো ও রসালো করিবার জন্য Antithesis এর প্রয়োগ করিয়া Emphasis দিয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুসরণ হইলেও এই ধরণের রচনারীতি তাঁহার নিজস্ব। ভীতকচীত ভুজগ হেরি,· ....কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ ইত্যাদি পদ ইহার দৃষ্টান্ত।

১। যাহে বিনু নিমিখ আধ কত যুগ সম সোঅব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অবহুঁ নাহি নিকসয়ে পুন কিয়ে দরশন পাব।

২। আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘনঘন দৈছে করব পুন সুরতজলধি অবগাহ।

এগুলিও আলঙ্কারিক কৌশলের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কবি প্রত্যেক পংক্তিকে অলঙ্কৃত ও ভাবগর্ভ করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনা রসঘন হইয়াছে, অবান্তর কথা একেবারে নাই, তরল সুলভ বাক্যের পদে স্থান হয় নাই—বক্তব্যের ব্যাখ্যান বা বিশদ বিবৃতি পদের মধ্যে নাই—চরণগুলিতে ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন আছে—বাগ্‌বিন্যাসে আতিশয্য নাই—দীনতাও নাই। ইহাতে স্থলে স্থলে প্রসাদগুণের অভাব

হয়ত হইয়াছে—কিন্তু রচনা হইয়াছে গাঢ়বন্ধ,—শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের ঘন-গুম্ফিত শ্লোকের ন্যায়।

কবি চাতুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়ও ঘটাইয়াছেন। এই শ্রেণীর পরিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার সহিত মাধুর্য্য-সৃষ্টি এক সংস্কৃত কবিদের মধ্যেই দেখা যায়। এখানে কয়টি পদের উল্লেখ করি।

১। কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরলু তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি, মঝু পরিখণ কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝূর।
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর তাহে কি জলদজাল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার সহচরি পাওল বোধ।

২। কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মন্দির চৌরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনি জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচন মুগধি সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ।

৩। পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জলত হামারি।

কাহে মিনতি করু কান। তুহুঁ হাম একই পরাণ।
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ। হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ।
অতয়ে চলহ নিজ বাস। কহতহিঁ গোবিন্দদাস।

যে সকল পদে কবি চাতুর্য্য সৃষ্টির কথা ভুলিয়া কেবল মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার দুই একটির উদাহরণ দিই—

১। দারুণ দৈব কয়ল দুঁহু লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে দুহু দিঠি পূরল কৈসে হেরব মুখ চাই।
তাহে গুরু দুরুজন লোচন-কণ্টক সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত ধৈরজ লাজ বিচার।

২। মাধব কি কহব দৈববিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে যদি হয় মুখ লাখে লাখ।
মন্দির তেজি যব পদচারি আওলু নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ।
একে কুলকামিনি তাহে কুহু যামিনি ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর হাম যাওব কোন পুর।
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ চির দুখ অব দুর গেল।
তোহারি মুরলি রব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়লুঁ গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ কহত হি গোবিন্দদাস।

এইগুলি ছাড়া—(১) মোহে উপেখি রাই কৈসে জীয়ব সে দুখ করি অনুমান। রসবতি হৃদয় বিরহ জরে জারব ইথে লাগি বিদরে পরাণ ইত্যাদি (২) নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন, নয়ন রসায়ন ইত্যাদি পদ অবিমিশ্র মাধুর্য্যের দৃষ্টান্ত।

অনেক স্থলে অলঙ্কৃতিতে কেবল চাতুর্য্য নয়—নিবিড় মাধুর্য্যও আছে। এগুলি বর্ত্তমান যুগের বিচারেও রসগর্ভ। এগুলি মামুলী ধরণের নয়।

১। চন্দন কেশর মাখা তনু। রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জনু।
২। ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি পিবইতে জিউ করে সাধ।
৩। বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে মোছত উতপত বারি।
৪। অধর সুধা ঝর মুরলি তরঙ্গিনি বিগলিত রঙ্গিনি হৃদয় দুকূল।
৫। ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ
৬। রূপকে কূপে মগন ভেল কাম। ৭। মুরলি নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।

গোবিন্দদাস প্রধানতঃ চাতুর্য্যের কবি। এই চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া তিনি অনেক সময় কৃচ্ছ্র কল্পিত অলঙ্কারের জটিলতারও সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক সময় শ্লিষ্টরূপক ক্লিষ্টরূপকে (Strained metaphor) পরিণত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

১। ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন। নিমগন কতহুঁ রমনিমনমীন।
২। কাজর ভমর তিমির জনু তনুরুচি নিবসই কুঞ্জ কুটীর।
বাঁশি নিশাসে মধুর বিষ উগরই গতি অতি কুটিল সুধীর।
৩। যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু কৃশ কটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ।
৪। বেণুক ফুকে ফুকে মদনানল কুল ইন্ধন মাহাজারি।
পরশ পাণি তুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রমজল জোরণ বারি।
৫। আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দুর দহনা।
চান্দন চাঁদ মাহা মৃগমদ লাগল তাহে বেকত তিন নয়না।
৬। সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরি জিনি মাহা খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে শৈলসুতাকার চীন।

৭। মনমথ মকর ডরহি ভর কাতর মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
৮ তুয়া হিয়ে হার তটিনি তট কুচ উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।

গোবিন্দদাসের ভণিতাতেও বেশ চাতুর্য্য আছে।

১। মুনিক পুতলি তনু মহিতলে শুতলি দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস বহ না রহ পরিখত গোবিন্দদাসে।

২। তনু মন জোরি গোরি তোহে সোঁপল কনয়া জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভনে কনয়া বিহনে মণি কবহু হৃদয়ে নাহি সাজ।

৩। চরণে বেড়ি চারু অরুণ সরোরুহ মধুকর গোবিন্দদাস।

৪। বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব এক বর চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি পরশ হি সো পুন হোত সন্দেহ।

৫। গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ।

৬। কি করব চন্দ চন্দন ঘন লেপন কিসলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পথে ঔখদ গোবিন্দদাস নাহি মান।
[এখানে কবিরাজ কথাটী থাকিলে আরও ভাল হইত]

৭। অব রূপ লালস কিয়ে দরশায়সি নীলজ দেহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ হেম ধরউ নিজ বাণ।

৮। করইতে কোরে পরশ সঞে জানল কানুক কপট বিলাস।
নানা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত হেরত গোবিন্দদাস।

৯। গোবিন্দদাস দেখব সাঁচ। কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ।

১০। যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদরস আশে।
সো অব নয়ননীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দদাসে।

১১। যো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দি বিষহ্রদনীরে
পামরি গোবিন্দদাস মরি যায়ব সাজি আনল তছু তীরে।

১২। ইথে বিনু নাগদমন রস পান। গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র না জান।

এইগুলি হইতে লক্ষ্য করিতে হইবে—পদের মূল মাধুর্য্য ও ভাবের কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা না ঘটাইয়া গোবিন্দদাস কত কৌশলে ভণিতাগুলি দিয়াছেন। মূল ভাবের সহিত কবির ভণিতার কি করিয়া সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে? কবি যদি বর্ণিত লীলার কোন অংশ গ্রহণ না করেন—তবে সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে? কবি সকল সময়ই শ্রীমতীর সখীস্থানীয়। কেবল তিনি লীলার বর্ণনা করিতেছেন না—তিনি লীলা-সঙ্গিনী,—নিজের চোখে লীলা-রস উপভোগ করিতেছেন, তিনি শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী—সাথের সাথী—সুখে সুখী। কবি লীলার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া ও মিলাইয়া দিতেছেন। এই সখ্যভাবটি গোবিন্দদাসের পদের ভণিতা-প্রসঙ্গে যেরূপ চমৎকার ফুটিয়াছে—এমনটি আর কোন কবির পদে নয়।

গোবিন্দদাসের পদগুলির মূল অঙ্গে কোথাও লোকোত্তর ব্যঞ্জনা নাই। এই ভণিতার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্যের গুণেই পদগুলি আর সাধারণ লৌকিক গণ্ডীতে পরিচ্ছিন্ন থাকিতে পায় নাই—একটা এমনই লোকোত্তর-বিচ্ছিত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ভাগবতী-লীলায় পহুঁছিতেছে। এই সখীত্বের আকূতি, আর্ত্তি ও রসানুভূতি প্রেম সাধনার সেই আনন্দ-লোকেরই ইঙ্গিত করিতেছে—সখ্যরস যাহার একটি বিশিষ্ট সোপান। ইহার বেশি পরমার্থতার অন্য ইঙ্গিত বৃন্দাবন-লীলার পদে দিবার উপায়ও নাই। দিলে তাহাতে রসাভাস হয়। গোবিন্দদাসের মত সে কথা অতি অল্প কবিই বুঝিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসের কথা আর কি বলিব? গোবিন্দদাসের রচনা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইয়েতেই ঋদ্ধ। গোবিন্দদাস পদের প্রত্যেক শব্দের আদিতে এক বর্ণ বা সমধ্বন্যাত্মক বর্ণ বসাইয়াই কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। পদের প্রত্যেক চরণের আদিতেও একই বর্ণ বসাইয়াছেন। যেমন—

১। শিশিরক শীতসমাপলি সুন্দরি শোহন সুরত সন্দেশে।

২। মদন মোহন মূরতি মাধব মধুর মধুপুর তোই।

৩। পরখি পেখলু পুরুষ-উত্তম পুরুষ পাহুন জাতি।

৪। কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি কুসুমিত কানন জোই।

৫। যামিনি জাগি জাগি জগ জীবন জপতহি যদুপতি নাম।

৬। তাপনি তীর তীর তরু তরুতল তরল তরলতরু ছায়।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরঙ্গিত তরুণি তোহারি পথ চায়।

এইগুলিকে অনুপ্রাস না বলিয়া 'অনুপ্রয়াসই' বলিব। এগুলি জগদানন্দের উপযুক্ত, গোবিন্দদাসের নয়। *

গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদে অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত, অনেকস্থলে দুই একটি জোরালো অনুপ্রাসের প্রয়োগে রচনা ললিত-মধুর। আবার ছন্দোহিল্লোলের সহিত সুবিবেচিত অনুপ্রাস প্রয়োগ অনেকস্থলে আবৃত্তিকেই সঙ্গীত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

১। মেঘ যামিনি.চল বিলাসিনি পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম শায়ক ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে।
গুরুয়া কুচভরে চলিতে পদ টলে পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনি ফটিক তরু জানি চমকি ধরু নীর ধার রে।

২। কঞ্জ চরণ যুগ যাবক রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জির বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিনি রণরণি কুঞ্জর গমন দমন খিন মাঝে।
কনক কটোর চোর কুচ কোরক জোরে উজোরল মোতিক দাম।
ভুজযুগ থীর বিজুরি পরি মণিময় কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম।

৩। নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি মোহিনিবেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চীত ভীত নাহি মানত কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই।

* পক্ষান্তরে পদুমিনি পুন পরবোধঙ মোয়। পীতাম্বর-পদ-পঙ্কজ পরিহরি পামরি পাঁতরে রোয়—এইরূপ পংক্তি রচনায় কবির কোন প্রয়াস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

নয়নে নয়নে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দদাস চিতে অব নাহি সমুঝল বাজত কিঙ্কিনি কোন তরঙ্গ।
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনি মনহি মুরতিময় মনসিজ জগজন নয়ন আনন্দ।
তনু তনু অনুলেপন ঘন চন্দন মৃগমদ-কুঙ্কুম-পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল বি-টঙ্ক।
অতি সুকুমার চরণতল শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ॥

গোবিন্দদাসের বারমাসিয়া পদটি হিল্লোলিত অনুপ্রাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পদে দীর্ঘস্বর গুলিই অনুপ্রাসের কাজ করিয়াছে। পদটি অন্যত্র তুলিয়া দেওয়া হইল। অনেকসময় কবি যমক-মূলক অনুপ্রাসের প্রয়োগে পদ-লালিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর। কামিনি কি তেজই কান্তক কোর।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত—

(ক) পাঁতর সে ভেল আঁতর বারি। (খ) নিজ কূল দূষণ ভূষণ করি মানলু তেঞি ভেল ঐছন শাতি। (গ) মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ অরবিন্দ। ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ। (ঘ) মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা। (ঙ) নয়ন পঙ্কজ জোরে ঝর ঝর লোরে মহি করু পঙ্ক। (চ) করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর কুচযুগে কাজর হারা। (ছ) চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত গোপনে বহে অনুরাগ। তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি সোহাগ। (জ) দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বৈমুখী ভৈ গেল।

গোবিন্দদাসের পদের চরণে চরণে এবং পর্ব্বে পর্ব্বে মিলগুলি অনবদ্য। দোহা, চর্চ্চরী, বৃত্তনরেন্দ্র, ভরহট্টা ইত্যাদি ছন্দে পর্ব্বে পর্ব্বে মিল দেওয়ার

প্রথা বলবতী ছিল না, গোবিন্দদাস এ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন অধিকাংশ স্থলে। গোবিন্দদাসের মিল শুধু অনবদ্য নয়, কলা কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

১। ধরনি শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি সহচরি রহত অগোরি।

২। কি রসে রিঝায়ব কৈসে নিঝায়ব বিষম কুসুম শরজালা।

৩। অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল কমল দলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।

৪। ভ্রমর করম্বিত জানু বিলম্বিত কেলি কদম্বক মাল।

৫। গীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম কত কুলবতি মতি মাতি।

গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে অনুপ্রাস-যমকাদি শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কারেরও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে এবং রচনার পংক্তিবিন্যাসের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহা যুগপৎ পদের বহিরঙ্গে মাধুর্য্য ও অন্তরঙ্গে চাতুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত—

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাব।
কতএ আরাধব মাধব তোহে বিনু বাধাময়ি ভেল রাধা।
কঙ্কণ ঝঙ্কন কিঙ্কিনী শঙ্কিনী কুণ্ডল কুণ্ডলি ভান।
যাবক পাবক কাজর জাগর মৃগমদ মদকরি মান।
মনমথ মনমথে চড়ল মনোরথে বিষম কুসুমশর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতি খনে না জানিয়ে কিয়ে গোরি।

একই শব্দের কলাসঙ্গত পুনরাবৃত্তির দ্বারা গোবিন্দদাস অনেক স্থলে পদলালিত্য ও রসমাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন পরশ রসায়ন সঙ্গ।

ছন্দোহিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘহ্রস্ব উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য স্বভাবতই ব্রজবুলির পদে ছন্দোহিল্লোলের

সৃষ্টি হয়। গোবিন্দদাস এই হিল্লোলকে নিয়মিত এবং অধিকতর নর্ত্তনপর করিবার জন্য কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। এসকল পদের অন্য ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও হিল্লোলিত প্রবাহের জন্য উপাদেয়।

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনি কন্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দির সন্ত ॥
গণ্ড মণ্ডল লোল কুণ্ডল উড়ে চূড়ে শি-খণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত বাহু দণ্ডিত দণ্ড ॥
কঞ্জলোচন কলুষ মোচন শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিসলয় নিলয় গোবিন্দদাস ॥

সাধারণ পজ্ঝটিকাও তাঁহার রচনায় হিল্লোলিত হইয়াছে।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তঁহি অতি দুরতর বাদর দোল। বারি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরি কৈছে ক-রবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনি পার।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির প্রধান শিষ্য। তিনি গুরুর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি পদ-যুগল সরোরুহ নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে।
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমনি নাগর নাগরী—লীলা স্ফুরব কি মোয়।
জনু বাঙন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চঢ়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোঁজব মিলব কল্পতরু নিকরে।
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধহি ভকত নখর মনি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশদিশ হাম কি না পায়ব বিন্দু।

সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব তৈখনে উদিত নয়ান।

গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল ভকত কৃপা বলবান।

গোবিন্দদাস স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণবোচিত বিনয় বশতঃ একথা লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দদাস গুরুর অনুপযুক্ত শিষ্য নহেন, বরং স্থলে স্থলে ভাবের গূঢ়তায় ও অলঙ্করণের চাতুর্য্যে গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির কোন কোন পদের কতকটা এদেশে প্রচলিত ছিল—গোবিন্দ সেগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি পদের উল্লেখ কবিতেছি।

(১) প্রেমকঅঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।

(২) মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি। শূতি রহল হরি কছু না আলাপি।

(৩) বেনল সঞে যব বসন উতারলুঁ লাজে লাজায়লি গোরি।

(৪) পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া। অবহুঁ না আওল কুলিশ হিয়া।

বিদ্যাপতির বারমাস্যা পদের দুইমাসের বর্ণনা গোবিন্দদাসের রচিত। বিদ্যাপতির ভাব ও ভঙ্গী লইয়াও তিনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

১। আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দূর দহনা—এই পদটি বিদ্যাপতির 'কতহু মদন তনু দহসি হামারি'—পদের অনুস্মৃতি।

২। অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ, কঙ্কণ গীমক হার। যোথন মান তো বিহু যুগ লাথ। অন্তরে উথলল মনোভব-সিন্ধু। বৃন্দাবন বন ভেল।—ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভাষারই রূপান্তর।

৩। যাহাঁ যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি—ইত্যাদি পদ বিদ্যাপতির 'যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই' পদেরই প্রতিধ্বনি।

৪। ভজহু রে মন নন্দ নন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে—পদটি বিদ্যাপতির প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি।

৫। 'গোবিন্দদাসের এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাউ' পদটি বিদ্যাপতির 'আঁচরে বদন ঝাপায়হ গোরি' পদটির প্রতিধ্বনি।

৬। কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে তা পর ধরি হাম পাণি ইত্যাদি পদের শপথের ছল গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি হইতে পাইয়াছেন।

৭। মাথহি তপন তপত ভেল বালুক আতপ দহন বিথার ইত্যাদি দ্বিপ্রহরীয় অভিসারের পদ বিদ্যাপতির তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল ইত্যাদি পদের রূপান্তর মাত্র।

৮। "দুরজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি কোপহি রোখলি মোয়" মানের এই পদটি বিদ্যাপতির অনুরূপ পদের প্রতিধ্বনি।

৯। বিদ্যাপতির—রিতুপতি রাতি রসিকবররাজ। রসময় রাস রভসময় মাঝ ইত্যাদি একই অক্ষরের অনুপ্রাসে পদরচনা পদ্ধতি গোবিন্দদাস অনুকরণ করেন।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন কোন শ্লোককেও সুললিত পদে পরিণত করিয়াছেন। দুই এক স্থলে অনুবাদ, অধিকাংশ স্থলে মর্ম্মানুবাদ।

১। যাহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত—পদটি উজ্জ্বল নীলমণির পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটাঃ ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

২। ঋতুপতি রচিত বিরহজ্বরে জাগরি দোতি উপেখলি রাধা—এই পদটি উজ্জ্বল নীলমণির—দূত্যোনাদ্য সুহৃজ্জনস্য······প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি······তনুম্—ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

৩। মধু মুখ বিমল কমল বর পরিমলে জানলুঁ তুহুঁ অতিভোর—এই পদটি উদ্ধবসন্দেশের মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

৪। 'সজনি কি কহব রাইক সোহাগি' পদটি উজ্জ্বল নীলমণির একটি শ্লোকের তাৎপর্য্যানুবাদ। কবি তাহাতে একটি 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কারের নিজস্ব চারিচরণ যোগ দিয়া কাব্যাংশে উন্নত করিয়াছেন।

৫। সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। কুলবতী ভিন পুরুখে ভেল আরতি জীবন কিয়ে সুখ লাগি—এই পদটি রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণস্য নামাক্ষরং ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

৬। দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপি ইত্যাদি পদটি কাব্যপ্রকাশের ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয় সঙ্গমেঽপি ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

৭। কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি এ নহ কুঙ্কুমরেহ—পদটি উজ্জ্বল নীলমণির একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ।

৮। গোবিন্দদাসের রাসলীলার দুইটি পদ ভাগবতের ভাবে অনুপ্রাণিত।

গোবিন্দদাস রাধার রূপের লাবণ্য-দ্যুতিটুকু রাখিয়া স্থূলাংশ ও দেহাশ্রয় হরণ করিয়া লইয়াছেন। এই নিরবলম্ব সৌন্দর্য্যের ভাবপ্রতিমার সহিত কোন শরীরীর প্রণয় সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্য্য স্তম্ভিত করে—দিশেহারা করে,—প্রেমমুগ্ধ করে না। এ সৌন্দর্য্য মানব চক্ষুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলে—বিশ্বপ্রকৃতি এই সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনী মাত্র নয়—পরিবেষ মণ্ডলে পরিণত হয়।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই। তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই।
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল।
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই।
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ।
—এই রাধাকে চিনিয়াও চেনা যায় না।

এই সৌন্দর্য্য কোন রক্তমাংসের দেহে সম্ভব নয়। এই সৌন্দর্য্যই ছিল কবির মানসলোকে। গোবিন্দদাস তাঁহার মানসলোকের নিখিল সৌন্দর্য্য রাধাকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস রাধা-প্রেমের স্বরূপ বড় কৌশলেই প্রকাশ করিয়াছেন। রাধা বলিতেছেন—"পিশুনগণের জন্য দক্ষিণ নয়নে দেখিতে পাই না,—পরিজনগণের জন্য বাম নয়নের অর্দ্ধেক দৃষ্টিও দিতে পারি না। তবু

আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে যব হরি পেখলুঁ কান,
কতশত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ।
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম—
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম।
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরিসম লাগি,
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি।
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জীবনে মঝু সাধ,
গোবিন্দদাস ভনে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রস মরিযাদ।

এই পদটির দ্বারা গোবিন্দদাস অন্য গোপীগণ হইতে—শ্রীকৃষ্ণের অন্য বল্লভাগণ হইতে—এমন কি জগতের সকল প্রণয়িনীর গণ্ডী হইতে শ্রীরাধাকে অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। এমন কোন প্রেমিকা আছে যে—প্রিয়জনের 'পরশরসে' ভাসে না? রাধার হৃদয়ে জ্বলে আগুন। অন্যে দেখে ঘনশ্যাম—রাধা দেখে বিদ্যুন্ময়। কবিরাজ গোস্বামীর কৃষ্ণ-প্রেমের স্বরূপের কথা মনে পড়ে। প্রিয়ের জন্য প্রিয়ার প্রাণ দেওয়াটাই জগতের সাহিত্যে চরম কথা। শ্রীরাধা প্রাণোৎসর্গের চির বিচ্ছেদ বরণ করিতে চান না।

সেই এক শ্রীকৃষ্ণ বংশীতানে সকল গোপীদেরই চঞ্চল করিতেছেন—রাধার অন্তরে এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কেন? ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণে নয়—রাধারই ব্যক্তিগত চরিত্রে। কবি এই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

গৌরচন্দ্রিকার পদে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক, তাঁহারা স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের লীলা, তাঁহার ভাববিহ্বলতা, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গের লীলা

বিলাসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রেমভক্তির গভীরতা, সরলতা, ভাবাকুলতা ও মাধুর্য্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কবিতার পদবীতে উঠে নাই। রস-সাহিত্যের দিক হইতে সেগুলির অধিকাংশেরই কোন মূল্য নাই। সেগুলির তুলনায় লোচনদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী সাহিত্যের দিক হইতে উৎকৃষ্টতর। ইঁহাদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসের পদগুলি রূপে, রসে, ছন্দে, ঝঙ্কারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গোবিন্দদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমূর্ত্তিকে যে বাণীরূপ দিয়াছেন—তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট রূপের চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপসৃষ্টি কেবল কল্পনার সবলতার জন্যই সম্ভব হয় নাই। তাহার সহিত অবশ্য অগাধ ভক্তিরও যোগ আছে। তাহাতেই যথেষ্ট হয় নাই। তাঁহার মত অপূর্ব্ব নির্ম্মল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী আর কাহারও ছিল না। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী শিবজটা হইতে বিমুক্ত সুরধুনীধারার ন্যায় শুচি, স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও কলতরঙ্গময়। 'জটা হইতে মুক্ত' বলিলাম অলঙ্কারের জটিলতা এইগুলিতে নাই বলিয়া।

যে অলঙ্কারের সাহায্যে মহাপুরুষের ঐশ্বর্য্য বাণীরূপ ধরে, সেই উদার সরল উদাত্ত অলঙ্কারই এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রেমের ঐশ্বর্য্য কবি একদিকে যেমন অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন—নিজের বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও আকিঞ্চন তেমনি গভীর আন্তরিকতার সহিত প্রকট করিয়াছেন—

ভাব-গজেন্দ্রে চড়ায়ল অকিঞ্চনে ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে তনু দগধল একলি গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাস পরম ভক্ত কবি ছিলেন—তাঁহার প্রার্থনা-সঙ্গীত ও গৌর চন্দ্রিকায় তাঁহার ভক্তির গভীরতা পরিস্ফুট। কিন্তু তিনি ব্রজ পদাবলীর

প্রেম-মাধুর্য্যের মধ্যে কোথাও ভক্তির ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ ঘটান নাই। তাঁহার মাথুর-বিরহের যে কবিতাগুলি প্রসিদ্ধ—সেগুলির মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনা নাই। সেগুলি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও নয়। বিদ্যাপতি অলঙ্কার-প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন,—কিন্তু মাথুর বিরহের পদাবলীতে তিনি অলঙ্করণের লোভ অনেকটা সংবরণ করিয়াছিলেন—গোবিন্দদাস তাহা করেন নাই। গোবিন্দদাস মাথুর বিরহের সুরকে দেশকালের সীমা উত্তরণ করিতে পারেন নাই। তবে গোবিন্দদাসের পদেও অনেকস্থলে আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। যাঁহারা ভক্তবৈষ্ণব তাঁহাদের কাছে সমস্তটাই আধ্যাত্মিক, তাঁহাদের পক্ষ হইতে বলিতেছি না।

সজনি, কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশমণি পরশক বাধন অভরণ সৌতিনি মান।

ইহার একটা আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ভাবই রসমঞ্জরীতেও আছে—সেখানে কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ সন্ধান করে না। গোবিন্দদাসের পদের আধ্যাত্মিক গৌরব অন্তর্নিহিত নয়—তিনি যে সমাজে লালিত পালিত হইয়া, যে সমাজের "রস-তরখিত" মুখের পানে চাহিয়া এই পদগুলি লিখিয়াছেন—সে সমাজের দ্বারাই আরোপিত (attributed)।

আধ্যাত্মিক গৌরবের কথা বাদ দিলেও গোবিন্দদাসের মত কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন ভারতবর্ষেও দুর্লভ।

গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রকৃতির সহিত মুখ্যভাবে না হউক, গৌণভাবে মানব-হৃদয়ের সংযোগ দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত হইয়াছে, বিরহে সহমর্ম্মিতা করিয়াছে। অভিসারের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রাধার প্রেমের দুর্নিবারতাই বাড়াইয়াছে—অভিসার-পথে আবার সহায়তাও করিয়াছে। প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় যে নব নব উপমান যোগাইয়াছে—তাহা অবশ্য সকল বৈষ্ণব কবির সম্পর্কেই খাটে। মাসে মাসে

প্রকৃতির প্রভাবে বেদনার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, কবি তাহা বুঝিতেন। তাঁহার বারমাস্যার কবিতাটি প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের গভীর সংযোগের নিদর্শন।

আঘন মাস রাস রস সায়র নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল॥
আওল পৌষ তুষার সমীরণ হিমকর হিম অনিবার।
নাগরীকোরে ভোরি রহু নাগর করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কণ্ডন পাতিয়ায়ব আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল কাহু বিহু সঘন হুতাশ॥
ফাগুনে গুনিগুনি গুণমণি গুণগণ ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহ-পয়োধি অবধি না পাইয়ে দুরতর মদন-তরঙ্গ॥
আওল চৈত চীত কত বারব ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই কাহু রহল কোন দেশ॥
মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিন পবন নহি ভায়ত ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জেঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিনি চন্দন চান্দনি রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত দারুণ মনমথ শাতি॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মূরতি নয়নে যব লাগয়ে নিঝরে ঝরয়ে দিনরাতি॥
শাওনে যখন গগনে ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরে কালিনি জীবন কণ্ঠ হিলোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ॥
আশিনমাসে বিকাশিত পদুমিনি মানস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরিঝুরি না রহ পরাণ॥

কাত্তিকমাস নিরাশ কয়ল বিধি লীলাময় রসরাস।
নিকরুণ কাণ কোন পাতিয়ায়ব কহতহি গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাস বিত্থাপতির প্রবর্ত্তিত ছন্দই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দ-দাসের ছন্দোবন্ধন একেবারে নিষ্কলঙ্ক। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিই—

পজ্ঝাটিকা—প্রকৃত পজ্ঝাটিকা ৪+৪+৪+৪ মাত্রায় গঠিত। যেমন—

সুরপতি। ধনু কি শি-। খণ্ডক চূড়ে।
মালতি। ঝুরি কি ব-। লাকিনি উড়ে॥

গোবিন্দদাসের পজ্ঝাটিকার চরণ সাধারণতঃ ৪+৪+৪+৩ যেমন—

(১) চলু গজ । গামিনি । হরি অভি । সার।
গমন নি-। রঙ্কুশ। আরতি বি-। থার॥

(২) চৌদিশে অথির প-। বন দেই। দোল।
জগভরি। শীকর! নিকর হি-। লোল॥

৪+৪+২ বা ৩—মাত্রার চরণেও লঘুপজ্ঝটিকার ছন্দ বাঁধা হইয়াছে,—

৪+৪+২—দূর কর বিরহিনী। দুখ॥ নিয়ড়ে হেরবি পিয়া। মুখ॥

৪+৪+৩—ও নব জলধর। অঙ্গ॥ ইহ থির বিজুরী ত-। রঙ্গ।
অতমিত যামিনি। কান্ত। বিফল ভেল মণি। মন্ত॥

পজ্ঝাটিকার এক চরণে ১২ মাত্রা, অন্য চরণে ১৬ মাত্রাও দেখা যায়।

৪+৪+৪—বিপুল পু-। লক অব। লম্বে।
৪+৪+৪+৪—বিকসিত। ভেল তহি। ভাব ক-। দম্বে॥

বৃত্তনরেন্দ্র—৭+৯+৮+৪—

যো তুহু হৃদয়ে। প্রেমতরু রোপলি। শ্যাম জলদ রস। আশে
সো অব নয়ন। নীর দেই সীঞ্চল। কহতহি গোবিন্দ। দাসে।

ভগ্নহট্টা—৮+৮+৮+৩ বা ৪—(ইহাতে বৃত্তনরেন্দ্রের মিশ্রণ আছে)

(১) যো পদতল থল। কমল সুকোমল। ধরনি পরশে উপ। চঙ্ক।

অব কণ্ট কময়। সঙ্কট বাটহি। আয়ত যায়ত নিঃ। শঙ্ক॥

✓(২) নীরদ নয়ানে। নব ঘন সিঞ্চনে। পুলক মুকুল অব। লম্ব।

(৭+৯) স্বেদমকরন্দ। বিন্দু বিন্দু চুয়ত। বিকসিত ভাব-ক-। দম্ব।

(৩) জনু বাঙন করে। ধরব সুধাকর। পঙ্গু চঢ়ব কিয়ে। শিখরে।

অন্ধ ধাবই কিয়ে। দশ দিশ খোঁজব। মিলব কলপতরু। নিকরে॥

গোবিন্দদাসের এই ছন্দের শেষ পর্বে ৩ মাত্রারই সংখ্যা বেশি। শেষের ৩ বা ৪ মাত্রার স্থলে ৫, ৬, ৭, ৮ মাত্রাও হইতে পারে। যেমন—

৮+৮+৮+৫—

চরণ কমল তলে। অরুণ বিরাজিত। মঞ্জীর রঞ্জিত। মধুর ধনি।

৮+৮+৮+৬—

কুঞ্চিত কেশিনি। নিরুপম বেশিনি। রস আবেশিনি। ভঙ্গিনি রে।

অধর সুরঙ্গিনি। অঙ্গতরঙ্গিনি। সঙ্গিনি নব নব। রঙ্গিনি রে।

৮+৮+৮+৭—গদগদ ভাষ ম-। ধুর বচনামৃত। লহু লহু হাস বি-। কাশিত গণ্ড।

পাষণ্ড খণ্ডন। শ্রীভুজ মণ্ডন। কনক খচিত অব-। লম্বন দণ্ড॥

৮+৮+৮+৮—গতি অতি মন্থর। নব যৌবন ভর।

নীল বসন মণি। কিঙ্কিণি বোলে॥

গজ অরি মাঝরি। উপরে কনয়া গিরি।

বীচহি সুরধুনি। মুকুতা হিলোলে॥

চর্চরী—(৩+৪)+(৩+৪)+(৩+৪)+৩—

নন্দ নন্দন। চন্দ চন্দন। গন্ধ নিন্দিত। অঙ্গ।

জলদ সুন্দর। কম্বু কন্ধর। নিন্দি সিন্ধুর। ভঙ্গ।

(৩+৪)+(৩+৪)+(৩+৪)+৫

জয়তি জয় বৃষ-। ভানুনন্দিনি। শ্যাম-মোহিনি। রাধিকে।

কনয় শত বাণ। কান্তি কলেবর। কিরণ জিত কম-। লাধিকে॥

প্রাকৃত ছয় মাত্রার ছন্দের স্তবকবদ্ধ দৃষ্টান্ত গোবিন্দদাসে একাধিক আছে। জগদানন্দ, বলরাম ও ঘনশ্যাম ইহার সার্থক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ছয় মাত্রার পর্বের স্তবক—

(১) ৬+৬, ৬+৬—চীত চোর। গৌর অঙ্গ। রঙ্গে ফিরত। ভকত সঙ্গ

৬+৬ (৫)—মদন মোহন। ছন্দুয়া।

৬+৬, ৬+৬—হেম বরণ। হরণ দেহ। পুরল তরুণ। করুণ মেহ।

৬+৪ (৫)—তপত জগত। বন্ধুয়া॥

(২) ৬+৬, ৬+৬—শরদ চন্দ। পবন মন্দ। বিপিনে ভরল। কুসুম গন্ধ।

৬+৬, ৬+৪—ফুল্ল মল্লী। মালতী যূথী। মত্ত মধুপ। ভোরনি।

৬+৬, ৬+৬—হেরত রাতি। ঐছন ভাতি। শ্যাম মোহন। মদনে মাতি

৬+৬, ৬+৪—মুরলি গান। পঞ্চম তান। কুলবতি চিত। চোরনি।

গোবিন্দদাসের সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দে রচিত বাংলা পদও আছে। ইহাতে দীর্ঘ হ্রস্বের উচ্চারণ পার্থক্য ধরা হয় নাই—

৮+৮+(৮+২)

এইত মাধবীতলে। আমার লাগিয়া পিয়া। যোগী যেন সদাই ধ্যে। য়ায়।

পিয়া বিনা হিয়া কেনে। ফুটিয়া না পড়ে গো। নিলাজ পরাণ নাহি। যায়॥

প্রচলিত লঘু ত্রিপদী ছন্দে গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ও বাংলাতে পদ লিখিয়াছেন।

৬+৬+৬+২—প্রাণ সহচরি। চরণে সাধই। কাহ মানয়বি। তোহি।

আঁখি মুদি কহে। অবহুঁ মাধব। কানু না মিলল। মোহি।

কবি স্থলে স্থলে দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রাতেও ধরিয়াছেন। প্রাচীন ঢঙের লঘু ত্রিপদীর পদও আছে। ইহাতে প্রত্যেক অক্ষরে একমাত্রা ধরা হইত।

গলায় রঙ্গণ। কলিকার মালা। নারীমন বান্ধা। কান্দে।

বাহুর বলনি। অঙ্গের হেলনি। মন্থর চলন। ছান্দে॥

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও খাঁটী বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন রচনায় ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা দুই ভাষার মিশ্রণ আছে। যেমন—

কি কহব শতশত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার॥

সাধারণতঃ কবি যেখানে প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—যেখানে তিনি তাঁহার নিজস্ব মাতৃভাষারই আশ্রয় লইয়াছেন। যেখানে মামুলী ধরণের রূপাদি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদির ঐশ্বর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছেন অথবা মণ্ডনকলার (Decorative art) চাতুর্য্য দেখাইতে চাহিয়াছেন অথবা কোন কবি-প্রসিদ্ধির ধারা (Convention and tradition) অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন—সেখানে অবিমিশ্র ব্রজবুলির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন—

তাম্বূল অধরে মধুর বিম্বফল কীর দংশন কিবা দেল।
কুচ সিরিফল বি-হগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণরেখ ভেল।
এই শ্রেণীর রচনা বিদ্যাপতির ধারারই প্রতিধ্বনি।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় খুব বেশি। কবি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে ছন্দ, ভাষা-বিন্যাস, উপমা-ভঙ্গী, বর্ণনা-ভঙ্গীর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকস্থলে জ্ঞানদাসের ভাষাকে বিদ্যাপতিরই ভাষা বলিয়াই মনে হয়। খাঁটি বাংলাভাষায় রচিত পদাবলীতে চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশি। চণ্ডীদাসের গভীর আকুতি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে বার বার প্রতিফলিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভাব, ভাষা

প্রায় অভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ—

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলক পূরয়ে অঙ্গ আঁখে নামে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল। (চণ্ডীদাস)

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ (জ্ঞানদাস)

চণ্ডীদাসের প্রভাব জ্ঞানদাসের রচনায় এত বেশি যে জ্ঞানদাসের অনেক পদ চণ্ডীদাসের নামে এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদ জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের পল্লীজীবন-মাধুর্য্য ও গভীর বাঙ্গালীয়ানা জ্ঞানদাসে নাই। জ্ঞানদাসের রচনায় এমনই অনেক কিছুই নাই—কিন্তু যাহা আছে তাহা এক গোবিন্দদাস ছাড়া অন্য কোন চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকবির মধ্যেও দেখা যায় না।

কবির রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য আছে—বৈশিষ্ট্যও কিছু আছে। জ্ঞানদাস গৌরচন্দ্রিকায় গৌরাঙ্গের প্রেমাবেশে রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। তিনি কলিকালকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছেন—কারণ এই কালে শ্রীচৈতন্যের অবতার হইয়াছে।

কলা-চাতুর্য্য ছাড়া কেবল ভাবের ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যায় না—একথা জ্ঞানদাস বেশ বুঝিতেন। কেবল ভাষাছন্দের পারিপাট্যেই তিনি কৌশল দেখান নাই—বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে—গঠন-পারিপাট্যের মধ্যে—ঘটনা সংযোটনার মধ্যেও তিনি অনেক কৌশল দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ—রাধার কুমারীলীলার একটি চিত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরলা

বালিকা পূর্ব্বরাগ কাহাকে বলে জানে না। তাহার শিশুসারল্যের স্বচ্ছতায় কবি পরবর্ত্তী জীবনের চমৎকার আভাস দিয়াছেন। রাধার জননী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

প্রাণনন্দিনী রাধা বিনোদিনী কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম কে রচিল তোর ভালে।
কে বাঁধিল হেন বিনোদ লোটন নব মালিকার মালে।

রাধা উত্তর করিলেন—

মাগো গেন্থু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী লৈয়া গেল মোরে ঘরে।
গোপ রাজরাণী নন্দের গৃহিণী যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায় জুড়ায়ল মোর প্রাণ।
কি হেন আকুতে তার বামভিতে লৈয়া বসাল মোরে।
একদিঠে রহি তাহার আমার রূপ নিরীক্ষণ করে।
বিজুরি উজোর মোর দেহখানি সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঞি কি হেতু মাগিল বর।

এই চিত্রের দ্বারা কবি কি অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিলেন, তাহা রসিক জন বুঝিবেন। রাধার লাবণ্য বিজলির মত, শ্যামের লাবণ্য জলধরের মত। বিজলি ও জলধরে 'সুমেল' দেখিয়া যশোদা দিবাকরের পানে চাহিয়া কি যেন কি বর মাগিলেন। চমৎকার নয় কি এই রস-ব্যঞ্জনা?

তারপর মুরলী-শিক্ষার কথা। যে মুরলী কুলশীলমান লাজভয়ডর সব ভুলাইতে পারে—কুলবতীকে কুল হইতে টলায়—সে মুরলীর গূঢ় রহস্য রাধা সমাধান না করিয়া ছাড়িবে না, সে মুরলী শিখিতেই হইবে। রাধা আবদার ধরিয়া বলিল—

কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন তান।
কোন রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান।
কোন রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে,
কোন রন্ধ্রের গানে রাধার প্রেম লুটে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাধা হইয়া এই সাধা বাঁশীর রহস্য বুঝা যায় না, আমার ভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট না হইলে এ বাঁশী অসাধ্য সাধন করিবে না।

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর, ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্ব হিলানে থাক তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে।

ইথানে কৌশলে কবি অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন। বাৎসায়নের "তদ্রম্যে রতিঃ" এই সূত্রটিও এখানে মনে পড়ে। দয়িতের কাছে যাহা পরম প্রিয়, দয়িতার কাছে তাহাই হয় পরম প্রীতির ধন। এই বংশীর রন্ধ্র অনেক, এই বংশী কেবল রাধার চিত্ত হরণ করিতেছে না, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে উল্লসিত করিতেছে। যাহার ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রের ভিন্ন ভিন্ন কাজ, তাহার সার্থকতাও অনেক। কেহ যদি ইহাতে ব্যঞ্জনাময় গভীর সার্থকতার সন্ধান করেন, করুন। যদি তাহা মিলে অধিকতর আনন্দেরই কথা। বাচ্যার্থ হইতেই আমরা যে মাধুর্য্য পাইতেছি—তাহাই যথেষ্ট মনে করি।

আর একটি দৃষ্টান্ত নৌকাবিলাস। মথুরার হাটে ক্ষীরসর বেচিবার জন্য গোপবধূগণ চলিয়াছেন। ঘাটে একখানি নৌকা লইয়া শ্যামরায় অপেক্ষা করিতেছেন। নাবিকবেশী শ্যাম গোপবধূদের পারে লইয়া যাইতে চাহিলেন—গোপবধূগণ নাবিককে ক্ষীরসর উপহার দিয়া নৌকায় আরোহণ করিল। বেলা শেষ হইয়া আসে—নৌকা আর নদী পার হয় না। মাঝ যমুনায় নৌকা যখন গেল তখন ঝড় উঠিল। গোপবধূগণ ভয় পাইয়া নাবিককে তিরস্কার করিতে লাগিল। নাবিক উত্তর দিল—

আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল কাণ্ডার করেতে নাহি রয়।

এতদিন নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি যুবতীর যৌবন এত ভারী।
নিজঅঙ্গ বাস ছাড় যৌবন পাতল কর তবে ত বহিয়া যেতে পারি॥
খাওয়ায়ে ক্ষীরসরে কি গুণ করিলা মোরে আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই তোমরা হৈলে এ প্রাণের বৈরী।

কবির ওস্তাদি এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে।

এখানেও যদি কেহ আধ্যাত্মিক সার্থকতা সন্ধান করেন, তবে তিনিও বঞ্চিত হইবেন না। কেবল রস সৃষ্টির কৌশল মাত্র ধরিয়া লইলেও রসোপভোগে বাধা জন্মিবে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুসরণে জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণকে শুল্ক-গ্রহীতা দানীর ছদ্মে যমুনার ঘাটে আবির্ভূত করিয়াছেন। রাধা বড়াইএর সঙ্গে ক্ষীরসর বেচিতে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগলাইয়াছেন—রাধা বলিতেছেন—

ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহে বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়া ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন।
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটিবাহু।
কবি জ্ঞানদাস কয় মোর মনে হেন লয়
চাঁদে যেন গরাসয়ে রাহু।

রাধাকে বিব্রত করিয়া রঙ্গ দেখিবার জন্য কবির ইহাও এক রস-কৌশল।

গায়ন গাহিয়া চলেন—তিনি নিজেই জানেন না, কখন তাঁহার সঙ্গীত চরম উৎকর্ষের শিখরে উত্তীর্ণ হইবে। যে ধৈর্য্য ধরিয়া গোড়া হইতে শুনে সেই চরমোৎকর্ষের অপূর্ব্বতার আস্বাদ পায়। কবিও রচনা করিয়া চলেন—সহসা এক সময় তাঁহার রচনা পরম সত্যকে আবিষ্কার করিয়া চরম কথাটি রসঘন

ভাবণে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এই রসঘন ভাবণগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র রচনার অঙ্গীভূত হইয়া, বরং শিখরীভূত হইয়াই এইগুলি পরিপূর্ণ মূল্য-মর্য্যাদা লাভ করে। এইগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবি রসলোকে কতটা উর্দ্ধে উঠিতে পারেন। এইগুলির দ্বারাই অথবা এইগুলি যে সকল কবিতার হৃৎমর্ম্ম সেই সকল কবিতার দ্বারাই একজন কবির কৃতিত্বের বিচার হওয়া উচিত। রসিক-চিত্ত তরুলতার অঙ্গে জীবন্ত ফুটন্ত ফুল দেখিতেই ভালবাসে—ফুলকে বোঁটা হইতে ছিঁড়িয়া নিষ্ঠুর পূজারী দেবপূজা করিতে পারে—অরসিক বিলাসী দেহগেহের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারে,—হৃদয়হীন বৈজ্ঞানিক তাহার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিতে পারে, রসিকজন তাহাতে ক্ষুব্ধই হয়। সমালোচনার কাজ অনেকটা বৈজ্ঞানিকের কাজ, সেজন্য আমি রসিকজনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জ্ঞানদাসের রসকুঞ্জ হইতে কয়েকটি কুসুম চয়ন করিয়া দেখাইতে চাই। যে সকল পদে নিম্নলিখিত অংশগুলি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, রসিক বন্ধুগণের মনে যেন সেই পদগুলির রস আস্বাদে আগ্রহ জন্মে, ইহাই অভিপ্রায়। আমি কেবল সেই পদগুলির প্রকারান্তরে সন্ধান দিতেছে।

জ্ঞানদাস অতিরিক্ত আলঙ্কারিকতায় পক্ষপাতী ছিলেন না। একেবারে অলঙ্কৃতিকে বাদ দিয়া কোন প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা চলিতে পারে না। কবিতার রসঘন অংশগুলি ও গভীর সত্যকথাগুলি অলঙ্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ পাইতে চায়—সেজন্য অলঙ্কৃতিকে একেবারে বর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। জ্ঞানদাসও তাহার চরম কথাগুলি কোথাও তাই অলঙ্কৃত পংক্তিতে, কোথাও আবার সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত ও উপমারই সাহায্য লইয়াছেন।

১। মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীমতীর কি দশা হইল—নিম্নলিখিত চারি পংক্তিতে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে—

অরুণ অধর বাঁধলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈগেল ধূতুরা তুল।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার। অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়াকার॥

[বন্ধুজীবের মত অরুণ অধর ধূতুরার মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। অঙ্গের বসনও ভারস্বরূপ হইল—আঙ্গুলগুলি এমনই শীর্ণ হইয়া গেল যে অঙ্গুরী বলয়ের মত ঢলঢল করিতেছে।]

২। পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ। নীপনিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ॥

[সখী বলিতেছে—হে মাধব, পথে রাইএর সঙ্গে দেখা। তোমার প্রসঙ্গ তুলিলাম। তাহাতে তাহার অঙ্গ কণ্টকিত হইল—সে যেন কদম্বপুষ্প দিয়া অনঙ্গের পূজা করিল। তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ যে কত তাহা কি আর তাহার মুখ হইতে শুনিতে হইবে ?]

৩। কেনে তোর তনু হেন বিবরণ মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে মথিয়া থুঞাছে শিরীষ কুসুম মালা।

[ননদী শ্যামোপভুক্তা রাধার অঙ্গের বৈতথ্য দেখিয়া বলিতেছে—তোর তনুর এ দশা কেন হইল? চন্দ্রকলা যেন মলিন হইয়াছে। মত্ত করিবর যেন শিরীষ ফুলের মালা বিমথিত করিয়া রাখিয়াছে।]

৪। মরণ শরীরে পরাণ পাইল ঐছন সব ভেলি।
বন দাবানলে পুড়িয়া যেমন অমিয়া সাগরে কেলি॥

[বিরহপীড়িতা ব্রজবধূগণ কদম্বতলে শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইল। তাহারা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। দাবানলে দগ্ধ মরালীরা যেন অমৃত-সাগরে কেলি করিতে লাগিল।]

৫। ঘর হৈতে বারাইতে চাল না ঠেকিল মাথে
হাঁচি জ্যেঠী না পড়িল বাধা,
হরিণী পালাঞে যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।

[ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মাথায় চাল ঠেকিল না—হাঁচি টিকটিকি পড়িল না। কোন বিঘ্নের আশঙ্কা ত ছিল না। কিন্তু এ কি? ননদী বাঘিনীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় জন্য রাধা-হরিণী গৃহের বাহির হইল—কিন্তু পথে দানীর ছদ্মবেশে শ্যাম ব্যাধের হাতে পড়িল। (চণ্ডীদাসের অনুস্মৃতি]

৬। কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার ধন আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥

[বঁধু তোমাকে কি দিব?—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনই তোমাকে দিতে চাই—আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন তুমি। অতএব দান চলে না। তারপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন আমার জীবন। তাহারও ত তুমিই অধিকারী। নূতন করিয়া তাহা আর তোমাকে কি করিয়া দিব?]

আত্মসমর্পণের ভাষা ইহার চেয়ে অপূর্ব্ব আর কি আছে?

৭। এত দিনে অমিয়া সরোবরে আছিনু চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পবন হুতাশন হিমকরে বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥

[শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন,—শ্রীরাধার কি দশা? শ্রীরাধা বলিতেছেন—এতদিন অমৃত-সরোবরে ছিলাম—অঙ্কে ছিল চিন্তামণি। আজ চন্দনাক্ত পবন হইয়াছে হুতাশন, চন্দ্রের কলঙ্ক আজ হইয়াছে বিষধর—চন্দ্র বিষ বর্ষণ করিতেছে।]

(শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, শ্রীরাধার রূপবর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, গোষ্ঠবিহার, অনুরাগ, সম্ভোগ-মিলন, রাসলীলা, দানলীলা, অভিসার, মান, মানভঞ্জন, খণ্ডিতার আক্ষেপ, বিপ্রলব্ধার উচ্ছ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে জয়দেব হইতে যে ধারা চলিয়া আসিয়াছে কবি সেই ধারাই অবলম্বন করিয়াছেন।

রূপ-বর্ণনায় উলট কদলী, কনক মহেশ, কষিত কাঞ্চন, তিলফুল, সিরিফল,

বাঁধুলী ইত্যাদির বিধিমত সমাবেশ আছে—কিন্তু রূপ-বর্ণনার বাড়াবাড়ি নাই। পূর্ব্বরাগের আয়োজনেরও বাড়াবাড়ি নাই। 'স্বপ্নদর্শনের' দ্বারা কবি পূর্ব্বরাগের অধিকাংশই সমাপ্ত করিয়াছেন।) দুই একটি পংক্তিতে পূর্ব্বরাগের মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন। যেমন—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিলাইতে পথের নিকটে রয়।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা ইত্যাদি পদও ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।)

কানুর প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তির কথা কবি অতি অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ন কোণে চায়।

* * * *

যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়।

চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসও লীলা-বিভাবের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেরত সহচরি মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই। হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই ॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি। কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি ॥

এই চমৎকার রসচিত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যেও দুর্লভ।

রসোদগার পর্য্যায়ে অনুরাগের উল্লসিত উপচার বর্ণনায় চণ্ডীদাস, বলরামদাস, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস ইত্যাদি অনেকেই পদ রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি। নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা। মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা।

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দারিদ্র যেমন পাইয়া রতন থুইতে ঠাঞি না পায়।

নরোত্তম লিখিয়াছেন—

সমুখে রাখি মুখ আঁচরে মোছই অলকা তিলকা বনাই।
মদন রসভরে বদন হেরি হেরি অধরে অধর লাগাই।

ধরণীদাস লিখিয়াছেন—

ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে পুন দেই সিঁথায় সিন্দুর।
তাম্বুল সাজাঞে তোলে খাও খাও কত বোলে কত গুণ কহিব বন্ধুর।

বলরামদাস বলিয়াছেন—

বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগিয়া থাকে তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়।

এই সমস্তের তুলনায় জ্ঞানদাসের এই শ্রেণীর পদের রসের গাঢ়তা ও গূঢ়তা যেন বেশি। একমাত্র বলরামদাসই এ পর্য্যায়ের কবিতায় জ্ঞানদাসের নিকটবর্ত্তী।

১। হিয়ার উপর হইতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁয়ায়॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে।
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥

২। হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর সদাই ফিরয়ে রঙ্গে।

তিলে কত বেরি মুখখানি হেরয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয় নাম।

৩। হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে পথের নিকট রয়।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম।
আমার অঙ্গের বসন সৌরভ যখন যেদিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়।
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনই যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পীরিতে বাঁধিল তায়।

[কবি গোষ্ঠবিহারকে বর্জ্জন করেন নাই বটে, কিন্তু সখ্যভাবকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই। সুবল সাঙ্গাতকে অবশ্য মনের কথা বলিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে—কিন্তু তাহা মধুর ভাবেরই উন্মেষের জন্য। বাৎসল্য ভাবের কবিতাও এই কবির নাই। অনুরাগের গভীরতা দেখাইবার জন্য কবি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। অনুরাগ প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে কবির লেখনী হইতে যে সমস্ত চমৎকার পংক্তি বিগলিত হইয়াছে তাহাদের দ্বারা যতটা গভীরতা ফুটিয়াছে —রাধার দুর্দ্দশা-বর্ণনায় বা রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসের আতিশয্যের অভিব্যক্তিতে ততটা ফুটে নাই।] দৃষ্টান্ত—

১। তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞি সদা লয়ে নাম।
জাগিতে ঘুমাতে আন নাই চিতে রসের পশরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি আর কি জগতে আছে?

[কোরে থাকিতে কত দূর মানয়ে—চণ্ডীদাসের' দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া—ইত্যাদি মনে পড়ায়। প্রেমবৈচিত্ত্যের অপূর্ব্ব বাগ্‌চিত্রণ।

গভীর প্রেমের মধ্যে দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হইলে ক্রোড়স্থাকেও দূরবর্ত্তিনী মনে হয়।]

২। এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ যুগান্তরে কত কলপে না দেখে ॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
শঙ্খপদ্ম আদি কত মহানিধি পাই ॥

যাহা অসীম, অনন্ত তাহাই বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতা হারায় না। এ প্রেম অসীম ও অনন্ত মহাসিন্ধুর মত—তাই "দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।" তাই ত অনুরাগ "তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই 'জনম অবধি রূপ' দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না।

৩। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ *

জ্ঞানদাসের এই পদটি তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে একটি চমৎকার সনেটের প্রেরণা দান করিয়াছিল। সেই সনেটটি এই—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

* দীনেশবাবু বলিয়াছেন—কে যেন জোড় ভাঙ্গিয়া বেজোড় করিয়া দিয়াছে। গল্প কথিত গ্রীক দেবতার ন্যায় কে যেন অখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে—সেই দুই খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগিবার জন্য বিরহে হাহাকার করিতেছে। জীব যাহার অংশ তাহার বিরহে জীবের মন ব্যথাতুর·········দশ ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাই পরাণ পীরিতি তার থির নাহি বাঁধে।

হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে,
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে,
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে,
চিরদিন তীরে বসি করিলো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন,
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

এইখানে বলিয়া রাখি চণ্ডীদাসের হৃদয়াবেগের আতিশয্য ও গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিকতার আতিশয্য দুইই রবীন্দ্রকাব্যকে প্রভাবান্বিত করে নাই। জ্ঞানদাসের সংযত প্রেমাবেগের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে।

৪। ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পীরিতি॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে জাগিতে ঘুমিতে।
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁধি।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি।

[প্রেমে আত্মহারা হৃদয়ের চমৎকার অভিব্যক্তি]

৫। কুটিল নেহারি গারি যবে দেয়বি তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর।
[প্রিয়ার মধ্যে মাধুরী ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহার গালিও ইন্দ্রপদ-

গৌরবতুল্য। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন।" যে স্তবের যোগ্য এক গভীর প্রেম ছাড়া কেহ ত তাহাকে গালি দিতে পারে না।]

৬। হাসি দরশই মুখ ঝাঁপই গোই
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই।
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥

[অভিমানিনী গৌরী রাধা হাসিয়া মুখ দেখাইয়া মুখখানি ঢাকিল, বাদলে যেন চাঁদ ব্যক্ত হইতে পাইতেছে না। হাতে হাত দিবামাত্র প্রেমসঞ্চার হইল—দরিদ্র যেন ঘট ভরিয়া সোনা পাইল।]

৭। শ্যাম সুধাকর নিকটহিঁ রোয়ত কুরু চিতকুমুদবিকাশ।
অঞ্চল অন্তর মানতিমির রহু দূরে রহু মদন হুতাশ।

[অভিমানিনী রাধাকে সম্বোধন করিয়া সখী বলিতেছে, শ্যাম সুধাকর নিকটে রোদন করিতেছে—চিত্তকুমুদ বিকসিত কর, মানের আঁধার আঁচলের আড়ালে থাকুক—মদনানল নির্বাপিত হউক।]

৮। তোমার মধুর গুণ কত পরথাপলু সবহু আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর কমলিনী না সহে পরাণে।

[সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে—অভিমানিনী রাধার চিত্ত কিছুতেই গলাইতে পারিলাম না। তোমার গুণের কথা ফলাও করিয়া তাহার কাছে বিবৃত করিলাম—সে সব বিপরীত বুঝিল। চাঁদ হিম বর্ষণ করিলে কমলিনী যেমন সহ্য করে না—সেও তেমনি অনুরোধ উপরোধ সহ্য করিল না।]

৯। কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব ॥

[মানিনী শ্রীমতীর ভৎর্সনার মধ্যেও কি গভীর দরদ ফুটিয়াছে! তুমি কেন নিজের দিব্য দিতেছ, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে—তোমার নিজের অনিষ্ট সাধনের অর্থ ত আমার জীবন হরণ। জীবনটুকু এখনও আছে—তাহাও কি লইতে চাও?]

১০। অনুখন দুনয়নে নীর নাহি তেজই বিরহ অনলে দিয়া জারি।
পাবক পরশে সরস দারু যৈছে একদিশে নিকসয় বারি।

[বিরহ অনলে তনু জলিতেছে—চোখের জল অনবরত ঝরিতেছে। ভিজা কাঠ আগুনে দিলে যেমন ধিকি ধিকি জলিতে থাকে—অন্য একদিক দিয়া জল ঝরিতে থাকে—রাধার সেই দশা হইয়াছে।]

১১। আছিনু মালতী বিহি কৈল বিপরীত ভৈগেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে॥

[শ্রীরাধা গুরুগঞ্জনায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে—কুমারী অবস্থায় ছিলাম মালতী—বিবাহের ফলে হইলাম কেতকী—চারিদিকে কাঁটায় ঘেরা। কাঁটার জন্য ভ্রমর আর আসিতে পাইল না। ভ্রমর ও মালতী (অধুনা কেতকী) দূরে থাকিয়া দুইজনেই ছটফট করিতেছে।]

১২। কাঁদিতে না পাই বন্ধু কাঁদিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে।

[প্রাণ ভরিয়া ডুকরিয়া যে কাঁদিব তাহারও উপায় নাই। চোরের পত্নী যেমন ফুকারিয়া কাঁদিতে পারে না—আমারও সেই দশা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের—চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে—এই পংক্তিই কি জ্ঞানদাস এখানে গ্রহণ করিয়াছেন?]

১৩। শুন শুন সই তোমাদেরে কই পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল রতন বেড়ি ফণিগণ হেরিয়া পরাণ কাঁদে।
গুরু গরবিত বোলে অবিরত এ বড়ি বিষম বাধা॥
একুল ওকুল দুকুলে চাহিতে সংশয় পড়িল রাধা।

[একদিকে গুরু-গঞ্জনা অন্য দিকে শ্যামের পীরিতি—দোটানায় পড়িয়া রাধা বলিতেছে—অমূল্য রত্ন যেন ফণিগণে বেষ্টিত হইয়া আছে। রত্নের লোভও ছাড়িতে পারি না—ফণীর দংশনও সহ্য হয় না।]

১৪। সইলো পীরিতি দোসর ধাতা
বিধির বিধান সব করে আন না শুনে ধরম কথা।

[বিধির বিধান টলে না—বিধির বিধান সব অন্যথা করিয়া দেয়—কোন উপাসনা, কোন আবেদন, কোন ধর্ম্মকথা শোনে না। শ্যামের পীরিতি হইয়াছে দ্বিতীয় বিধি—দ্বিতীয় ধাতা। বিধির বিধানের মত উহা আমাকে চালিত করিতেছে—জাতিকুল মান বা সতীধর্ম্মের আবেদন কিছুই শুনিতে চায় না।]

চণ্ডীদাসকে বলা হয় দুঃখের কবি—আর বিদ্যাপতিকে সুখের কবি। বিরহ বা বিপ্রলম্ভ চণ্ডীদাসের আর সম্ভোগ-মিলন বিদ্যাপতির রসের মূল প্রেরণা। আমরা জ্ঞানদাসে দুইএরই মিলন দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস কেবল বিপ্রলম্ভেই সাফল্য লাভ করেন নাই—সম্ভোগ-মিলনের কথাতেও কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস অকুণ্ঠিত, তাহাতেও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি নাই। বসন্তোৎসব, হোলী, রাসলীলা ইত্যাদির উল্লাস-মাধুর্য্য কবির কাব্যে অপূর্ব্ব রসরূপ ধারণ করিয়াছে।—বিদ্যাপতিকে ছাড়াইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিদ্যাপতির নীচেই জ্ঞানদাসের ঠাঁই।

পহিল হি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলি কলা কত দুহুঁ রসে উনমত ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান ঢুলাঢুলি উরে উরে অধরে অমিয়া রস নেল।

রাস বিলাস শ্বাস বহে ঘনঘন ঘামে তিলক বহি গেল ॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখিচন্দ্রক বেশভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ।

এই পংক্তিগুলিতে রসমত্ততা ফুটিয়াছে, কিন্তু লালসার জ্বালা নাই। জ্ঞানদাসের সম্ভোগরসের কবিতার বিশেষত্ব ইহাই। এই শ্রেণীর পদগুলি কবি ব্রজবুলিতে লিখিয়াছেন। তাহা দ্বারা তিনি গ্রাম্যতা আচ্ছন্ন করিতে পারিয়াছেন। একদিকে গৃহে গুরুজনের গর্জ্জন, ক্ষুরধার স্বামীর তর্জ্জন—আর অন্যদিকে মুরলীধ্বনির আকর্ষণ—এই যে রাধা হৃদয়ের দোলাচল দ্বন্দ্ব—ইহাই হইয়াছে জ্ঞানদাসের বহুপদের প্রেরণা। প্রেমের চিরন্তনলীলার কোন অঙ্গ কবি বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না—কিশোরীর বাহিরে লজ্জা, অন্তরে পিপাসা, গরবিনীর মুখে কুলদর্প, সতীগৌরব, অন্তরে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা, সাহসিকার অন্তরে সাহস, বাহিরে ভয়, অভিমানিনীর বহিরঙ্গে অহঙ্কারের স্তব্ধতা, অন্তরঙ্গে মিলন-পিপাসার মুখরতা, উপেক্ষিতার বচনে জ্বালা—হৃদয়ে বরণমালা,—প্রেমলীলার এই চিরন্তন মিশ্রভাবগুলি কবির কাব্যে অপূর্ব্ব বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

কবি রসশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি রক্ষার জন্য রাধিকার অভিসারিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মানিনী, কলহান্তরিতা ইত্যাদি বিবিধ নায়িকা রূপও চিত্রিত করিয়াছেন—এইগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু মাথুর শ্রেণীর কবিতায় প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা রাধার অন্তরের আর্ত্তি কবির কাব্যে করুণ আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে কবি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানদাসের রচনায় অর্থালঙ্কার কিছু কিছু আছে—কিন্তু শব্দালঙ্কারের প্রতি তাঁহার আদৌ লোভ ছিল না। গোবিন্দদাস ও জগদানন্দ ছিলেন অতিরিক্ত অনুপ্রাসের ভক্ত—ছন্দোবৈচিত্র্যের দিকেও তাঁহাদের লোভ ছিল খুব বেশি।

বিদ্যাপতির রচনায় শ্লেষ যমকের ছড়াছড়ি—গোবিন্দদাস এ বিষয়ে বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠ শিষ্য। জ্ঞানদাস শব্দালঙ্কারের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হ'ন নাই—শাব্দিক চাতুর্য্য তাঁহাকে আবিষ্ট করে নাই। অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি গভীর অনুভূতিগুলির অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহার ভাষার পারিপাট্যেরও অভাব নাই। স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় যতটা পারিপাট্য ও শ্রীসৌষ্ঠব দান করিতে পারা যায়—তাহাই তিনি দান করিয়াছেন—শব্দালঙ্কৃত ভাষার তুলনায় তাহা জোরালো ত হইয়াছেই—অর্থালঙ্কারমণ্ডিত ভাষার চেয়েও তাহা অধিকতর রোচনীয় হইয়াছে। মানভঙ্গের পর্য্যায়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখে অলঙ্কৃত ভাষা বসাইয়াছেন। যেন শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও অলঙ্কার-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মান পরিহার করিবেন। এ যেন 'অলঙ্কার' দিয়া গৃহিণীর মান ভাঙ্গানো। জ্ঞানদাস অলঙ্কৃত বাক্য একেবারে ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে—তবে তাহাতে চাতুর্য্যের চেষ্টা নাই। যেমন—

শ্যাম সুধাকর নিকটহি রোয়ত কুরু চিত-কুমুদ-বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর মান তিমির রহু লোচন পড়ল উপাস॥

কিংবা প্রেমরতন জনু কনয়া কলস পুন ভাগ্যে যে হয় নিরমাণ।
মোতিমহার বার শত টুটয়ে গাঁথিয়ে পুন অনুপাম।

অনলঙ্কৃত ভাষার আকিঞ্চনই চমৎকার—

অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে। সোনা শতবাণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে।
চাহ চাহ মুখ তুলি চাহ মুখ তুলি। পরশিতে চাই তুয়া চরণের ধূলি।
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি। নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি।

এক পংক্তিতে খণ্ডিতার আক্ষেপ কি গভীর ভাবেই ফুটিয়াছে দেখ—

'আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।'

আবার এক কথায় কি মধুর অভিশাপ রাধার মুখে প্রকাশ পাইয়াছে

লক্ষ্য কর—রাধাকে যে চিনিয়াছে—রাধাচরিত্র যে জানে সে ইহার বেশি বলাইতে পারে না। "যে মোরে ছাড়িতে বলে হবে বধের ভাগী।"

অনলঙ্কৃত ভাষায় হৃদয়ের গভীর রসাবেগ প্রকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১। রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া কি যে করে প্রাণ॥

[এখানে অলঙ্করণ নাম মাত্র—সহজ কথারই জোর বেশি।]

২। সখী বলিতেছেন—একি গো রাই, তোর সাজসজ্জা সব বিফল গেল? যদি শ্লথ শিথিল ধ্বস্ত স্রস্তই না হইল—তবে তোকে এত সাজাইলাম কি জন্য? তোর শ্যাম কি শিশু—না তোর হৃদয় কঠোর?

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী শিথিল না ভেল তোর?
অমল বদন কমল মাধুরী না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনি ধরণী হেরসি হাসি না কহছি বাত॥

এই অংশের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

৩। শ্রীকৃষ্ণের আদরের মধ্যে কি দরদই না প্রকাশিত হইয়াছে!

এস বস মোর কাছে রৌদ্র মিলয় পাছে
বসনে করিয়া মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পশারিণী' কবিতার শেষাংশ মনে পড়ে।

সহজে বরণ কালো তিমির পুঞ্জ ভেল অন্তর বাহির সমতুল।

৪। মরুক তোমার বোলে কলসী বাঁধিয়া গলে সে ধনী মজাক জাতি কুল।

একে হাম পরাধীনী তাহে কুল কামিনী ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।
যথাতথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি সকলি কহসি সবিশেষ।
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিনু মনে ফুলে ফলে কতই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে যে দিলা লাজ জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ।

এখানে শ্রীরাধার আক্ষেপে কি বেদনাই ফুটিয়াছে!

৫। রাধার আক্ষেপ এই—প্রেমত অনেকেই করে—আমারই বা কেন এত জ্বালা—

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।
কিবা সে মোহন রূপ মোর চিত্ত বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে॥

৬। প্রভাতে ব্রজশিশুগণ বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া গোঠে যায়—প্রাণনাথকে সহজ ভাবে দেখিব তাহার উপায় নাই।—'হাতে প্রাণ ক'রে' তবে দেখিতে হয়।

অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাথ।

৭। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি সুভাষিতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—

লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক মানয়ে শৈল সমান।
অচলহিত করয়ে মুরুখ জনে মানয়ে সবিষ প্রমাণ।

[সুজনের লঘু উপকার করিলেও সে তাহাকে পর্ব্বত-প্রমাণ মনে করে—অচল-প্রমাণ হিত সাধন করিলেও মূর্খেরা তাহাকে সর্ষপ-প্রমাণ মনে করে।]

৮। শ্রীকৃষ্ণ অভিমানিনী রাধাকে বলিতেছেন—আমি এত সাধাসাধি

করিতেছি—উত্তর দিতেছ না, আমার নিবেদন না হয় উপেক্ষা করিলে,—'দারুণ দক্ষিণ পবন যব পরশব' তখন কি করিবে ?

কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি তব কাঁহা রাখবি মান ?
কোটি কুসুম শর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরবি পরাণ ?

৯। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—

যে চাঁদের সুধা দানে জগৎ জুড়াও
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হইয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি কর পরসাদ ॥

কবি রাধাশ্যামের মিলনকে বলিয়াছেন—'দুখ সঞে সুখ ভেল, দুহুঁ অতি ভোর।' রাধা অভিমান করিয়া বলিতেছেন 'বাদিয়ার বাজি যেন তোমার পীরিতি হেন', "পানিতৈল নহে গাঢ় পীরিত।" রাধা প্রথম দর্শনকে 'পাষাণের রেখা' ও বৃথা প্রবোধকে বলিতেছেন 'পানির লিখন'। এই রূপ ছোট ছোট কথায় কবি অনেকটুকু ভাব সহজেই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভতাকে কবি বলিয়াছেন 'ভ্রমর-তিয়াস।' রাধাশ্যামের বহু আকাঙ্ক্ষিত আদরকে বলিয়াছেন 'ভাদরের বাদর।' 'সে সব আদর ভাদর বাদর কেমনে ধরিবে দে।"

কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধরণ করিয়া দেখাই জ্ঞানদাসের রচনা কিরূপ রসঘন—এই কবিতাগুলিতেই জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

১। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার স্বপ্নে মিলন—একটি অপূর্ব্ব কবিতা।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুনশুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝিঁ ঝিনি ঝিনি বাজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিনু হেনকালে।
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত্ত ধিক রহু কুলের কামিনী।
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা নিন্দে ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেয় ছলে আমা কিন বিকাইনু বোলে।
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ মান ভয় গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

এই পদটি জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ।

"পরাণ নাথেরে স্বপনে দেখিলাম সে যে বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।"

চণ্ডীদাসের এই পদটি স্বপ্নমিলনের পদ। সম্ভবতঃ এই পদটিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত উহাকে প্রথম শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিয়াছেন। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"নিরাভরণা সুন্দরীর গলে মোতির মালা পরাইয়া দিলে যেরূপ হয়, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের পদটির তেমনি অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন।" দুঃখের কবি চণ্ডীদাস স্বপ্নভঙ্গের বেদনাটির কথাও বলিয়াছেন। জ্ঞানদাস এমন মধুর স্বপ্নটিকে আর ভাঙ্গিতে দেন নাই। এই পদটি রামানন্দ বসুর—"তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী" পদটিকেও মনে পড়ায়।

এই পদে রচনার সর্ব্বাঙ্গীণ পারিপাট্যের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে

সুখস্বপ্নের অনুকূল পরিবেষ্টনীটিকে। কবি যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে রাধার নয়নে নিদ্রাবেশ ঘটাইয়াছেন—তাহা সুস্বপ্নের পক্ষে কেমন অনুকূল তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। আর লক্ষ্য করিতে হইবে, বরিষণের রিমঝিম ধ্বনি, পালঙ্কের সুখশয্যা, ঝিল্লীর একটানা সুর, দাদুরী ডাহুকীর কলস্বর,—সর্বোপরি কবির কলচ্ছন্দের অনুরণন কেমন শ্রীমতীর ঘুমটিকে ঘনাইয়া আনিতেছে। তার পর স্বপ্নদৃষ্ট দয়িতের লীলা-মাধুরীটুকু স্বপ্ন ও তাহার ছন্দোময় রূপকে কি অপূর্ব্বতা দান করিয়াছে—তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

এই কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে চঞ্চল করিয়াছিল। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন—"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা—রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন............স্বপন দেখিনু হেন কালে।)

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন্ একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসা কুঁড়িধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নাই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

আর একস্থলে কবি বলিয়াছেন—

সঘন নিশীথে গর্জ্জিছে দেয়া রিমি ঝিমি বারি বর্ষে।
মনে মনে ভাবি কোন পালঙ্কে কে নিদ্রা যায় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর কবি কাব্যের রঙ্গে।
স্বপ্ন পুলকে কে জাগে চমকি বিগলিত চীর অঙ্গে।

২। মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ।

নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়।
কখনও না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায়।
নেয়ের নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে।
অকাজে দিবস গেল নৌকা পার নাহি হলো
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হইয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবিহ বিষাদ।

নাবিকবেশী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে যমুনা পার করিয়া দিতেছে—মানস গঙ্গার জলে তরণী টলমল—গগনে উঠিল মেঘ—পবনে বাড়িল বেগ। ব্রজগোপীরা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ব্যাপার বিচিত্র কিছু নয়—কিন্তু এই কবিতা আমাদিগের চিত্তকে অজ্ঞাতসারে যমুনাতীর হইতে ভবনদীর পারে লইয়া যায়। কবি ইহাতে কোন Symbolical Significance হয়ত দিতে চাহেন নাই—কিন্তু রচনার গুণে পদটি বর্ত্তমান যুগের কবির চিত্তকে লোকোত্তর রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে।

দিবালোক যায় চ'লে, দিগন্তে পড়েছে ঢ'লে
ক্ষীণতেজা দিনান্ত-তপন,
মাথার উপর দূরে বকপাঁতি যায় উড়ে
কেশে রেখে ধবল স্বপন।
ও পারের পানে চাহি বসে আছি, তরী বাহি
কাণ্ডারী করিছে পারাপার।

খেয়াঘাটে বসি হেরি \ আমারো ত নেই দেরি,
চমকিয়া উঠি বার বার।
মানভার, লজ্জাভার, ঋণভার, সজ্জাভার,
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা
সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ ন্যুব্জ ভারে
পার হওয়া মোর নয় সোজা।
ভারমুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার কর' ব'লে
কাণ্ডারীরে ডাকিব কি করি ?
তরী বাহি যায় আসে কোন ভার লয় না সে,
কোন ভার সয় না সে তরী।
সব চেয়ে গুরুভার মনোবাস বাসনার,
ভারী যেন বিশাল পাষাণ,
কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পার ঘাটে,
স্মরি নৌকা-বিলাসের গান।
"মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নেই কেউ।"
দুকূল বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়,
ভাঙা তরী সহেনাক ভর।
কানু কয় "এই নদী পার হ'তে চাও যদি
নীরে ডারো ক্ষীরদধিসর।
বলয়-নূপুর-হার আদি সব অলঙ্কার
এ সবের রেখ না মমতা,

অই সব ভার ধরি' টলমল মোর তরী
লঘু কর তব তনুলতা।
শুধু এই ভার কেন? তব বসনেরো জেন,
ভারটুকু এ তরী না সয়।
পার হবে ভরা নদী জয় কর ত্বরা যদি
সব মায়া, সব লজ্জাভয়।"
জানি না, কি ভাবি কবি এঁকেছেন এই ছবি,
হয় ত বা রসেরই কৌশল,
আজি খেয়া-ঘাটে পড়ি অই চিত্র শুধু স্মরি
চোখে মোর ঝরে অশ্রুজল।
বেদনা-বিধুর চিতে সেই অশ্রুজলে তিতে
বাসনা-বসন হয় ভারী।
বসনে গুণ্ঠিত মন বাসনা-কুণ্ঠিত জন
অকূলে কেমনে দিবে পাড়ি?

৩। সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।
সখি কি মোর কপাল লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।

* * * *

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে
জ্ঞানদাস কহে পীরিতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে।

ভাবটির জন্য নহে—ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী এই কবিতায় এমনই চমৎকার যে ইহা বঙ্গসাহিত্যে চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে। যুগেযুগে অভাগার কণ্ঠে ইহা প্রাণের ভাষা দিয়াছে বলিয়াই ইহা চমৎকার।

৪। মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ যদি সই পিয়া নাহি এল।
এহেন যৌবন পরশ রতন কাচের সমান ভেল ॥
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি।
আপন বঁধুয়া আনিব বাঁধিয়া কেবা করিবারে পারে,
যদি রাখে কেউ তেজিব এ জিউ নারীবধ দিব তারে।
পুন ভাবি মনে বাঁধিব কেমনে সে শ্যাম বঁধুর হাতে।
বাঁধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাস কহে বিনয় বচনে শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি দারুণ কুলের বাধা।

৫। গগন ভরল নব বারিধরে বরখা নব নব ভেল,
বাদর দরদর ডাকে ডাহুকি সব শবদে পরাণ হরি নেল।
চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই মদন বিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ় গাঢ় বড় বিরহ বরখা কেমন গোঙাব।
সরসিজ বিনু সে শোভা না পাবই ভ্রমরা বিনু শূন দেহা।
হাম কমলিনী কান্ত দেশান্তরে কত না সহব দুখ লেহা।
সঞ্চরু সঘন সৌদামিনী ঘন বিরহিণী বিন্ধিল মার।
মাস শাঙনে আশ নাহি জীবনে বরিখয়ে জল অনিবার।
নিশি আঁধিয়ার অপার ঘোরতর ডাহুকি কল কল ভাখ।
বিরহিণী হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক।
উনমতি শকতি আরোপয়ে নিতি নিতি মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দরদর দেহ দোলন মন্দিরে একলি অভাগি।

প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার গূঢ় সংযোগের তথ্য প্রাচীন কবিদের রসনেত্রে কেমন ধরা পড়িয়াছিল, এই কবিতা তাহার দৃষ্টান্ত।

৬। আজু পরভাতে কাক কলকলি আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে উড়িয়া বৈসয়ে তায়।
বঁধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া মিলিব আমার পাশে।
তুরিতে হেরিয়া চকিতে উঠিয়া বদন ঝাঁপিব বাসে।
তা হেরি নাগর রসের সাগর আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি গদগদ করি কহিবে বচন থোর।
তবহি মিলন দেখিয়া বদন হইয়া লাগব ভোরে।
আঁখি ছল ছলে গরগর বোলে কত না সাধিবে মোরে।
সময় জানিয়া থির মানিয়া পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি কহে কবি জ্ঞানদাস।

ভাবিক অলঙ্কারের সাহায্যে কবি এখানে বিরহিণী রাধার মিলন-স্বপ্নকে অপূর্ব্ব বাণীরূপ দিয়াছেন।

৭। মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতি ভার।
পন্থ নেহারিতে নয়ন আঁধাওল দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল্ল বরিখে বরিখে কত ভেল।
আওব করি করি কত পরবোধব অব জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ চেতন অচেতন নিতিনিতি ভেল তনু ভার।
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব তব কি করব জ্ঞানদাস।

রাধার এই প্রতীক্ষা শবরীর প্রতীক্ষার চেয়েও করুণ। এই কবিতায় যে আর্ত্তি ফুটিয়াছে, তাহা কেবল রাধার ও কবির নয়, উহা নিখিল মানবের।

বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ

'প্রেমলীলার গান বলিয়া বৈষ্ণব কবিতাকে যাঁহারা লালসা-সাহিত্য মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বৈষ্ণব পদাবলী আগাগোড়া বেদনারই কাহিনী। পূর্ব্বরাগ হইতে মাথুর পর্য্যন্ত সমস্তই বেদনার গভীর রঙে অনুরঞ্জিত।'

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি রাধার প্রাণে সোয়াথ (স্বস্তি) নাই। তাহার 'মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন।' । 'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা।' "মন্দাকিনী পারা কত শত ধারা ও দুটি নয়নে বহে।"

"মরমহি শ্যামর পরিজন পাগর ঝামর মুখ অরবিন্দ।"

"ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ।"

"অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুস্তুর তুল।"

"অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।" "মন্দির গহন দহন ভেলা চন্দনা।"

"হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা কাতরে পরাণ কান্দে।"

"খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।"

"উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ কি হৈল রহিতে নাহি ঘরে।"

"কালার ভরমে কেশ কোলে করি কালা কালা করি কান্দি।

কেশ আউলাইআ বেশ বনাইতে হাত নাহি সরে বান্ধি।"

এই সমস্ত কথা গভীর বেদনারই অভিব্যক্তি। রাধার অন্তরে এই যে আগুন জ্বলিল—এই আগুন একদিনের জন্যও নিভে নাই।

শ্রীকৃষ্ণের দশাও তথৈব চ। যে রূপশ্রীকে আশ্রয় করিয়া তথাকথিত লালসার গান তাহা ত বেদনায় মলিন হইয়া গেল।

শ্রীমতী কৃষ্ণ-প্রেম প্রাণে পোষণ করিয়া চির দুঃখকেই বরণ করিলেন।

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।"

"জল নহে হিমে তনু কাঁপাইছে সব জনু প্রতি অণু শীতল করিয়া।"

"অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি বিচারিতে না পাইয়ে ওর।"
"শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।"

যদিবা শ্যামের বাঁশরী রাগপীড়িতাকে রাধা রাধা বলিয়া আহ্বান করিল কিন্তু রাধা কি করিয়া শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইবেন? শ্রীমতীর আকিঞ্চন—

হাম অতি দুখিত তাপিত তাহে পরবশ তাহে গুরুগঞ্জন বোল।
গৃহের মাঝারে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী সদা ভয়ে জিউ উতরোল।

পরিজন গুরুজন মিলনের বাধা। তাহাদের তর্জ্জন শাসন মাথার উপরে, "দুরুজন নয়ন পহরী চারিদিকে।" 'অনুখন গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে।"

"আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥"
বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শ্বাশুড়ী মোর জলন্ত আগুনি॥"
"শানানো ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥"

একদিকে কুলশীল, অন্যদিকে কালা। শ্রীমতী—

একূল ওকূল দুকূল চাহিতে পড়িল বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন বেড়ি ফণিগণ দেখিয়া পরাণ কাঁদে।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"ক্ষুরের উপর রাধার বসতি।"

এই রাধার জীবনে লালসার ঠাঁই কোথা?

তারপর কলঙ্কের জ্বালা। "গোকুলে গোয়ালা কুলে কেবা কি না বোলে। লোকভয় লাগিয়া যে ডরে প্রাণ হালে॥ চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে। এমতি রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে॥" "জগভরি কলঙ্ক" রহিয়া গেল। 'পাপিয়া পাড়ার লোকে' ঠারাঠারি করিতে লাগিল।

'পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে' স্বপ্নেই তাহাকে পাওয়া যায়, সত্য সত্য রক্তমাংসের দেহে ত তাহার সহিত মিলন হয় না। কুলবতী রমণী কি করিয়া মিলন সুখ লাভ করিবে? "একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ।" এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তাই 'গুরুজন নয়ন সকণ্টক বাটে' অভিসার। এই অভিসারে প্রকৃতির বাধাও কম নয়। আকাশের চাঁদও বাধা। "তৈখনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ পশারল কিরণক দামা।" "হিমকর কিরণে গমন অবরোধল কী ফল চলতহুঁ গেহ।"

গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে পথঘাট নির্জ্জন বটে, কিন্তু তখনও প্রকৃতির বাধা কম নয়।

একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুন তপন কি তাপ।

ঘামি গলয়ে তনু ননীক পুতলী জনু হেরি সখী করু পরিতাপ।

বর্ষা রজনী প্রিয় সঙ্গ ছাড়া কি করিয়া কাটে?

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

"দহয়ে দামিনি ঘন ঝনঝনি পরাণ মাঝারে হানে।"

পঙ্কিল শঙ্কিল বাটে কঠিন কবাট ঠেলিয়া অভিসারে যাইতে হয়। সে বাট কি ভয়ঙ্কর! ভুজংগে ভরল পথ কুলিশ পাত শত আর কত বিঘিনি বিথার। বর্ষার দুর্দিনে রাধার দুর্গতির অবধি নাই। তাহার উপর শ্যামের জন্যও রাধার উদ্বেগের সীমা নাই।

"আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ কাটে।"

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনি ঝলকই।

কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই॥

তরল জলধর বরিষে ঝরঝর গরজে ঘনঘন ঘোর।

শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥"

অভিসারে গিয়াও দয়িতকে পাওয়া যাইবে এ বিষয়েও স্থিরতা নাই। প্রতীক্ষার বেদনা আছে।

"পথ পানে চাহি কত না রহিব কত প্রবোধিব মনে।"

'পৌখলি রজনীতে' লোকে আপন গৃহে রহিয়াই কাঁপিতেছে। এহেন রজনীতে অভিসারে আসিয়াও কান্তর দেখা নাই।

"না দেখিয়া তঁহি বর নাগর কান। কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারি। আয়লুঁ কুলবতি চরিত উঘারি॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান। কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥"
"ফুলশরে জরজর সকল কলেবর কাতরে মহি গড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন উঠি বসি রজনী গোঙাই॥"

দারুণ প্রতীক্ষায় 'সুদীঘল' রাতির মুহূর্ত্তগুলিকে শ্রীমতীর এক একটি কল্প বলিয়া মনে হয়—অশ্রুতে সম্ভোগ-তল্পের সহিত সম্ভোগ-কল্প ও ভাসিয়া যায়।

'চৌরি পীরিতি' যতই মধুর হউক, রাধার পক্ষে মিলন দুর্লভ।—বিরহেরই প্রাধান্য ইহাতে। এই বিরহ বেদনার গানই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অঙ্গ।

১। যাহে বিনু সপনে আন নাহি দেখিয়ে অব মোহে বিছুরল সোই।

২। নব কিসলয় দলে শূতলি নারি। বিষম কুসুম শর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি। জীবন ধরয়ে তুয়া দরশন লাগি॥

৩। কবহু রসিক সনে দরশ হোয় জনি দরশনে হয় জনি নেহ।
নেহ বিচ্ছেদ জনি কাঁহুকে উপজয়ে বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥

৪। অগৌর চন্দন তনু অনুলেপন কো কহে শীতল চন্দা।
পিয়ে বিনে সো পুন আনল বরিখয়ে বিপদে চিনিয়ে ভালমন্দা॥

৫। অঙ্গুলক আঙ্গুটি সে ভেল বাউটি হার ভেল অতিভার।
মনমথ বাণহি অন্তর জরজর সহই না পারিয়ে আর।

এইভাবে বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীমতীর বিরহ-বেদনার বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের রচনার একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া দেওয়া হইল, সখীদের জবানীতে—

শ্যাম বুঝি শেষে পাতকী হইলে নারী হত্যার পাপে।
ননীর পুতলি পিয়ারী আজিকে গলিল বিরহ তাপে।
দীঘল নিশাসে মুখ পঙ্কজ ঝামর হইয়া ঢুলে।
অঙ্গুরী আজি বলয় হইয়া অঙ্গুলি হতে খুলে।
বড় গুরুভার লাগে পিয়ারীর মুক্তাফলের মালা।
অম্বর তার খসিয়া পড়িছে নাহি সম্বরে বালা।
গহন বিরহ দহনে দহিয়া মুহুমুহু মুরছায়।
তোমার নামটি কর্ণে জপিলে তবে সে চেতনা পায়।
নির্জন পেলে তরুণ তমালে মোহে আঁকড়িয়া চুমে।
চারিধার তার হয়েছে আঁধার মনোজের ধূপধূমে।
নীল অম্বর সহিতে পারে না তব স্মৃতি মনে জাগে।
অরুণাম্বরে ও তনু ঝেঁপেছে যোগিনীর মত লাগে।
ঝরঝর করি বারিধারা চোখে কাজর গলায়ে ঝরে
তাহার সহিত নয়নের নীদ সারা নিশি গ'লে পড়ে।
নব জলধর গগনে উদিলে এমন করিয়া চায়।
মনে হয় যেন দীঘল নিশাসে উড়াইয়া দিবে তায়।
হে শ্যাম জলদ, তোমায় আশায় রোপিয়া প্রেমের তরু,
নয়নের জলে বাঁচায়ে রেখেছে সখীর জীবন-মরু।
বাঁধুলী অধর ধূতুরা হইল বিরহের বেদনায়,
বংশী তোমার দংশিয়া প্রাণে কি বিষে জারিল তায়।
খই হয়ে ফুটে মুকুতার হার বক্ষের তাপে জ্বলে।
কনক ভূষণ সোনার অঙ্গে মিশে যায় গ'লে গ'লে।
কবরী এলায়ে কালো কেশপাশ বক্ষের পরে দোলে।
কক্ষে চাপিয়া সেই কেশপাশ ক্ষণিক বেদনা ভোলে।

নবমী দশায় এসেছে পিয়ারী হ'য়ো না স্ত্রীবধপাপী।
তোমার বিরহে হয়ে পতঙ্গী শিখা,পরে মরে কাঁপি।
চরণ-নখরে মাটির উপরে কি যেন লিখিছে রাই,
যত তত তারে জিজ্ঞাসা করো কোন উত্তর নাই।
জ্বলে দাবানল সারা তনু ভরি, পুড়ে সবি তারি আঁচে।
মর্ম্মকুহরে আশার বাঁধনে প্রাণ-মৃগ বাঁধা আছে।
জ্বালা না জুড়ায় তালবৃন্তের ব্যজনের পরিমলে।
ধূমকুণ্ডলী ভেদি হুতাশন তায় আরো উঠে জ্ব'লে।
শিথিল হয়েছে আমার সখীর শিরীষ-পেলব তনু।
অলিসম তারে দলিত করেছে নির্দয় ফুলধনু।
দরদী বসন তেয়াগি বিলাস ছাড়িয়া সখীর বুক,
করিছে ব্যজন ঘুচায় ঘর্ম্ম মুছায় তাহার মুখ।
তোমার ধেয়ানে সোনার বরণ তোমারি মতন কালা,
লজ্জার সাথে সজ্জা দহেছে আজিকে বিরহ জ্বালা।
সে যে হিমকরে হেরি অম্বরে প্রলাপ বকিতে রহে।
তূলা খানি তার নাসায় ধরিলে বুঝা যায় শ্বাস বহে।
কিসলয় শেজ ঝলসিয়া যায় আর কি অধিক কব ?
ঝলে তার তনু-কনক-মুকুরে শতেক বিম্ব তব।

বিরহের সঙ্গে অনুতাপ ও আত্ম-ধিক্কারের বেদনা আছে। লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমতী যাহার জন্য কলঙ্কের ডালা মাথায় লইলেন,সে যদি উপেক্ষা করে, তবে সে বেদনা রাখিবার স্থান নাই। অভিমানিনী রাধা শ্যামের সামান্য উপেক্ষাও সহিতে পারিতেন না। ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার মনে হইত ধূষ্ট নট শ্যামনটবর বুঝি তাঁহাকে ভুলিয়া গেল। এই চিন্তায় রাধার বিরহ-বেদনা দ্বিগুণিত হইত। তখন রাধার অনুতপ্ত আক্ষেপ শত শিখায় ও শাখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

১। কাঞ্চন কুসুম জ্যোতি পরকাশ। রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়লুঁ আশ।
তাকর মূলে দিলুঁ দুধক ধার। ফলে কিছু না দেখিএ ঝনঝনিসার।

২। কাঠ-কঠিন কয়ল মোদক উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিখে পূরাইল উপরে দুধক পূর॥

৩। যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সেঁচি আঁখিজল।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া বিরিখে বিষ ফল।

৪। শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ অনলতাপে পাষাণ সে গলে।

৫। সোণার গাগরী বিষজলে ভরি কেবা আনি দিল আগে।
করিলুঁ আহার না করি বিচার এ বধ কাহার লাগে।
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে যাইতে ব্যাধ-শর দিল বুকে।
জলের শফরী আহার করিতে বঁড়শী লাগিল মুখে।

৬। সুখের লগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

৭। জ্বালার উপর জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি হবে উপায়॥

(শ্রীমতী বলিতেছেন—এক কাল হৈল মোর নহলি যৌবন। শুধু যৌবন নয়, বৃন্দাবন, যমুনার জল, কদম্বের তল, রতন ভূষণ, সবই কাল হইল শ্রীমতীর।

এ সব ত গেল অভিমানের বাণী। রাধার পক্ষ হইতে দৈন্যঘন করুণ আবেদনও আছে—)

১। রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিকরুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

২। এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন। তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন।

৩। মোর দিব্য লাগে বঁধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদ মুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে।

শ্রীমতী বলেন—"লোকভয়ে কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।"
"রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি"। ব্যথিতা শ্রীমতী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিলেন—

কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে। কানু গুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে।
কানু অনুরাগ রাঙা বসন পরিয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।

শ্রীমতী ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারেন না—

১। এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তবুও দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।

২। কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের এক ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা।
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো তেজিয়াছি কাজরের সাধ।
কিন্তু হায় এমনি জ্বালা যে পাসরিলে না যায় পাসরা।

কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি বয়ানে না বলি কালা।
তবুও সে কালা অন্তরে জাগয়ে কালা হৈল জপ মালা।

মধুর মিলনের স্মৃতির বেদনাই কি কমনি দারুণ!

১। হাসিয়া পাঁজর কাটা কৈয়াছে কথা খানি
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি।

২। নিরবধি বুকে থুইয়া চায় চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে।

৩। পহিলে পিয়া মোর মুখে মুখে হেরল তিলেক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেমপাশে তনুতনু গাঁথল অব তেজল মোর সঙ্গ।

সঙ্কেতস্থানে গিয়া কানুর প্রতীক্ষায় শ্রীমতীর মনে নৈরাশ্যের বেদনার সঙ্গে যে সংশয়ের বেদনা জাগিতেছে—তাহা আরও সাংঘাতিক।

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া দিল আমারে পেলিয়া দিগম্বর।
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইলুঁ গো সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো এ বাদ সাধিল জানি কোয়।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন ও অন্যান্য নিদর্শন দর্শনে শ্রীমতীর সংশয় সত্য বলিয়াই স্থির হইল।

দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহল রতিচিহ্ন হেরি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব তব মীলব হরি সঙ্গে।

শ্রীমতী বুঝিলেন—আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া। তারপর খণ্ডিতার বেদনা—'ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্।' ইহা শ্রীমতীর নারী-মর্য্যাদায় দারুণ আঘাত।—ইহার বেদনা অপরিসীম। দারুণ বেদনায় শ্রীমতী বলিলেন—"দূরে রহ দূরে বহ প্রণতি আমার।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"বলিলা কেমনে? চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে।" ইহার পর মান। স্বখাত হইলেও মান ব্যবধান। এই ব্যবধানের বিরহ দেশকাল-গত সাধারণ বিরহের চেয়েও দারুণতর। মানে বসিয়া শ্রীমতী শ্যামকে যে দণ্ড দিলেন—তাহার চেয়ে শতগুণ দণ্ড দিলেন নিজেকে।

মানের গানও বিরহেরই গান—তাই বেদনাঘন। অভিমানের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যভিমান। তাহার ফলে কলহান্তরিতার বেদনা। মানভুজঙ্গের দংশনের জ্বালা ত কম নয়। "কবলে কবল্লে জিউ জরি যায় তায়।"
শ্রীমতী হাহাকার করিতেছেন—

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান।
সজনি কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বিমুখী ভৈগেল।
গিরিধর নাহ কানু ধরি সাধল হাম নহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমী চরণ পর ডারলুঁ অব কি করব পরকারি।

শ্রীমতী আর বেদনা সহিতে পারেন না। সো মুখচান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দী বিষ-হ্রদ-নীরে। তারপর মানান্তে অবশ্য মিলন হইয়াছে। কিন্তু এই মিলনের গান উল্লাসরসে উচ্ছ্বসিত হয় নাই। কারণ, মানের ছায়া এ মিলনের উপর হইতে একেবারে অপসারিত হয় না। With some pain fraught থাকিয়া যায়। তাই রাধামোহন ঠাকুর এ মিলনকে বলিয়াছেন—'চরবণ তপত কুশারি।' কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ।

মানান্ত-মিলনের কথা ছাড়িয়া দিই। সহজ মিলনেই বা সুখ কই?

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল হেরইতে ঝরয়ে নয়ান।
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে দুহুঁ দিঠি পূরল কৈসে হেরব মুখ চাই।
তাহে গুরু দুরুজন লোচন কণ্টক সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত ধৈরজ লাজ বিচার।

তারপর প্রেম-বৈচিত্ত্য আছে—মিলনের মধ্যে তাহা হাহাকারের সৃষ্টি

করে। ভুজপাশে থাকিয়াও রাধা—'বিলাপই তাপে তাপায়ত অন্তর বিরহ পিয়ক করি ভান।' 'আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি।' সব চেয়ে মিলনে বিচ্ছেদের ভয়।—হারাই-হারাই ভাব। মিলনের মাধুর্য্য—অশ্রুজলে লবণাক্ত করিয়া দেয়। "প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ভরে।" "দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" চরম প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মিলনেও তৃপ্তি নাই।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

বর্ত্তমান যুগের কবির ভাষায়—

লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়া পরি হিয়া না জুড়ায়
মলয়জ চুয়া চীর ব্যবধানে সে অধীর প্রাণ পুড়ে যায়॥
নিমেষ অন্তর হ'লে কোটি কল্প যুগ ব'লে মনে হয় তারে।
সোহাগের বাণী যত কণ্ঠে এসে পরিণত হয় হাহাকারে।
মিলনে কোথায় স্বস্তি তুষানলে মজ্জা অস্থি পুড়ে হয় ছাই।
ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয় গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয়—হারাই হারাই।
এই প্রেমে কোথা সুখ? দ্রবীভূত হয় বুক এতে পলে পলে।
চুম্বনের সুধা তায় লবণাক্ত হয়ে যায় নয়নের জলে।
হাসিতে হাসি না আসে কামনা পলায় ত্রাসে ছিঁড়ে ফুলহার।
ভূষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জ্বলি উৎসব-সম্ভার।
এ প্রেম ব্যথায় গড়া, মরণে বরণ করা অসহ্য জ্বালায়।
উল্লাস করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি সখীরা পালায়।
শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্টনাম জপ এ গভীর প্রেমে।
ধনুতে জুড়িয়া শর, অবশ পাণিতে স্মর রয়ে যায় থেমে।
বিরহ-নিদাঘ শেষে মিলন বরষা এসে কাঁদায় কাঁদিয়া।
দুহুঁ দোঁহা বুকে বাঁধে দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মাথুর বেদনার কথা আর বলিলাম না। বেদনার সব নদীধারা যে মহাব্যথা-সিন্ধুতে মিশিয়াছে তাহার কথা না বলাই ভালো।

বেদনার কালিন্দী কূলে যে নিত্যলীলা—তাহারই সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য।

পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে লালসার গীতি যে নাই তাহা নয়, কিন্তু সেগুলি যেন বিরহকেই গভীরতর করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে একটা প্রত্যন্তান্তর সৃষ্টির জন্য। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। বিদ্যাপতির রচনাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের বাহিরে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদির রচনায় কিছু কিছু লালসার জ্বালা আছে। অন্যদিকে তেমনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কে যৌনবোধ-স্পর্শশূন্য করা হইয়াছে। লোচনদাস বলিয়াছেন —'আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।' রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—প্রথমে নয়নের রাগে অনুরাগের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।' "যৈছনে বাড়ত মৃণালক সূত" বাড়িতে বাড়িতে সে প্রেম অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ করিল। তারপর—সে যে রমণ এবং আমি যে রমণী এ দ্বৈতভাব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। এমন কি বিদ্যাপতি পর্য্যন্ত রাধার প্রেমকে শেষ পর্য্যন্ত নির্লালস করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। "অনুখন মাধব মাধব সুমরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই। ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিসরল আপন গুণ লুবধাই। আপন বিরহে আপন তনু জরজর জীবইতে ভেল সন্দেহা।" তারপর ভাবসম্মিলনের পদে এই কবিগণই লৌকিক প্রেমের প্রাকৃতরূপ একেবারে হরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট—যাহা প্রধান অঙ্গ, তাহা কামনার গান নয়—বিপ্রলম্ভাত্মক অনুরাগের বেদনারই গান।

দ্বিতীয় খণ্ড

বৈষ্ণব কবিতার ভূমিকা

'জাতীয় জীবনে কোন গৌরবময় বৈচিত্র্য না ঘটিলে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হয় না।' এ কথার যাথার্থ্য Augustus, Elizabeth ও বিক্রমাদিত্যের সময়ের ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত হয়।—লক্ষ্মণসেনের পর তিন শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবনে কোন গৌরব দূরে থাকুক, তাহা দারুণ অগৌরব ও লাঞ্ছনায় অভিভূত হইয়াই ছিল। তাহার লক্ষ্মীশ্রী যেন অপহৃত। তাহার রসকল্পনা ছিন্নপক্ষ জটায়ুর মত ধূলায় লুটাইতেছিল। বাঙ্গালী জাতি তাহার গৃহসংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল—আর কোন দিকে তাহার মন দিবার অবসরও ছিল না। হুসেনশাহী শাসনে সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পাইয়াছিল। এমন সময়ে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ইহার চেয়ে গৌরবময় বৈচিত্র্য আর ঘটে নাই। বাঙ্গালীর গৌরব দিগ্বিজয়ে বা সাম্রাজ্য-গঠনে নয়, বাঙ্গালীর গৌরব প্রেমের বিজয়ে—প্রেমরাজ্য-গঠনে। প্রেমজগতের দিগ্বিজয়ী শূর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মপ্রচারে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সাড়া পড়িয়া গেল—চন্দ্রোদয়ারম্ভে অম্বুরাশির ন্যায় তাহা উত্তাল ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের বাণী যেমন পালি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল—শ্রীচৈতন্যের বাণী তেমনি বঙ্গভাষায় অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল। * যে ধর্ম্ম কেবল কুলে শীলে পাণ্ডিত্যে মণ্ডিত অভিজাত-সম্প্রদায়ের জন্য নয়—

* বৈষ্ণব সাধকগণ সংস্কৃত ভাষায় এক এক জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃতে রচনা করা যতটা সহজ ছিল, বাংলায় রচনা করা তত সহজ ছিল না। সেকালের

আপামর সাধারণের জন্য, সে ধর্ম্মের বাণী প্রাকৃত জনের ভাষাকেই বাহন করিয়া প্রচারিত হয়।

ইহাতে জাতির সুপ্ত সৃজনীশক্তি জাগিয়া উঠিল ও বাঙ্গালীর মনীষা পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইল—তাহাই প্রাচীন বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমঘন জীবন হইতে যে রসগঙ্গা উৎসারিত, তাহা তিনটি পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। একটি তাঁহার প্রেমের বাণী ও জীবনকথা অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে—ইহাই চরিত-শাখা। একটি তাঁহার ভাব-জীবনের লীলা-বৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত—ইহা গৌর-লীলা-গীতির শাখা। আর একটি—সেটিই মূল শাখা। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনী লীলার প্রত্যেক অঙ্গটি শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশে প্রতিফলিত হইত —অলৌকিক লীলারসের আস্বাদজনিত দিব্যানন্দ তাঁহার বাক্যে, গতি-

প্রথা অনুসারেও প্রাকৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃতেই কবিতা রচনার কথা। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পক্ষে বাংলা লেখা কত যে দুরূহ ছিল, তাহা কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়িলেই বুঝা যাইবে। তৎসত্ত্বেও রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপুর, রায় রামানন্দ ইত্যাদি দুই চারিজন ছাড়া সকল বিখ্যাত সাধকই ব্রজবুলি ও বাংলায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠানে কবিগণ প্রেরণা পাইয়াছেন তিনজনের কাছ হইতে—শ্রীচৈতন্যদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বাংলা ভাষাকে ইঁহারা যে গৌরব দান করিয়াছেন—সেকালের পক্ষে তাহা আশাতীত। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমের ধর্ম্ম পণ্ডিতী শাসন হইতে বাংলার সমাজ ও ধর্ম্মকে যেমন রক্ষা করিয়াছিল— —পণ্ডিতী গণ্ডী হইতে বাংলা ভাষাকেও তেমনি মুক্ত করিয়া তাহাকে স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা দান করিয়াছিল। এই কবিরাই বাংলা ভাষাকে কবিতা রচনার ভাষা করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাই আজ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার উন্মেষ ও অভিব্যক্তির সুবিধা পাইয়াছেন। জন-সাধারণের মুখের ভাষা এতই গৌরব লাভ করিয়াছিল যে, কোন কোন পদকে সুপণ্ডিত কবিগণ সংস্কৃত শ্লোকেও রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃত-সমুদ্রে সংকলিত বাংলা পদগুলির সংস্কৃতে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিধিতে, দৃষ্টিতে, ভাবজীবনের নানা দশায় প্রকট হইত। রঙ্গমঞ্চে আমরা যেমন নাটক-বিশেষের অভিনয় দেখি—তাঁহার জীবনে তেমনি তাঁহার সঙ্গিসহচরগণ বৃন্দাবন-লীলাকে যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের এই রাধাভাব-বিলসিত লীলা-বৈচিত্র্য হইতে পদাবলী-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। তাঁহার জীবনই বিদ্যাপতি ও সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও অভিনব রসব্যঞ্জনা ও আধ্যাত্মিক সার্থকতা দান করিয়াছে।

একখানি মহাকাব্য একদা জীবন্ত রূপ করিয়া ধারণ
হয়েছিল অবতীর্ণ, অদ্বৈত গাহিল যার মঙ্গলাচরণ।
পেয়ে এই ধরণীতে অপ্রাকৃত মহাকাব্য প্রেম মূর্ত্তিমান্
করেছিল উপভোগ অলৌকিক রসধারা যত ভাগ্যবান্।
সেই মহাকাব্যখানি সহস্র সহস্র অংশে হইয়া খণ্ডিত
সহস্র সহস্র পদে করিয়াছে গৌড়ভূমে রসবিমণ্ডিত।
প্রেমের আকাশে কবে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হ'লো সমুজ্জ্বল,
এ বঙ্গের রস-সিন্ধু হ'লো তায় নৃত্য-রত তরঙ্গে উচ্ছল।
সে ইন্দুর পূর্ণবিম্ব সহস্র সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গি গেল তায়।
অশ্রুময় ক্ষার-সিন্ধু হলো নব ক্ষীরসিন্ধু রজত আভায়।
অস্তমিত পূর্ণচন্দ্র, খণ্ড-বিম্বগুলি আজো করে ঝলমল,
ইন্দুহারা সিন্ধুবুকে পুণ্য পদাবলীরূপে তাহাই সম্বল।

পদাবলী-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে মাধুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-ভাব কোথাও মিশ্রিত করা হয় নাই। তাহা করিলে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বজ্ঞদের মতে রসাভাস হয়। শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যভাব আরোপ করিলে যে রসের সৃষ্টি হয় তাহা নিম্নশ্রেণীর। মধুর ভাবের ত কথাই নাই—সখ্য-বাৎসল্য ভাবও উচ্চতর রসবস্তু। পদাবলীর মধ্যে কোথাও

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা ব্রহ্মত্বের কথা নাই। * সেজন্য অনেকে বলেন—পদাবলী মিষ্টিক কবিতা নয়। পদাবলীর মিস্‌টিসিজম্‌ অন্তর্নিহিত নয়—আরোপিত,—বৈষ্ণব পরাতত্ত্ব, সাধকতার ও সাত্ত্বিকতার আবেষ্টনী, শ্রীচৈতন্যের লীলা-বৈচিত্র্য, পদকর্ত্তাদের শুদ্ধসত্ত্ব ভাগবত জীবন ইত্যাদি হইতে সংক্রামিত।

পদাবলীর ভণিতাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রতি পদকর্ত্তাদের মনোভাব সখ্যাত্মক। পদকর্ত্তারা যেন সখা বা সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলারস উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই উপভোগ প্রাকৃত নয়—লোকোত্তর ও দিব্য।

বৈষ্ণব পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলে মনে হয়—এইগুলি যেন একটি রসগোষ্ঠীর রচনা। যাঁহাদের নামের ভণিতা আছে, তাঁহারা যেন উপলক্ষ) মাত্র। কাহার রচনায় কাহার যে ভণিতা আছে তাহা ঠিক নাই। একটা ভণিতা দিতে হয় প্রথা ছিল, তাই যেন দেওয়া হইয়াছে।

* কেবল মধুর রসের পদে নয়, বাৎসল্য রসের পদেও ঐশ্বর্য্য-ভাব-মিশ্রণ পদকর্ত্তারা বর্জ্জন করিয়াছেন। যেখানে ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে—সেখানে পদকর্ত্তারা যশোদার বাৎসল্যেও 'শান্তভাবের' মিশ্রণ ঘটান নাই। গোপাল মুখব্যাদান করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন, যশোদার দশা তখন গীতার অর্জ্জুনের মত হইল না। যশোদা ভাবিলেন—এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! থুতুথুতু দেয় রাণী বসনের দশি। দেখিয়া মায়ের রীত ও না মুখে হাসি। ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান। পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান (ঘনশ্যাম) যশোমতীর বাৎসল্য বিশুদ্ধ বাৎসল্য। ইহাতে ঐশ্বর্য্যভাবের মিশ্রণ নাই—'কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম।'

ব্রজগোপীগণ গোপালের অনেক বিভূতি দেখিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদেরও মনে 'শান্তভাব' জাগে নাই।

বংশী কহই সব ব্রজরমণীগণ আনন্দ সায়রে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে স্তনখিরে ভীগল বাস।

বহু কবি তাঁহাদের রচিত পদে বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের ভণিতাও চালাইয়াছেন। আত্মবিলোপই যে তাঁহাদের সাধনার অঙ্গীভূত। যাঁহার নামে পদ,—ভাষা যদি তাঁহারই হয়—ভাব তাঁহার নিজস্ব নয়। ভাব ঐ রসগোষ্ঠীরই নিজস্ব। এমন কোন ভাব কোন পদে পাওয়া যায় না, যাহা অন্য বহু পদেও নাই। *

শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে।

যদুনন্দন দাস লিখিলেন—

তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিও বান্ধিয়া।

শশিশেখর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছন্দোমাধুর্য্য যোগ করিয়া বলিলেন—

নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে।
হামারি ভুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে।

---

* কতকগুলি অলঙ্কৃত বাক্য বৈষ্ণব কবিদের সাধারণ সম্পত্তির মতই ছিল। কোনটি বিদ্যাপতি হইতে—কোনটি জয়দেব হইতে—কোনটি ভাগবত হইতে—কোনটি অন্য কোন সংস্কৃত কাব্য হইতে—আবার কোনটি প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন হইতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছে। যেমন—

বিদ্যাপতি—আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী।
গোবিন্দদাস—এ তুয়া হাস মরম পরকাশই প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি।
জ্ঞানদাস—না জানিয়ে কিবা অন্তরে সুখে। আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পীরিতি বেকত অঙ্গে। তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গে॥
বিদ্যাপতি—চোর রমণী জনু মনেমনে রোয়ই অম্বরে বদন ছপাই।

শুধু ভাব নয়, এমন একটি অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায় না—যাহা অন্যান্য কবির রচনাতেও পাওয়া যায় না। সামসময়িক কবিদের কাহার রচনা আগে, কাহার পরে, স্থির করা যায় না। যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহাদের পদে পরবর্ত্তী কবির পদাংশ, বাক্য ও অলঙ্কারাদি পরে প্রবেশ করিয়াছে কি না—তাহাও ধরা যায় না। যাঁহারা পরবর্ত্তী তাঁহারা কাহার রচনা হইতে ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও বলা শক্ত। লিপিকর, গায়ক ও সংগ্রহকারগণ এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন ত করেনই নাই—বরং তাঁহারা অনেক প্রকার গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, তাঁহারাই এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, বলিয়াই আমরা তাহার উপভোগের অধিকারী হইয়াছি।

ও-সব কলঙ্ক নয়, অশ্রুচিহ্ন, ভক্ত ছিল তারা,
ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর' পরে প্রেম-অশ্রুধারা।
মুকুতা ছিদ্রিত বটে, সুর-সূত্র পরাইয়া তায়
তাহারা গেঁথেছে হার। তাই রাধাশ্যামের গলায়
দুলিতেছে ঝলিতেছে। অভক্তই ছিদ্র তায় খুঁজে,
কৃতজ্ঞতা-ভরে মোর এ চিন্তায় আঁখি আসে বুজে।

চণ্ডীদাস—চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে।

জ্ঞানদাস—চোরের মা যেন ফুকরিতে নারে। এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥

ভাগবত—কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ।

জয়দেব—মুহুরবলোকিত-মণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতিভাবনশীলা।

বিদ্যাপতি—অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই।

জয়দেবের—হৃদি বিলসতা হারো নায়ং ইত্যাদি শ্লোক হইতেই বিদ্যাপতি—'কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি' পদের ভাব পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে গোবিন্দদাস এইভাব পাইয়াছিলেন। এই ভাবধারা বর্ত্তমান যুগের রাম বসুর 'হর নই হে আমি যুবতী' ইত্যাদি পদ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে যেমন কবি-বিশেষের নিজস্ব কতটুকু, তাঁহাদের ব্যক্তিগত দান কতটুকু, এসব কথা জানিবার একটা কৌতূহল ও আগ্রহ আছে—সে যুগে তাহা ছিল না। সে যুগের রসজ্ঞদের কাছে ব্যক্তির বিশেষ কোন মূল্য ছিল না—রসবস্তু ও গোষ্ঠীর দিকেই তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেন। পদগুলি যেন একটি রসধারার কতকগুলি কলবিম্ব—রসধারার প্রবাহরক্ষাই সেকালের রসিক, ভাবুক ও প্রচারকদের লক্ষ্য ছিল। রসস্রোতের সোনার তরীতে সোনার ফসল তুলিয়া দিয়াই তাঁহারা দায়মুক্ত। কবিগুরুর কথায় "রাতের তারা স্বপ্ন প্রদীপখানি ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায় চলে তার দেয় না ঠিকানা।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল এবং তাঁহাদের কথাগুলিই তাঁহারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়াছেন—কেহ কেহ অনলঙ্কৃত রচনাকে অলঙ্কৃত করিয়া বলিয়াছেন, কেহ কেহ নূতন ভাষায় নূতন ছন্দে বাণীরূপ দিয়াছেন, কেহ কেহ কিছু কিছু নিজস্বতাও যোগ দিয়াছেন। যাঁহার যাহা নিজস্ব ছিল—অনেক সময় তাঁহার সেটুকুকেও রচনায় রূপ দেওয়ার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। প্রচলিত আদর্শ ও বিধিবিধানের অনুগত হইয়াই তাঁহাদের চলিতে হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ যাহা বলেন নাই তাহা বলিতে সাহসও হয় নাই—বলা সঙ্গত নয় বলিয়া হয়ত ধারণাই ছিল। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে সুরসৌষম্য (Harmony) নষ্ট হয়—পাছে গোষ্ঠীধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয়—পাছে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এ আশঙ্কাও ছিল। একটা বিরাট মহাসংকীর্ত্তনে দুই একজন মূল গায়েনের কণ্ঠের সঙ্গে সকলে সুর মিলাইয়া গিয়াছেন।

পদাবলী-সাহিত্যের বহু পদকে গীতি-কবিতা (লিরিক) আখ্যা দেওয়া চলে না। গীতি-কবিতার নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে। কবি তাহাতে নিজের প্রাণের কথাই বলেন—নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও

অভিজ্ঞতাকেই ছন্দে রূপ দেন। পদাবলীর মত একটা গোষ্ঠী, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভাবধারাই তাঁহার উপজীব্য হয় না। অন্ততঃ রচনাশৈলী বা ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটা তাঁহার নিজস্ব থাকে—অন্ধভাবে একটা অনুশাসনের বিধিবদ্ধ রীতি বা ভঙ্গীর অনুসরণ গীতি-কবিতা (লিরিক) নয়।

তাহা ছাড়া, আবৃত্তির জন্যই গীতি-কবিতা রচিত হয়, যদিও তাহাকে গাওয়াও যাইতে পারে। গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতি-কবিতা রচিত হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে, সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ছন্দের মর্য্যাদা সেজন্য অনেকে অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেন নাই। সুরে সুবিধা হয় নাই বলিয়া হ্রস্ব স্বরকে বহু স্থলেই দীর্ঘত্ব এবং দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্বত্ব দান করা হইত।

পদাবলী যেন অর্দ্ধসৃষ্টি—বাকি অর্দ্ধেক সৃষ্টি সম্পাদিত হয় গায়কের কণ্ঠে। কেবল পাঠ করিয়া যে পদ আমরা উপভোগ করি না—কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠে শুনিলে তাহাতে রস পাই। গায়ন-কণ্ঠের আঁখর, * আবেগ ও দরদ তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করে। পাঠ করিয়াই যে পদে আমরা রস পাই—গায়ক-কণ্ঠে সে পদে আমরা অধিকতর রস পাই এবং নব নব ব্যঞ্জনা লাভ করি। যে পদে আমরা ছন্দের অঙ্গহানি লক্ষ্য করি, গায়ক-কণ্ঠে শুনিলে ছন্দের দিক হইতে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইবে। গানের সুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া মনে মনে গাহিয়া পদকর্ত্তারা পদ রচনা করিতেন। তাই বোধ হয় তাঁহাদের কাছে সে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ বলিয়াই মনে হইত।

নূতন কথা নূতন ভঙ্গীতে বলাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যে কথা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা বলিয়াছেন—যে কথা বৈষ্ণবগোষ্ঠীর অভিমত,

* যথাযোগ্য সুসঙ্গত আঁখরে সঙ্গীতের দিক হইতে উৎকর্ষ সাধিত ত হয়ই, কাব্যরস-বিশ্লেষণের দিক হইতেও লাভ হয়। আঁখর দেওয়াই পদাবলীর সুরময় ব্যাখ্যান।

—যে কথা শ্রীচৈতন্যদেবের রসাদর্শের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত এবং যাহা তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ সম্পদ—সেই কথা সুরসঙ্গত রূপে বলিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাধা হইত।

পদগুলি যেন এক একটি শ্লোকের মত, শ্লোকের মতই যেন ইহাদের চতুঃসীমা বিধিবদ্ধ। অনেক পদ শ্রীরূপ, কবিকর্ণপুর ইত্যাদি সংস্কৃত বৈষ্ণব কবিদের বিখ্যাত শ্লোকের ভাবানুবাদ। কোন একটি বিশেষ ভাবকে বিকসিত করিয়া তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়, নির্দ্দিষ্ট সীমা-বন্ধনের মধ্যে সুরের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই পদকর্ত্তারা স্বকীয় ভণিতা দিয়া শেষ করিতেন, গীতি-কবিতার বিকাশ-ধারার অনুসরণ করিতেন না। অনেক সময় কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন না করিয়া তিন চারিটি বিভিন্ন ভাবের অন্তরায় পদটিকে পরিপূর্ণতা দান করিতেন। পদের গঠনে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী থাকায় বাধ্য হইয়া কবিদের ভাবাবেগ সংবরণ করিতে হইয়াছে। যে ভাব দীর্ঘ কবিতায় প্রকাশ্য তাহা একাধিক পদের রূপ ধরিয়াছে। অনেক পদে একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

(গায়কের সহায়তা করাই যেন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কবিগৌরব-লাভ, কবিরূপে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা-সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এই উদ্দেশ্য তাঁহাদের কবি-ধর্ম্ম ও সাধকধর্ম্ম দুইএর পক্ষেই বিরোধী ছিল।)

পদাবলী সাহিত্যে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ কিছু কিছু আছে—কিন্তু অধিকাংশ পদই মধুর রসের। এই পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্যকে সম্পূর্ণ নিগূহিত করা হইয়াছে। তাহার ফলে উহা প্রচলিত আদর্শের আধ্যাত্মিক কিংবা মিষ্টিক কবিতা হইয়া উঠে নাই। সাহিত্যের দিক হইতে তাহাতে বিশেষ লোকসান নাই। কিন্তু এইগুলি সাধারণ আদিরসের কবিতাও নয়। তামিল আলোয়ারদের রস-কবিতা ছাড়া

সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত এবং প্রাদেশিক ভাষায় যত আদিরসের কবিতা আছে, তাহাদের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই এ পার্থক্য উপলব্ধ হইবে।

ইহা শুধু নরনারীর অনুরাগ, সম্ভোগ, মিলন-বিরহ ও অন্যান্য লীলাবিলাস মাত্র নয়—ইহার মধ্যে যে আত্মসত্তা-বিলোপ, সর্ব্বস্ব-বিসর্জ্জন, সর্ব্ব-সংস্কার-মুক্তি, সকল বন্ধন ছেদন, দ্বৈতভাবের বিলোপ, সর্ব্ব বাধাবিঘ্ন-বিজয়, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ইত্যাদির ভাব আছে, তাহা সাধারণ আদিরসের রচনা হইতে এইগুলিকে অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ইহার উপাদান উপকরণ-গুলিকেও একটা লোকোত্তরতার মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। *

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাকৃত প্রেমের সকল বিভাব, অনুভাব ও সকল লীলা-বৈচিত্র্যেরই কথা আছে—কিন্তু সব যেন অপ্রাকৃত বর্ণে

---

* ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের যে অবস্থার বর্ণনা আছে—তাহা সাধারণ আদিরসের বিভাবেরই কথা নয়। বৈষ্ণব-পদাবলী ঐ ভাগবত-বর্ণিত ভাবেরই পূর্ণ পরিণতি। সাধারণ আদিরসের রচনায় যে-শ্রেণীর বিভাব অনুভাবের কথা অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে, বৈষ্ণব-পদাবলীর বিভাব অনুভাবও যেন তাহা হইতে স্বতন্ত্র—অন্ততঃ অপ্রাকৃত। কবিকর্ণপুর তাঁহার অলঙ্কার-কৌস্তুভে বলিয়াছেন—

যথেক্ষুণাং রসোহ্যামঃ পাকাৎ পাকান্তরৈর্গুড়ম্
গুড়োঽপি পাকতঃ পাকে চরমে স্যাৎ সিতোপলা।
অনুরাগঃ স প্রণয়প্রেমভ্যাং পাকমাগতঃ
স্নেহঃ পাকমথোযাতি মহারাগোঽয়মুচ্যতে॥

দেবাদি-রতি-ভাবের ক্রম-পরিণতি-ফলেই হউক, অথবা সাধারণ রতিরই ক্রম-পরিণতির ফলেই হউক, ইক্ষুরস যেমন পাক হইতে পাকান্তর লাভ করিয়া সিতোপলে (মিছরিতে) পরিণত হয়, সেইরূপ রতিভাব মহারাগে বা মহাভাবে ঘনীভূত হয়। তাহাই যেন পদাবলী সাহিত্যের স্থায়ী ভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা পূর্ব্বরাগ রাগ, অনুরাগ, প্রণয়, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি সাধারণ রতিভাব হইতে ক্রমোদ্বর্ত্তনের সোপান-পরম্পরা।

অভিরঞ্জিত। সাধারণ রাগ-রসের কবিতায় যে অনৌচিত্যের জন্য রসাভাস হয়—মহারাগরসের পদাবলীতে তাহা হয় না। যে স্বপতি-নিষ্ঠতার অভাব সাধারণ আদিরসের কবিতায় রসাভাস ঘটায়—তাহাই পদাবলীতে রসের পরিপোষক, অলৌকিক 'সিদ্ধেভূ´ষণমেব নতু দূষণ-মিতি।' যেখানে সবই অপ্রাকৃত, সেখানে প্রেমের অভিব্যক্তি ও গতি-প্রকৃতিতে কোথাও একটা বল্গা বা পরিচ্ছেদ নাই।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কবিতায় নরনারীর প্রেমের প্রাকৃতভাব আমরা যতই লক্ষ্য করি না কেন, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা আমরা যতই ভুলিয়া যাই না কেন, লীলাক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র নয়—মায়া-কলিত-বিগ্রহ, বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ রাখালীয়া বাঁশীর তান মাত্র নয়—একথা ভুলিবার উপায় নাই।

(যে ভাবস্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে এই বৃন্দাবনী-লীলা—তাহার মধ্যে মানবহৃদয় ছাড়া বাস্তব কিছু নাই—রক্তমাংসের একটা মানুষ নাই, সবই মায়াবিগ্রহ। এই স্বপ্নলোকে সকল তরুই কল্পতরু, সকল মৃগই স্বর্ণমৃগ, সকল কুসুমই পারিজাত।* বৈষ্ণব কবিগণ সেই স্বপ্নলোকের স্বপ্নমাধুরীর গান গাহিয়াছেন—স্বপ্নবিহ্বলতাই তাঁহাদের কবিধর্ম। এই স্বপ্ন যাহাতে আঘাত পায় তাহাই রসাভাস। তাঁহারা সেই রসাভাস এড়াইয়া গিয়াছেন।)

ইহা ছাড়া, বৈষ্ণব ঐতিহ্য-ধারা, বৈষ্ণব-দর্শন, বৈষ্ণব-সমাজ, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনমুকুরে মহাভাবের ছায়াপাত, পদকর্ত্তাদের সাধকজীবন, ভাগবতের অনুশাসন—সমস্ত মিলিয়া বৈষ্ণবপদাবলীকে লোকোত্তরতা দান করিয়াছে। আমি রসের কথা বলিতেছি না—

* এ ধাম কালিদাস-বর্ণিত অলকাপুরীর মত।

যত্রোন্মত্ত ভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা হংসশ্রেণী-রচিত-রশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবন শিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা নিত্যজ্যোৎস্না প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

রস লোকোত্তর ছাড়া আর কি হইবে? পদাবলীর কাব্যদেহটাই লোকোত্তর।

পদাবলী-সাহিত্য মধুর রসের রচনা; কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া একটা অলৌকিক কারুণ্যধারা প্রবাহিত। এই কারুণ্য এই শোক-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারের প্রাকৃত কারুণ্য নয়। যে ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচিত, তাহা তো আনন্দধাম—সেখানে প্রাকৃত বেদনার রেখাও নাই। সে ধামে ত "নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগ সাধ্যাৎ। নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয় কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ।" এ কারুণ্য কি তবে মিলন-বাধার কারুণ্য? শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিতে যে শ্রীদামের চোখে জল আসে, গোপালের গায়ে হাত দিতে যশোদা যে কাঁদিয়া ফেলেন, ইহা কোন কারুণ্য? বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীদের মন কোন অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে? ইহা কোন বেদনা? যে কারুণ্যে রাধাশ্যাম 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে'—'নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি'—সে কারুণ্য কিসের? ভাব-সম্মিলনের উল্লাসও গভীর কারুণ্যের নামান্তর।

চীর চন্দন উরে হার না দেলা। সো অব গিরিনদী আঁতর ভেলা॥

'যাহার সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন, হার পর্য্যন্ত রাখি নাই—আজ তাহার সঙ্গে গিরিনদীর ব্যবধান হইয়া গেল।' এই যে হাহাকার, একি যমুনার এপার ওপারের দূরত্বের কথা? জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন যে তৃপ্তিলাভ করে না, লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়াও হৃদয় জুড়ায় না—এ কি সেই অতৃপ্তির বাণী নয়? যে প্রেম সম্ভোগে তৃপ্তি পায় না—বিরহেও দীপ্তি হারায় না, একি সেই প্রেমের কথা নয়? মানবজীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, সসীমতা, অসহায়তা, অস্বস্তি ও অশক্তির বেদনার সুরই সমস্ত পদবলীর মধ্যে আমরা শুনিতে পাই। মানবাত্মার এই Tragedyই পদাবলীর মাথুর। হৃদয়ে যে কোন

মধুর বৃত্তি গভীর, গাঢ় ও অন্তর্গূঢ় হইলেই আমরা পূর্ণের সান্নিধ্য লাভ করি। তখনই আমরা নিজেদের অপূর্ণতাও উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করে, তাহা প্রাকৃত কারুণ্য নয়।

(পদাবলীর মধুর রস সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের শান্ত রসেরই সহোদর। পদাবলী সাহিত্যে যে বংশীধ্বনির আকর্ষণীর কথা বার বার আছে—তাহা ব্রহ্মাণ্ড ভুলাইয়া দিতেছে, নিজের দেহকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত করাইতেছে। যে প্রেমের গভীরতা পদাবলী সাহিত্যের প্রাণ, তাহা কুলশীল মান লজ্জা ভয় গৃহসংসার প্রিয় পরিজন সুখ দুঃখ সমস্তকেই তুচ্ছ, অসার ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলে, সে প্রেমে কোন বাহ্যবস্তুর প্রতি কোন মমতা থাকে না, কোন সংস্কারের বন্ধন থাকে না। ইহাইত বৈরাগ্য। রাধাত ভোগিনী নয়—রাধা যোগিনী। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন 'মহাযোগিনীর পারা'। পদাবলী সাহিত্যে তাই যাহা বাচ্যার্থে শৃঙ্গার রস, তাহাই লক্ষ্যার্থে করুণ রস, আর ব্যঙ্গার্থে শান্ত রসেরই উদ্দীপন করিতেছে। এই রসের ব্যঞ্জনা রাধার সর্ব্বস্ব-সমর্পণ ও আত্ম-বিস্মরণে আছে বলিয়াই ইহা ধর্ম্ম-সাহিত্য, বৈরাগী সর্বত্যাগী কবিদের জীবনের সহিত ইহার সংযোগ ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সাধকজীবনে ইহা সহায়তা করিয়াছে।)

(বৈষ্ণব কবির রূপানুরাগ প্রাকৃত প্রেমের রূপানুরাগের অনেক ঊর্দ্ধে। যে রূপ দেখিয়া রাধা মুগ্ধ, সে রূপ কামনাময় দেহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে নাই—তাহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতিময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—সে রূপ আকাশে মেঘমালায়, বনের তমালশ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, ময়ূরময়ূরীর কণ্ঠের চিক্কণতায় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতেছে। এই Pantheistic attitude বহু কবিতাতেই দেখা যায়। রাধা বলেন, "দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি"।)

কালো জল ঢালতে সই কালা পড়ে মনে।
দিবানিশি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কালো চুল এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কালো অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥

এই রূপ দর্শনের অনুরাগ প্রাকৃত অনুরাগের মত নয়। এই অনুরাগের বিভাবও স্বতন্ত্র। এই অনুরাগের যে বেদনা, তাহা প্রেমার্ত্তিমাত্র নয়। প্রেমার্ত্তির বর্ণনা আমরা সংস্কৃত কাব্যনাট্যে যথেষ্টই পড়িয়াছি। ইহার সঙ্গে তাহার মিল হয় না। কালিদাস এ বেদনার কবি নহেন, চণ্ডীদাস এ বেদনার কবি। চণ্ডীদাস এ বেদনাকে যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাও অভিনব।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশাস সঘন কদম্ব কাননে চায় ॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে ॥
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়নের তারা ॥

এই যে অনুরাগ—এ অনুরাগ 'একের' প্রতি অনুরাগ, কিন্তু সমগ্র জগতের প্রতি—নিজের দেহের প্রতি—নিজের জীবনের প্রতি ..ন্যস্ত বিরাগ। এ অনুরাগ রাধাকে যোগিনী—মহা-বৈরাগিণী করিয়াছে।

এ অনুরাগ অনির্ব্বচনীয়। ইহা যে কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই। জীবনের অন্য কোন অনুরাগের সহিত ইহার এমন কোন মিল নাই যে, ঔপম্যের দ্বারা বুঝানো যাইবে। যে ভাষায় আমরা কথা বলি—সে ভাষায় ইহা প্রকাশ হয় না। কারণ, সে ভাষা কখনও এইরূপ গূঢ় গহনভাব প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই—প্রয়াসও পায়

নাই। এ অনুরাগ এত গভীর যে—তাহার পরিমাণ সংখ্যাদির দ্বারা বুঝানোও চলে না। দেহের বেদনা নয় যে, আকারে ইঙ্গিতে বুঝানো যাইবে। বেদনা মনেরই বটে; কিন্তু ইহাতে মন ত জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় না—কোন অনাস্বাদিত আনন্দের আভাসে মনে শিহরণ জাগে। এ বেদনা অবিমিশ্র বেদনা নয়—'বিষামৃতে একত্র মিলন।' "তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।" কবি শুধু রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

সখীর সহিতে জলেরে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল তাহে কি পরাণ রয়॥

কিন্তু বলা কিছুই হইল না—কারণ, 'সে কথা কহিবার নয়।'—অনুভব করিবার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—কোন কোন ভাগ্যবান্ তাহা অনুভব করিয়াছেন।

সাহিত্য হিসাবে বৈষ্ণব-পদাবলী যে অপূর্ব্ব, সে বিষয়ে অবৈষ্ণব ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদেরও কোন সংশয় নাই। যাঁহারা এ সাহিত্য পড়িবেন, তাঁহাদের অন্ততঃ "বিলাস-কলায় কুতূহল" ইহাতে নিবৃত্ত হইবে। পড়িতে পড়িতে একটা প্রশ্ন মনে জাগিবে—যাঁহারা এই সকল রস-লীলার পদ রচনা করিয়াছেন—তাঁহারা ত কেহই ভোগী গৃহস্থ ছিলেন না। তাঁহারা বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধক-পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের সহিত এই রস-সাহিত্যের মিল কোথায়? পাঠক পড়িতে পড়িতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। কেবল পাঠ ও আলোচনা নয়—তাহার সহিত সুগায়নের কণ্ঠে সে গুলির সঙ্গীতি শুনিতে ইচ্ছা হইবেই। পদাবলী-সাহিত্য প্রধানতঃ সঙ্গীত-সাহিত্য! কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠে উদ্গীত রূপই ঐগুলির যথার্থ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ। এই ভাবে পদাবলী সাহিত্যের অনুশীলনের ফলে 'ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ বিস্তার' হয়—সেইরূপ ঐগুলির লোকোত্তর সার্থকতা স্বতই অনুভূত হইবে।

চিন্তাশীল ভাবুক পাঠক মাত্রেই জানেন—কোন কবিতারই রস-বোধের ক্রিয়া একদিনেই পরিসমাপ্ত হয় না। একই কবিতা কাল, যুগধর্ম্ম, জীবনের গতি-প্রকৃতি ও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব অর্থের দ্যোতনা করে। জীবনের দশা, প্রকৃতি ও গতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে নূতন নূতন সার্থকতার আবিষ্কার করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নানা জনে লবে তার নানা অর্থ টানি। তোমা পানে যায় তার শেষ অর্থ খানি।

বৈষ্ণব কবিতার এই শেষ অর্থখানিও একদিন আবিষ্কৃত হয় সকল পাঠকেরই জীবনে। যদি জীবনের দশা-বিপর্য্যয়ে বা রস-বোধের আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে তাহা না ঘটে, জীবনের অপরাহ্ণে যখন মানুষ স্বতই নূতন দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখিতে থাকে, জীবন ও ভুবন দুইই যখন স্বতই গেরুয়া রঙেই রঞ্জিত হইয়া যায়—তখন তদুপযোগী সার্থকতা (interpretation) আপনিই আবিষ্কৃত হয়। এজন্য ভাগবত-ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না—এজন্য রূপসনাতনের বৈষ্ণব-তত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয় না বা কোন বৈষ্ণব মঠমন্দিরের আবেষ্টনীরও প্রয়োজন হয় না। এই অর্থের আধা দেয়—ঐ পদাবলী—আধা দেয় ঘাত-প্রতিঘাতে সুপরিণত পাঠকের মন। পাঠকের মনকেই ইহার মাতৃভূমি বলিয়া মনে করি। পাঠকের মন যদি তড়াগ-দীর্ঘিকার মত গণ্ডীবদ্ধ হইত, নদীধারার মত অনন্তের পানে ধাবিত না হইত—তাহা হইলে এ প্রত্যাশা করিতাম না। কেবল মানুষের মন নয়—পদাবলীও প্রস্ফুট-পঙ্কজ রাজহংস-লীলা-মুখরিত তড়াগ মাত্র নয়—যুগ যুগ ধরিয়া নদীধারার মত সমুদ্রগামিনী।

সাহিত্য-রথী দীনেশচন্দ্রের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে এখানে অসঙ্গত হইবে না—"এই পদাবলী যেন সমুদ্রমুখী নদীস্রোত—দুইকূলে মনুষ্য-বসতি, ভ্রমর-গুঞ্জিত পুষ্পবন। হাটের কলরব, পথিকের রহস্যালাপ, গোচারণের

মাঠ, শিশুর কাকলী-মুখরিত মাতৃঅঙ্গন, সখাদের খেলাধূলা, নদীর যাত্রা-পথের দুই দিকে কত দৃশ্য।—পার্থিব সকল দৃশ্যই দুইকূলে দেখিতে দেখিতে নৌকায় পান্থ চলিতে থাকিবেন। কিন্তু যখন মোহনায় পৌঁছিবেন, তখন দেখিবেন দূরে অকূল-প্রসারিত অনন্ত সাগর—সেখানে সমস্ত কলকোলাহল থামিয়া গিয়াছে! বৈষ্ণব কবিরা জগতের কোন কথাই বাদ দেন নাই, কিন্তু সকল কথার সঙ্গেই পরমার্থ-কথার যোগ রাখিয়াছেন—এই সাহিত্য-ধারার সর্ব্বত্র এই সমুদ্রের হাওয়া খেলে—এখানে মোহনা বদ্ধ হইয়া নদী কোথাও বিলে পরিণত হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথ যৌবনকালে 'বৈষ্ণব কবিতা'র উপর একটি কবিতা লেখেন—তাহার প্রথম পংক্তি—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?'

এই কবিতায় তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রচলিত আধ্যাত্মিক সার্থকতা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন—এ কি শুধু দেবতার?

প্রশ্নচ্ছলে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য উপজীব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হিসাবে ইহার গৌণ সার্থকতা আছে। ঐ কবিতায় তিনি আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন—কোন আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। সে অর্থের ইঙ্গিত যে একেবারে নাই, তাহা নয়—

এ গীত উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কোন একটি রচনায় অভিসারকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে তাহা বোধগম্য হইবে।

তার বিচ্ছেদের যাত্রা-পথে আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোকে

নিত্যই সে একা, সেইত একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়। আনন্দে যে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি—প্রতীক্ষার বাঁশি
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে এক তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে! (পুনশ্চ, বিচ্ছেদ)

বৈষ্ণব সাহিত্যের রসজ্ঞগণ অভিসারের এইরূপ অর্থ করেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" অল্পে সুখ নাই। এই অল্প কি? যাহা অনিত্য তাহাই অল্প। যাহা নিত্য তাহাই ভূমা। কুলশীল, সমাজ-সংসারের বন্ধন, ধন, জন, গৃহসুখ এ সমস্তই অনিত্য। এ সকলে তন্ময় হইয়া অত্যাসক্ত হইয়া থাকিলে বেদনার অবধি থাকে না। একদিন দারুণ আঘাতে সমস্ত চূর্ণ হইয়া যায়। এ সমস্তে সুখ নাই। যাহা নিত্য, শাশ্বত ও ধ্রুব তাহাকে আশ্রয় করিলে স্বপ্নভঙ্গ হয় না—অক্ষয় দিব্যানন্দ লাভ করা যায়। জীব যখন এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারে তখন তাহার নিত্যের প্রতি প্রেম জন্মে—অনিত্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। নিত্যের মহিমা সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া সে তখন নিত্যের পানে ধাবিত হয়। এই মহিমার কথাই বৈষ্ণব সাহিত্যে রূপ-মুগ্ধতার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শ্যামের পক্ষে যাহা রূপ, নিত্যের পক্ষে তাহাই মহিমা। যে পথে জীব নিত্যের অভিমুখে ধাবিত হয়—সে পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসারের পথ তাই

অতি দুর্গম, বিঘ্নসঙ্কুল। আবার বিনা সাধনায় এ পথে চলিবার বল ও সাহস পাওয়া যায় না। তাই কবি বলিয়াছেন—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ডারি করু পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনি জাগি।

নিত্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে এইভাবে তপস্যা করিতে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পদকর্ত্তারা নিজেদেরও ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ইঁহারা গোষ্ঠ-সঙ্গীতে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং মধুর রসের পদাবলীতে নিজেদের সখীস্থানীয় মনে করিতেন। ভণিতায় ইঁহারা সখীভাবে শ্রীরাধাকে উপদেশ, আশ্বাস, সান্ত্বনা দিয়াছেন এবং কোথাও কোথাও 'অগেয়ানী' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, রাধার প্রতি অবিচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকেও টিটকারি দিয়াছেন। * ইঁহারা জানিতেন—"গোকুলকুল

* "তাম্বূল সম্পুটে লৈয়া কর পুটে এ দাস উদ্ধব ভণে।" "সখীর ইঙ্গিতে চরণ সেবিতে এ দাস বৈষ্ণব যায়।" "নরোত্তম চামর ঢুলায়," "মন্দিরে নিকটে পদতলে শূতলি সহচরী গোবিন্দ দাস" "দুহুঁ তনু মীলল মনের হরিষে। বলরামদাস হেরে রহি একপাশে।" "ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার।" "চরণ পাখাইল শেখর সহচরি আপনগণ লেই সঙ্গে।" "গোপাল দাস কহে ও সহচরি সহ রাধামাধব সেব।" "আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস।" ইত্যাদি ভণিতায় লীলাসম্ভোগ ও পরিচর্য্যার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

"ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো কহি ধায় নরোত্তম দাস।" "যা যা সখিবারহ মধু নিয়ড়ে নাহি আওয়ে। ঐছন শুনি তৈখনে উঠি শশিশেখর ধাওয়ে।" "রাধাবল্লভ আনিতে দুর্লভ সাজল গোবিন্দদাস।" "কহয়ে শেখর শুনহ রাই। নাগর বারতা বুঝিতে যাই॥" "গোবিন্দদাস চলু শ্যাম সমুঝাইতে বাঢ়ত বিরহ বিষাদে।" ইত্যাদি ভণিতায় দৌত্যভাব দ্যোতিত হইয়াছে। আবার—"জানাইতে কানুক সো আশোয়াস। চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥" "কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা।" "কহে শশিশেখর লাজ নাহি যাকর

জরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি। স্তুতিরপি মহামুনীনাং মধুরপদা মাং সখে ন তথা ॥" এসব ভক্তিরসের অতি উচ্চস্তরের কথা। বিশাখা, বৃন্দা ইত্যাদি সখীরা রাধাশ্যামের প্রেমলীলার দৌত্য, সহায়তা (দুহুঁজন প্রেম সহায়) পরিচর্য্যা ইত্যাদির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া যে লীলারস

তা সঞে কিয়ে আর বাত।" "বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব ঝুঝিলুঁ কুলিশক সার।" "চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে কহিতে পরাণ ফাটে। সোনার প্রতিমা ধূলায় লুটায় কুবুজা বসেছে পাটে।" "দেশে কেনা জানে চোরা কালা কানে বিদেশে হয়েছ সাধু।" "জ্ঞানদাস কহ রোয়। তিরিবধ লাগব তোয় ॥" "ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান। বুঝলুঁ তুয় হিয় দারুণ পাষাণ ॥" এই গুলিতে রাধার ব্যথার ব্যথী কবি সখীভাবে শ্যামের প্রতি রোষ ও অভিমান প্রকাশ করিতেছেন।

"চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে। চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥" "গোবিন্দদাস সরস বচনামৃতে পুন বাহুড়ায়ব কাণ।" "কবি বিদ্যাপতি ভান। তুরিতে মিলায়ব কান।" "পামরি গোবিন্দদাস মরি যাওব সাজি আনল তছু তীরে।" "জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি বন্ধুয়া মিলব তোয়।" "চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা বঁধুয়া আপন হৈলে।" 'কবি চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয় বন্ধু তোর নহে অকরুণ।" চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে।" "তিমিরে পন্থ যব হোয়ব সন্দেহ। গোবিন্দদাস সঙ্গে করি লেহ" ইত্যাদি ভণিতায় রাধার সহিত অন্তরঙ্গতা, তাহার প্রতি সহানুভূতি, আশ্বাস ইত্যাদি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। "বংশীবদন অব কত সমুঝায়ব কোপিনী কামিনীঠাম।" "চন্দ্রশেখর কহে অনুচিত মান। রোখে তেজলি কাহে নাগর কান॥" "মনের আগুনি মরহ পুড়িয়া নিভাইবে আর কিসে। শ্যাম জলধর আর না মিলিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥" "যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদ রস আশে। সোঅব নয়ন নীরঘন সীচহ কহতহি গোবিন্দ দাসে॥" "যদুনাথ দাসে কয় এখন উচিত নয় বঁধু পাশে করিতে গমন।" "চণ্ডীদাস কহে ছাড়হ স্বজন তবে সে পাইবে সুখ।" "বৃন্দাবন দাসে কয় করি কিছু অনুনয় প্রাণ নাহি কর বিসর্জ্জন।" "জ্ঞানদাস কহে ধৈরজ ধরহ আপন সুখের কাজে। চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পিরীতি না কহে কথা। পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পিরীতি মিলয়ে তথা।" "সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঁই।" "গোপাল দাস কহে সুচতুর গোরী। নূপুর রসন তুলি মুখপুরী॥" ইত্যাদি ভণিতায় শ্রীমতীর

উপভোগ করিয়াছেন—ইহারাও সেই লীলা-রসেরই আস্বাদ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সখীর সহায়তা এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণসমর্পণম্॥
নর্মাশ্বাসনতঃ পথ্যং হৃদয়োদ্‌ঘাট-পাটবম্।
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা॥
শিক্ষা-সংগমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ;
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশ-প্রেষণং তথা।
নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ॥

—কবিরাজ গোস্বামী লীলাসহচরীরূপা সখীর গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার। সবে এই সখীগণের ইহা অধিকার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী অস্বাদয়।
সখী বিনা এই লীলার নাহি অন্যগতি। সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়।

কবিদের রচনায় অতিরিক্ত ভাবাকুলতা এক এক সময় রসসৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। ধর্ম্মের দিক দিয়া তাহার সার্থকতা থাকিতে পারে—সাহিত্যের দিক দিয়া তাহা ভূষণ নয়, দূষণই। উদাহরণ-স্বরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ, নদীয়া-নাগর ভাব ও নদীয়া-নাগরীদের রূপমুগ্ধতা লইয়া যে ভাব-

প্রতি সখীভাবে ভর্ৎসনা ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক পদে পদকর্ত্তারা বিভিন্ন লীলার নিজেদের সাক্ষী বলিয়া ধন্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরা সহচরী, পামরী, দাসী ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ ও নিজেদের নামের সঙ্গে যোগ দিতেন।

বিহ্বলতা দেখানো হইয়াছে—তাহা অতিরিক্ত। শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের কালো রঙ লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে।‡ কৃষ্ণরাধার প্রতি অঙ্গের উপমা লইয়া কোথাও কোথাও এমনই বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে—যে রাধাশ্যাম অস্থিহীন মাংসপিণ্ড হইয়া পড়িয়াছেন।)

পদকর্ত্তাদের মধ্যে অত্যুক্তি অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই অত্যুক্তি লইয়া যেন রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।

চণ্ডীদাস বলিলেন—

সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। মুখ ফিরাইতে তোর ভয়ে কাঁপে গা।

কবিরঞ্জন বলিলেন—

উর বিনু শেজ পরশ না পাই। চীবহি বিনু তাম্বূল নাহি খাই।

ধরণীদাস বলিলেন—

হিয়ার উপর ধরি কাঁপে পহুঁ থর হরি মুখে মুখ দিয়া ঘন কাঁদে।

জ্ঞানদাস বলিলেন—

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।

বলরাম দাস বলিলেন—

ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়।

রায়শেখর বলিলেন—

মো যদি সিনাও আগিলা ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া বাহু পশারিয়া ধায়।

‡ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদে শ্রীরাধার পয়োধরের সহিত শিলাময় শম্ভুর ও বদনের সহিত চন্দ্রের উপমা লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। প্রেমদাস অঙ্গদর্পণের ছায়া লইয়া অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছেন। চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কালোরঙ লইয়া ভাবাকুলতা দেখাইয়াছেন। চম্পতি আবার মানিনী শ্রীমতীর অভিমান ফুটাইতে লিখিয়াছেন,—"চারু চিবুকপর এক তিল আছিল নিন্দিত মধুপসু শ্যামা। তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল সবহু ছাপায়ল রামা।"

বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া লেয়।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সে দিন থাকে।

গোবিন্দদাস সকলকে ছাড়াইয়া গেলেন—

সিনান দোপর সময়ে জানি। তপ্তপথে গিয়া ঢালয়ে পানি।

তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া তিনি লিখিলেন—

প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান। তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ।

দেখাদেখি অনন্তদাস লিখিলেন—

সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত যাঁহা যাঁহা পদ চিহ্ন শোভে।

এই সকল অত্যুক্তি প্রাকৃত প্রণয়ের পক্ষে অসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু রাধাশ্যামের অপ্রাকৃত অনুরাগের পক্ষে কেহ কোন দিন অসঙ্গত মনে করে নাই। লৌকিক সঙ্গতির মাত্রা-লঙ্ঘনই এখানে প্রণয়কে লোকোত্তর করিতেছে। কবিদের ইহাই ধারণা।

শব্দালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালঙ্কারের আতিশয্য বহু সংস্কৃত কাব্যকে অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা—যাহা হৃদয়-মাধুর্য্যের মহা মহোৎসব, তাহাতে ঐ শ্রেণীর আলঙ্কারিক আতিশয্য আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দুঃখের বিষয় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির অনুকারকদের বহুপদে আমরা ক্লিষ্ট কল্পনার ও শ্লিষ্ট জল্পনার আলঙ্কারিক প্রাধান্য দেখিতে পাই। রূপবর্ণনার ত কথাই নাই—অভিসার, বিহার ইত্যাদি বর্ণনাতেও আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের প্রসাধন অত্যন্ত বেশি। অভিসারের বেশভূষার বর্ণনা একেবারে Conventional. ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বক্রোক্তি ও শ্লেষের অতিশয্য। ইহাদের রচনার প্রত্যেক অঙ্গেই স্বাধীন ভাবাবেগের প্রাবল্য নাই। অনেক অঙ্গ রসশাস্ত্রের অনুশাসনেই পরিকল্পিত। যে সকল অঙ্গে ভাবাবেগের প্রাবল্য

নাই—সমগ্রলীলার কথা যাঁহারা লিখিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা সে সকল অঙ্গ রসাভরণের বদলে ভূষাবরণের দ্বারা পূরণ করিয়াছেন।

তৃণাদপি সুনীচ দীনদাসের দল এই কৃতিত্ব দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই কেন ?

ইহার একটা উত্তর আছে। ভক্ত কবিরা শাব্দিক কলা-চাতুর্য্য-সৃষ্টিকেও উপাসনার বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। গায়কভক্ত যেমন গানের দ্বারা, নটী উপাসিকা বা দেবদাসী যেমন নৃত্যের দ্বারা উপাসনা করে—তাঁহারাও যেমনি ভাষা-ছন্দের মণ্ডন-শিল্পের দ্বারা উপাসনা করিতেন। যাহার যাহা সম্বল ভগবানের উদ্দেশে তাহারই সমর্পণই উপাসনা। দেবতার শিঙার রচনা যেমন পরিচর্য্যার বা উপাসনার অঙ্গ, আলঙ্কারিক চাতুর্য্য-সৃষ্টিও তেমনি সাধনারই অঙ্গ—তাঁহারা মনে করিতেন। যাঁহার এই চাতুর্য্য-সৃষ্টির শক্তি আছে, তিনি যদি শ্যামের সেবায় তাহা অর্পণ না করেন—তাহা হইলে সেবাপরাধ হইবে, ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের ধারণা ছিল।

বৈষ্ণব কবিরা সকলেই যে ভক্ত সাধক ছিলেন—ইহা না-ও হইতে পারে। সে কালে কবি মাত্রেরই রচনার উপজীব্য হইয়াছিল ব্রজলীলা।* মনে

---

* বিদ্যাপতি ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ব্রজলীলা ও গৌরলীলা ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয় ইঁহারা মনে করিতেন, এই দুই লীলা ছাড়া আর সবই অনিত্য॥ অনিত্য বিষয়ে কবিত্ব শক্তির প্রয়োগ শক্তির অপব্যবহার। যাহা অনিত্য তাহাকে আশ্রয় করিলে রচনা স্থায়ীও হইবে না। বোধ হয় বিষয়ান্তরের অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ের চিন্তায় তাঁহারা রসও পাইতেন না। উহা তাঁহাদের চিত্তে রসসৃষ্টির প্রেরণাই দিত না। কিন্তু কবিত্ব যে অনিত্যকেও নিত্যের মহিমা দান করিয়া থাকে, একথা ভাবিবার অবসরও তাঁহাদের ছিল না। কবিত্বশক্তি জীবনের দুর্লভ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাহা শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পণ-যোগ্য। যাহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত তাহা অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। এই ধারণাই বোধ হয় তাঁহারা পোষণ করিতেন।

হইতে পারে—যে সকল কবি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁহারাই এইভাবে আলঙ্কারিক কৃতিত্ব দেখাইতেন। কিন্তু একথাও সত্য নহে। কারণ, প্রকৃত ভক্তকবিও এ কাজ করিয়াছেন। রূপ সনাতন (সংস্কৃতে) ও গোবিন্দদাসের মত ভক্তও তাঁহাদের রচনাগুলিতে আলঙ্কারিক চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

বৃন্দাবনলীলার পদাবলীতে কোন কোন অঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব খুব বেশি নাই। যদি কোন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব পদকর্ত্তাদের উপর বিশিষ্টভাবে থাকে, তবে তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবত। জয়দেব বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের গুরুস্থানীয়—তাঁহার ভাব, ভাষা ও রচনা-ভঙ্গী পদকর্ত্তারা নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও জয়দেবকে তাঁহারা নিজেদের একজন বলিয়া এবং তাঁহার রচনার ভাষা, ভূষা ও রসসম্পদকে নিজেদের সাধারণ সম্পদ্‌ বলিয়াই মনে করিতেন। গোবিন্দদাস, জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্ত্তী, শশিশেখর, রাধামোহন ইত্যাদি দুই চারিজন কবি সংস্কৃত কাব্যের আলঙ্কারিকতা অন্ধ ভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। রাধামোহন তাঁহার পদামৃত-সমুদ্র নামক পদকোষ গ্রন্থে পদাবলীর সংস্কৃতে টীকা করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপূর, জীবগোস্বামী ইত্যাদির সংস্কৃতে রচিত রসশাস্ত্রের অনুশাসন সকলেই মানিয়া চলিতেন!

উদ্ধবসন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথ বল্লভ ইত্যাদি সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থের অনেক শ্লোককে পদকর্ত্তারা বাংলা পদে পরিণত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, সম্ভোগ ইত্যাদির পদাবলীতে ইহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়াছেন। সেই সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রদর্শন, স্বপ্নদর্শন, বন্দিমুখে, সখীমুখে, কিংবা দূতীমুখে গুণাদি শ্রবণ ইত্যাদি পূর্ব্বরাগের যে সকল মামুলি ব্যবস্থা আছে, ইহারা সেগুলিরই অনুসরণ করিয়াছেন। যমুনার স্নানের ঘাটটি ইহাদের নিজস্ব।

বংশীধ্বনির দুর্নিবার আকর্ষণের কথাটি ইহারা ভাগবত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। অভিসারের সাজসজ্জার কথা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতেই গৃহীত। মানের প্রকারভেদ এবং মানভঙ্গের জন্য পাদপতন পর্য্যন্ত সমস্ত উপাচারগুলিই সংস্কৃত রসশাস্ত্রের অনুশাসনে পরিকল্পিত হইয়াছে। পদাবলীর খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জিকা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকাভেদ ও তাহাদের লক্ষণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি অনুসারেই অনুসৃত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী ও কবিকর্ণপূর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত ব্রজলীলার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাহাতে নব নব প্রকরণ যোগ করিয়া নূতনভাবে বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহারা শৃঙ্গার রসের বিভাব, অনুভাব, সহকারী ভাব, উপাচার, উপকরণ ইত্যাদির অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বসম্মত বিশ্লেষণ ও শ্রেণীভাগ করিয়াছিলেন। ইহাদের গ্রন্থে প্রচলিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার, সেই সঙ্গে—নানাবিধ নব নব বিধিবিধান ও অনুশাসন উপনিবদ্ধ হইয়াছে। পদকর্ত্তারা ইহাদের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াই ইহাদের রচনা রসাধিক্যে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল নীলমণির চতুঃষষ্টি রস-বিবৃতির তালিকা দেখিলেই পদাবলীর বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যটি বুঝা যাইবে।

পদাবলী সাহিত্যে যে সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গাররসলীলা বর্ণনার প্রসঙ্গে অশ্লীলতা দেখা যায় তাহা সংস্কৃত সাহিত্যেরই অনুসরণ। কামলীলা-বৈচিত্র্য কবিরা প্রাকৃত জীবন হইতেই হয়ত পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত না থাকিলে কবিরা কিছুতেই ইহাকে এত প্রাধান্য দিতে পারিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার কথা থাকিলেও কামলীলার বর্ণনা নাই। পদকর্ত্তারা সংস্কৃত কবিগণ, জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাসের অনুসরণেই কামলীলাকে এত প্রাধান্য দিয়াছেন। এ দেশের সাহিত্যিক বিচারে ইহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু পদাবলী

ত কেবল সাহিত্য নয়—ইহাতে কাব্য, সঙ্গীত, ধর্ম্ম ও দর্শনের মিলন হইয়াছে।)

কিন্তু ইহার মূলে দার্শনিক তথ্য কি আছে? দর্শনের তিন শাখার—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের কোন দিক হইতে ইহা কোন পরাতত্ত্বের অঙ্গীভূত হইতে পারে? বজ্রযানী বৌদ্ধদের মহাসুখবাদের সহিত ইহার কি কোন যোগ আছে? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কামকেলির কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন নাই। এই অশ্লীলতা কাব্যের অঙ্গ যদিই বা হয়, ধর্ম্মের অঙ্গ হয় কি করিয়া? শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে যে মহাভাবের ও দিব্যোল্লাসের বিকাশ হইয়াছিল তাহার মধ্যে আত্মস্মৃতির গাঢ়তা ও বিরহের গূঢ়তাই অভিব্যক্ত হইয়াছিল—তাহার মধ্যে লালসার লেশ ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব রমণীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেন না। চৈতন্যদেবের পার্যদগণের জীবনও ছিল গঙ্গাজলের মত পবিত্র। আবার শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান ইত্যাদির ভাবেও অনুপ্রাণিত হইতেন—"যঃ কৌমারহরঃ স এব বরঃ তা এব চৈত্রক্ষপাঃ" ইত্যাদি শ্লোকও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইত—তিনি অনেক সময় ভাবাবেশে গদাধরকে রাধা বলিয়া মনে করিতেন—দানলীলা, মানলীলা ইত্যাদির অভিনয়ও করিতেন, কিন্তু সে সকলের সার্থকতা (Interpretation) অন্যরূপ।

তারপর ক্রমে যখন তাঁহার ভাবজীবনে কৃষ্ণভাব স্তিমিত হইয়া রাধাভাবের প্রাধান্য হইল, তখন ত তাঁহার মুখে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' ছাড়া অন্য বাণী ছিল না। বিরহিণী প্রোষিতভর্ত্তৃকা রাধিকার ভাবেই তিনি বিভাবিত হইয়া থাকিতেন।--বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররস তখন পরিপূর্ণ করুণরসে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবন হইতে সাহিত্যে কামলীলার প্রাধান্য নিশ্চয়ই সঞ্চারিত হয় নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের পদাবলীতে ও দ্বিতীয় (?) চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা রাগ-রস পাই

বটে, কামলীলার বর্ণনা পাই না। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর পদাবলীর মধ্যে কামলীলার বাড়াবাড়ি চলিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক পদকর্তারা খাঁটি বাংলায় পদ রচনা করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে প্রভূত পরিমাণে ব্রজবুলিতে পদ রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রজবুলিতে পদ রচনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রভাবও সঞ্চারিত হয়। তাহার সঙ্গেই কামলীলার বর্ণনা চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নরহরির নদীয়া-নাগরী ভাবের বিকৃত পরিণতি ও সহজিয়াদের প্রভাবও ইহার জন্য দায়ী।

শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনা যতই কামগন্ধহীন হউক, রাগলীলাত্মক সাহিত্য তিনি উপভোগ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে, তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন (?), জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ইত্যাদি উপভোগ করিতেন। তিনি উপভোগ করিতেন বলিয়াই হয়ত রূপগোস্বামী ও কবিকর্ণপূর তাঁহাদের গ্রন্থে রাগলীলাকে সসমাদরে স্থান দিয়াছেন। অনেক বৈষ্ণব কবি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী বৈরাগী হইয়াও যেভাবে রাগলীলার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ‡

---

‡ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

সত্য ক'রে বল মোরে হে বৈষ্ণব কবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে? বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে?
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হ'তে?

বৈষ্ণব কবিরা যে গভীর কামনাঘন প্রেমের কথা লিখিয়াছেন তাহা কেবল কি

কবিদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যখন এত বেশি প্রশ্রয় দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন গভীর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহার মূলে হয়ত দার্শনিক সত্যও কিছু নিহিত আছে। সাহিত্যের দিক হইতে যাঁহারা বলেন—কামলীলার প্রয়োজন আছে, তাঁহাদের কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই—সম্ভোগ রসের কোন পদই উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় নাই—উহাতে কেবল আলঙ্কারিক কৃতিত্ব ও চাতুর্য্যই দেখানো হইয়াছে—উহা সাহিত্য হইলেও গতানুগতিক ধারার নির্জীব সাহিত্য

অলঙ্কার শাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের অনুশাসনের অনুবর্ত্তন মাত্র? তাঁহারা কি নিজেদের দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত আবেদন হইতে রাগমাধুরীর মর্ম্ম উপলব্ধি করেন নাই? নিশ্চয়ই তাহা করিয়াছেন—তাহা না হইলে বৈষ্ণব পদাবলী এত জীবন্ত, জ্বলন্ত ও রসোচ্ছল হইয়া উঠিত না, নির্জীব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি মাত্র হইত। তাঁহাদের জীবন-সরোবরে যে পদ্ম বিকসিত হইয়াছে, কবিরা তাহাই দিয়া দেবতার পূজা করিয়াছেন—কান্ত-প্রেমকেই তাঁহারা রাধাকান্ত-প্রেমে পরিণত করিয়াছেন।

"প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি তাই দিই দেবতারে"—কবির এ বাক্য নিশ্চয়ই সত্য।

এখন কথা হইবে—বৈষ্ণব কবিদের অনেকেই ছিলেন সংসার-ত্যাগী বৈরাগী—অনেকের কান্তাসংসর্গ ঘটেই নাই। তাঁহারা কোথায় পাইলেন এই মধুর রসের আস্বাদন? তাঁহারা কি ভাব সম্মেলন হইতেই ইহা পাইয়াছিলেন? রাধাভাবে বিভাবিত তন্ময়তা হইতে পাইয়াছিলেন?

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাধকগণ বিশেষতঃ সহজিয়া সাধকগণ একথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—এ রসের আস্বাদন স্বকীয়া কান্তা সংসর্গেও পাওয়া যায় না—পরকীয়া কান্তা সংসর্গ অন্ততঃ পরকীয়ার প্রীতির প্রেরণা চাই। তাই তাঁহারা বড় বড় কবিদের সম্বন্ধে পরকীয়া রসসঙ্গিনী আবিষ্কার করিয়াছেন। মুকুন্দদাস গোস্বামী সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কোন কোন কবিতা-সৃষ্টির মূলে পরকীয়া রসসঙ্গিনীর প্রেরণার উল্লেখ করিয়া গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। গল্পগুলির মূল্য যাহাই হউক প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন—এই প্রেম-কবিতার মূল গোলোকে নয়—ভূলোকের সেই আঙিনায় 'যাহার কোণে ঘন ঘটাময়ী রজনীতে বঁধুয়া প্রিয়ার দর্শন আশায় ভিজিতে থাকে।'

মাত্র। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির ক্রমবিকাশের দিক হইতে অথবা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তথ্যের দিক হইতে সত্যই কি উহা অপরিহার্য্য? যে আনন্দ উপভোগের জন্য ভগবানের নর-বিগ্রহ-ধারণ ও হ্লাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি, যৌন সম্ভোগের আনন্দই কি তাহার চূড়ান্ত? উহা বাদ দিলে কি আত্মানন্দের পূর্ণস্বাদ সম্ভব নয়?

স্থূল দৈহিক জীবনের পক্ষে যৌন আনন্দই নিবিড়তম আনন্দ সন্দেহ নাই। ভাব-বিগ্রহের পক্ষেও কি তাহাই? কৃষ্ণ-বিরহের গভীরতা দেখাইবার জন্যই কি সম্ভোগের চূড়ান্ত বর্ণনা? উজ্জ্বল রসের চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বব্যবধান বিলোপ করিয়া তাদাত্ম্য বা অভেদাত্মকতা দেখাইবার জন্যই অথবা ব্রহ্মাস্বাদের প্রতিবিম্বন দেখাইবার জন্য কি এই ব্যবস্থা? অথবা রাগরসের স্বাভাবিক পরিণতি যৌন সম্ভোগ বলিয়াই কি এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে? ইহা কি কবিদের পক্ষ হইতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাকে সংযম করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছায় পুষ্পাঞ্জলি? ইহা কি সেই সুপর্ণের কথা যে সুপর্ণ শুধু বসিয়া বসিয়া উপভোগ করিবে, আর একটি সুপর্ণ পিপ্পলী ফল ভক্ষণ করিবে? আমরা এইটুকু বুঝি শ্রীচৈতন্যদেব যে সাহিত্য আস্বাদন করিয়াছেন—বৈষ্ণবাচার্যগণ যে সাহিত্যকে সমাদর করিয়াছেন ভক্তগণ যাহা শ্রবণ করিয়া যুগে যুগে অশ্রুপাত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে গভীর রহস্যময় তথ্য নিহিত আছে। ‡

‡ ভাবলোকের দেহাতীত সম্মিলনে যে প্রেমের পরিণতি—সে প্রেম নয়নরাগে জন্মলাভ করিয়া যদি স্তরে স্তরে অভ্যুন্নত হইতে হইতে অদ্বৈতানন্দে পৌঁছিয়া থাকে এবং কবিরা যদি সেই অনুন্নত স্তরগুলিকেও বাণীরূপ দান করিয়া থাকেন—তবে দোষ দেওয়া যায় না। মানস মিলনের কথা কবিরা নানাভাবেই বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—রাধার চিত্তের অদ্বৈত বুদ্ধি থাকার জন্য নিত্যমিলনের কোন দিন বাধা ঘটে নাই।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্ম্মল নহে কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা শোভা পাইয়া গিয়াছে। ** বৈষ্ণবকাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ রাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্য্যও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না—সমগ্রের প্রভাবে তাহার দূষণীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণবকাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে। তথাপি (সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর ও উন্নত ভাবের সৃষ্টি না হয় সে হয় সমস্তটা ভাল করিয়া পড়ে নাই নয় সে কাব্যরসের রসিক নয়।")

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

—মনোলোক খুঁজিলে আর মাথুরের ভয় থাকে না। যেখানে দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ—সেখানে দেহজ আকর্ষণই বা কোথা? বলরাম দাস বলিয়াছেন—

("তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।" রবীন্দ্রনাথ ইহার অর্থ করিয়াছেন—প্রিয়বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু, তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে।—সেই জন্য তাহাকে ভিতরে ফিরিয়া পাইবার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাকেই বৈষ্ণব কবিরা যৌন আকর্ষণের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই আকাঙ্ক্ষা ও যৌন আকর্ষণের মধ্যে অনুভাবগত সাম্য আছে। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম।")

যাহাই হউক, সাধনার অত্যুচ্চ স্তরে আরোহণ না করিলে হয়ত ইহার মর্ম্ম উপলব্ধ হইবে না। অথচ সাহিত্যের মধ্য দিয়া পরিবেষিত হইয়া ইহাকে সমগ্র দেশের সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য করিয়া তোলা হইয়াছে। সাধারণ লোক বিশেষতঃ অবৈষ্ণবগণ যে ইহার মর্য্যাদা বুঝিবে না—তাহাদের কাছে ইহা কামসাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়—ধর্ম্মের সঙ্গে ইহাকে মিলাইতে না পারিয়া বহু লোকে যে রহস্যের গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহার যে অপব্যবহার হইবে—সম্প্রদায়-বিশেষকে যে ইহা ভোগলোলুপ করিয়া তুলিবে—এ সকল কথা তাঁহারা ভাবেন নাই। একমাত্র সতর্কতা তাঁহারা এই অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, কামলীলার পদগুলির ভাষাকে অতিরিক্ত অলঙ্কৃত, পুষ্পিত, বক্রোক্তিময় ও পণ্ডিতজনের আস্বাদ্য করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে সাধারণ লোকে পড়িয়া বুঝিতে পারে না।

বৃন্দাবনের কামলীলা বৈচিত্র্যের মূলে কোন দার্শনিক তত্ত্ব না থাকিলেও বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মের মূলে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব যে নিহিত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রেমধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি মাত্র নয়। যে ধর্ম্মের ধারায় শ্রীচৈতন্য বন্যা বহাইয়াছেন সে ধারা জয়দেব, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল এবং দক্ষিণাপথের দার্শনিক তত্ত্বের নীলগিরি হইতেই ইহার জন্ম। যে সকল দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও দুর্দান্ত সন্ন্যাসী তাঁহাদের বৈদিক আচার ও বৈদান্তিক ধর্ম্ম মত ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ ও অলৌকিক শক্তি দেখিয়াই প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন একথা মনে হয় না। প্রেমধর্ম্মের মূলে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে—সে তত্ত্বও যুক্তিগর্ভ বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচরদের মধ্যে সে তত্ত্ব বুঝাইবার লোকের অভাব ছিল না। এই তত্ত্ব রূপ, জীব

গোস্বামী, কবি কর্ণপূরের সংস্কৃত গ্রন্থে ও কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উপনিবদ্ধ আছে ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গীতোচ্ছ্বসিত কাব্যরূপ পদাবলী-সাহিত্য। ঐ তত্ত্ব সমগ্র পদাবলীর মধ্যে ফল্গুধারার মত নিগূহিত হইয়া আছে। পাছে ঐ তত্ত্ব মাধুর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রসভঙ্গ বা রসাভাস ঘটায়—সেজন্য তাহাকে কোথাও প্রকট হইতে দেওয়া হয় নাই। অথচ ঐ তত্ত্বই পদাবলীকে লোকোত্তরতা দান করিয়াছে এবং মিষ্টিক কবিতায় পরিণত করিয়াছে। বৈষ্ণব মতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে সম্পর্ক, বৈষ্ণব প্রেম-তত্ত্বের সহিত মহাজনদের প্রত্যেক পদের সেই সম্পর্ক। কাব্যরসের দিক হইতে প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র—আধ্যাত্মিক দিক হইতে প্রত্যেক পদের মর্ম্ম ঐ লীলাতত্ত্বের সহিত অভিন্ন। সমগ্র পদাবলী একখানি আধ্যাত্মিক মহাকাব্য—ইহার নায়ক স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা। ‡

যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাধা বহন করেন, যে প্রেমে নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে গোরু চরাইতে গোঠে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করেন না, যে প্রেমে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়া শাসন করেন, যে প্রেমে শ্রীদাম কৃষ্ণের কাঁধে চড়িয়া খেলার পরাজয়ের দণ্ড বিধান করেন এবং উচ্ছিষ্ট খাওয়ান, যে প্রেমে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে চোর, শঠ, লম্পট, শতঘরিয়া, গোপগোঙার ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না—

‡ ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ লইয়া রসের সহজ ক্রম অনুসারে এমন করিয়া পালা সাজানো হইয়াছে। যাহাতে এক একটী পালা এক একখানি কাব্যে পরিণত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সব পালাগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে, সে সকলগ্রন্থ এক একখানি মহাকাব্যের রূপ ধরিয়াছে। এক-ভাবনিষ্ঠ ব্রজভাবে বিভাবিত অভিন্নহৃদয় কবিদের সমবেত প্রয়াসে এই মহাকাব্যের সৃষ্টি। ইঁহার রচয়িতা একজন কবি নহেন—একটি যুগের কবিগোষ্ঠী। পদকল্পতরু (বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত) এইরূপ একখানি মহাকাব্য।

আর শ্রীরাধা যে প্রেমে মানিনী হইয়া পায়ে ধরাইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কৃতি দেয়—সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমই বৈষ্ণব কবিদের একমাত্র অবলম্বন। কবিদের রচনার বিষয়বস্তু আর কিছু নাই। কাব্যের দিক হইতে ইহা আত্মভোলা প্রেম,—সাধনার দিক হইতে ইহাই রাগানুরাগা ভক্তি। কাব্য ও সঙ্গীতরসের সহিত আধ্যাত্মিক সাধনার এমন একাত্মকতা জগতের কোন সাহিত্যে নাই। পদাবলী-সাহিত্যে রাগানুগা ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। *

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।

* পদকর্ত্তাদের কেহ কেহ নিত্যানন্দ শাখার ভক্তদের মত সখ্য রসের সাধক, কেহ কেহ অদ্বৈত শাখার সাধকগণের মত দাস্যরসের সাধক, কেহ কেহ মাধবেন্দ্রপুরী বা রঙ্গপুরীর অনুসরণে বাৎসল্য ভাবের সাধক ছিলেন। অধিকাংশই মধুর ভাবের উপাসক। এই মধুরভাব দুই ভাবে অভিব্যক্ত—(১) সখীভাবে, (২) মঞ্জরীভাবে। মঞ্জরীভাব মুকুলিত সখীভাব। মঞ্জরীরা সখীদের ইঙ্গিত পাইলে রাধাকৃষ্ণের মিলনক্ষেত্রে সেবা করিবে, তাম্বূল যোগাইবে, চামর ঢুলাইবে। এইরূপ পরিকল্পনা ছিল সাধকদের রসজীবনে। পদকর্ত্তারা নিজেরা সখী বা মঞ্জরীভাবে বিভাবিত। রাধাভাবের সাধনা কেবল শ্রীচৈতন্যের। যে ভাবেরই সাধক হউন না— রাগানুগা ভক্তির যে কোন স্তরের পদ ইঁহারা রচনা করিতেন।

যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে গভীর পরাতত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াই পদাবলীর প্রেমলীলা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ হইলেও, চিরপ্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রতিকূল হইলেও এদেশের লোকের কাছে কোন দিন অসঙ্গত বা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় নাই। সাধারণ লোকের ঐ পরাতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান নাই—কিন্তু এদেশের লোকের মন বৈষ্ণব সাধনার পরিবেশমণ্ডলে পরাতত্ত্বের বিচ্ছুরিত ছটায় অভিরঞ্জিত। তাই তাহারা অকুণ্ঠিত ও নির্ম্মলচিত্তে পরম ভক্তিভরে ঐ অবৈধ (?) প্রেমলীলার আধ্যাত্মিকতা আস্বাদন করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

—"কৃষ্ণরাধার বিরহ-মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বা মনুসংহিতা নাই।—ইহার আগাগোড়াই রাখালী কাণ্ড। যেখানে সমাজ বলবান্ সেখানে বৃন্দাবনের সঙ্গে মথুরার রাজ্য পালনের একাকার হওয়া অসঙ্গত। কিন্তু কৃষ্ণরাধার কাহিনী যেভাবে লোকে বিরাজ করিতেছে, সেখানে ইহার কোন কৈফেয়ৎ আবশ্যক করে না। এমন কি সেখানে চিরপ্রচলিত সমস্ত সমাজপ্রথাকে অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনের রাখালবৃত্তি মথুরার রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদের দেশে যেখানে কর্ম্মবিভাগ, শাস্ত্রশাসন এবং এবং সামাজিক উচ্চনীচতায় ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল, সেখানে কৃষ্ণরাধার প্রেম-কাহিনীতে এইপ্রকার আচার-বিরুদ্ধ বন্ধনহীনতা ও স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।"

এই যে চিরাভ্যাস ইহাই বৈষ্ণব পরাতত্ত্ব-সাধনার পরিবেষ্টনীর মধ্যে অজ্ঞাতসারে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত।

বৈষ্ণবকবিতার রসাস্বাদন, পদাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ববিশ্লেষণ, পদাবলী-কীর্তন, কীর্তন-শ্রবণ ও রসাস্বাদন, বৈষ্ণবকবিতা-রচনা ইত্যাদির কোনটিই বৈষ্ণব প্রেমের সাধনা নয়। এইগুলি চিত্ত-শুদ্ধির সহায়তা করে মাত্র। যাঁহারা ব্রজলীলাকে জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধের রূপক মাত্র মনে করেন—তাঁহারা সাহিত্য রসও ভাল করিয়া আস্বাদন করেন না, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির সহায়তাও হয় না। প্রকৃত প্রেমসাধনা পদাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবের দ্বারা বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় বিভাবিত হওয়া। নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুবল, বৃন্দা বা চন্দ্রাবলী—যে কোন লীলা সহায়কের ভাবে আপনাকে তদ্‌গত করাই সাধনা। রাধাভাবে বিভাবিত হওয়াই চরম। ইহা কেবল শ্রীচৈতন্যের জীবনে সম্ভব হইয়াছিল—চন্দ্রাবলী, বৃন্দা, বিশাখার ভাবও রাধাভাবের কাছাকাছি। তবে চন্দ্রাবলী রুক্মিণীর মত চিরদিন দক্ষিণ-স্বভাবা, সত্যভামার মত বামা হইতে পারিতেন না। তাঁহার প্রেমের "অহেরিব গতিঃ" ছিল না। সেজন্য চন্দ্রাবলীভাব রাধাভাবের এক স্তর নিম্নে। পুরীধামের শ্রীচৈতন্যই আদর্শ। আদর্শে কে পহুঁছাইবে? বৈষ্ণবের প্রেম নিষ্কাম, অহৈতুক, তাহার কিছুই প্রার্থনীয় নাই—মোক্ষমুক্তিও নয়। কৃষ্ণ-প্রেমই পরম পুরুষার্থ—'পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন।' বৈষ্ণব সাধকের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি একেবারেই থাকে না। ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি থাকিলে নিষ্কামতাও থাকে না, প্রেমের গাঢ়তা সম্ভব হয় না, ভীতিসঙ্কোচ ইত্যাদি প্রেম-বিরোধী ভাব আসিয়া পড়ে।। তাই "কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে উদূখলে বাঁধে। কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কাঁধে॥" সন্তানের সুখেই মায়ের সুখ। মা যে সন্তানকে কতরূপে পরিচর্য্যা করে—তাহাতে মায়ের কি কোন স্বার্থ বা অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যশোদার বাৎসল্যভাব সম্বন্ধে

যে কথা অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহাই অহৈতুকী রাগানুগা ভক্তি।

লীলাতত্ত্ব বুঝিতে পারা বা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো বিশেষ কঠিন নয়, নিজেকে লীলার অঙ্গীভূত মনে করিয়া লীলাসহচর বা সহচরীরূপে সাধনাই শক্ত। লীলাতত্ত্ব বুঝিয়াই অনেকের বৈষ্ণব সাধক বলিয়া অভিমান জন্মে। যিনি লীলাতত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা করেন—তাঁহাকেও বৈষ্ণব সাধক বলিয়া আমরা মনে করি—এ ধারণা ভ্রান্ত। রূপ, সনাতন, নরহরি সরকার ঠাকুর, মুরারিগুপ্ত, লোচন দাস, নরোত্তম ইত্যাদি সাধকের মত যাঁহারা ভাব-বৃন্দাবনে লীলার সাথী হইতে পারিয়াছেন তাঁহারাই আদর্শ বৈষ্ণব। পদাবলী-রচয়িতা মাত্রই সে শ্রেণীর সাধক নহেন—অন্যে পরে কা কথা।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি।

"শাক্তধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্ম্মে এই ভেদকে নিত্য-মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেম-প্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলাসাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে দূর হইল, অলংকার শাস্ত্রের পাষাণ-বন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান

ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সংগীত প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সংগীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকাব্যধারাকেই বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান ঝরণাধারা বলিয়াছেন—এই ধারার সঙ্গে অন্যান্য নানা ধারা মিশিয়া সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। "বৈষ্ণব কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু নানাদিক হইতে নানাধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না।"

নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া বৈষ্ণব কবিতার ঝরণা ধারায় মিলিত হইয়াছে। তাহার ফলেই "আজ বাংলায় গদ্যে পদ্যে সম্মিলিত সাহিত্য বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

মঙ্গলকাব্য

দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য যে কাব্য রচিত হইত, তাহার নাম মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণবসাহিত্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে এই শ্রেণীর কাব্য আমাদের দেশে রচিত হইতেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট তেমন কোন মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নাই।

বৈষ্ণবধর্মের প্রেমবন্যায় দেবদেবীর ঘটপট সব ভাসিয়া গিয়াছিল। নূতন ধর্মমতের এবং তদনুগত সাহিত্যের আবির্ভাবে মঙ্গলকাব্যের ধারা বিলুপ্ত না হইলেও স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক ধর্মও ভক্তিমূলক। বৈষ্ণবধর্মও ভক্তিমূলক, কিন্তু এই দুই শ্রেণীর ভক্তিতে প্রভেদ প্রচুর। * বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তি নিষ্কাম, উহাতে পুরুষার্থ বা মোক্ষ পর্যন্ত প্রার্থনীয় নয়, প্রেমই পুরুষার্থ-শিরোমণি, ভক্তিতেই ভক্তির শেষ। লৌকিক শক্তি-ধর্মের ভক্তি সকাম। ইহ সংসারের সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পরত্রের স্বর্গসুখ ইহাতে প্রার্থনীয়। বৈষ্ণব ভক্তির আদর্শ ঢের বেশি উচ্চগ্রামের। স্বভাবতই এই আদর্শের সাহিত্য-ধারা লৌকিক ধর্মসাহিত্য-ধারাকে পরাভূত করিয়াছিল। দেশের সাহিত্য ধর্ম-

---

* বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি। সে শক্তি বলরূপিণী নয়—প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈত-বিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ—আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্য বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই—তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে। এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার নিয়ত মিলনরূপ প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের নিশ্চিত সম্বন্ধ। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কেহ বা পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ)

মূলক হইলেও ইহা জনসাধারণকে আনন্দও দিয়াছে। রাত্রি জাগিয়া বাঙ্গালী চণ্ডীমনসার গান শুনিত বলিয়া বৃন্দাবনদাস নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী যে রাত জাগিয়া এই গান শুনিত এবং ইহা লইয়া মাতিয়া থাকিত, তাহা কেবল ধর্ম্মের জন্য নয়, আনন্দের জন্যও বটে। সেদিক হইতেও বৈষ্ণব সাহিত্য দেশের লোককে গভীরতর ও বিশুদ্ধতর আনন্দদান করিয়াছে। রসকলা-সম্মত পদাবলীকীর্ত্তন পুরজনপদের নাট-মন্দির, দোলতলা, বারোয়ারি-তলাগুলিকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরে কালাপাহাড় বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়াছিল। যে সকল দেবদেবীকে বাঙ্গালীরা জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া মনে করিত—তাঁহারা কেহই আত্মরক্ষাও করিতে পারেন নাই—আততায়ীর দণ্ডবিধান করিতেও পারেন নাই। ইহাতে লোকের মনের মন্দিরেও তাঁহাদের আসন অটল ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে দেশের লোকের চিত্ত দেবদেবীর মন্দির হইতে বৈষ্ণবদের আশ্রমে ও আখড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহাই বা কে বলিল?

যাহাই হউক, লোকের চিত্তের সকাম ভক্তিভাব বিলুপ্ত হইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্ম লোকের মনের কোন ঐহিক প্রার্থনা পূরণ করিতে পারে না। যাহারা ঐহিক সুখসম্পদ বর্জ্জন করিয়াছিল—তাঁহারা তাহার অর্জ্জনের কোন পথও বলিয়া দেন নাই। কেমন করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে সে কথা তাঁহারা বলেন নাই—কেমন করিয়া ভক্তি লাভ করিতে হইবে তাহার জন্যই তাঁহাদের সকল উপদেশ। তাঁহাদের আবেদন ছিল—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
"মম জন্ম জন্মনীশ্বরে ভবতাং ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

লোকের কিন্তু দুঃখের অবধি ছিল ন। কোথায় তাহার প্রতিকার? মানুষ

ত দৈবীশক্তির হাতের পুতুল। তাহার পৌরুষ কতটুকু প্রতিকার করিতে পারে? দেশের রাজার কাছে কোন আবেদন নিবেদন বৃথা। রাজার জাতির মনোভাব হিন্দুপ্রজার প্রতি কিরূপ ছিল—বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণে ও জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন কাব্যে, এবং কবিকঙ্কণ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহার জীবনে। রাজার জাতির নির্য্যাতনকে হিন্দুরা দৈবনির্য্যাতনেরই অঙ্গ মনে করিত। কাজেই দেবদেবীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? এই মনোভাব হইতেই মঙ্গল-কাব্যের পুনরভ্যুদয়।

মঠমন্দিরে ও মনোমন্দিরে দেববিগ্রহ চূর্ণ হওয়ায় যাহাদের প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা ও উপজীবিকার উপায়ও চূর্ণ হইয়াছিল, তাহারাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা নূতন করিয়া অলীক ভয়ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার জাল বুনিয়া দেবতাদের নবকলেবর দানের জন্য নিশ্চয়ই সচেষ্ট হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, বৈষ্ণবসমাজের সঙ্গে যখন অবৈষ্ণব সমাজের দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, যখন বৈষ্ণবগণ নিত্য নব মহোৎসবে মাতিয়া খোলকরতালের ধ্বনিতে দেশ মুখরিত করিয়া তুলিল, তখন অবৈষ্ণবগণ তাহাদের ঢাকঢোল ঘাড়ে করিয়া ঐ ধ্বনিকে ডুবাইয়া দিতে যে চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ফলে, দেবদেবীর পূজা আবার মহাসমারোহে সম্পাদিত হইতে লাগিল। আকবর শাহের বঙ্গাধিকারের পর বহুকাল পর্য্যন্ত আর কোন কালাপাহাড়ের উপদ্রব হইতে পায় নাই। দেবতারা নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নিজ নিজ পূজাপ্রচারের জন্য কবিদের স্বপ্ন দিতে লাগিলেন। তাঁহারা গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও দেবপুত্রগণকে শাপ দিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। মঙ্গলকাব্যের যুগ ফিরিয়া আসিল।

কোন দেবতাবিশেষের মহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার পূজাপ্রচারই মঙ্গল-কাব্য রচনার প্রধান উপজীব্য। এইগুলি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ঠিক বিপরীত ধারার কাব্যপ্রবাহ। চৈতন্য-চরিত সাহিত্যের সঙ্গে বরং ইহার কিছু

মিল আছে, চৈতন্যচরিত-গ্রন্থগুলি চৈতন্যের মহিমা প্রচারের জন্য রচিত। এইগুলির সাধারণ নাম সেজন্য চৈতন্যমঙ্গল। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চৈতন্যও আর একটি দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ দেবতাদের বন্দনার সঙ্গে চৈতন্যেরও বন্দনা গাহিয়াছেন।

✓ পদাবলী গীতিরসাত্মক ও ভাবতন্ত্রীয়। মঙ্গলকাব্যও গাওয়া হইত বটে কিন্তু উহা বর্ণনাত্মক এবং বস্তুতন্ত্রীয়। আর মঙ্গলকাব্যের গান স্বরে আবৃত্তিরই মত। পদাবলীর উদ্দিষ্ট,— রসসৃষ্টি। এই রসসৃষ্টিই পদকর্ত্তাদের সাধনভজনের অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য দেবতাবিশেষে ভক্তির সৃষ্টি—রসসৃষ্টি গৌণ। পদাবলীর আদর্শ নিষ্কাম প্রেমধর্ম্ম, মঙ্গলকাব্যের আদর্শ সকাম ইষ্টসিদ্ধিমূলক লৌকিক ধর্ম্ম।

বৈষ্ণব সাধকগণ বলিতেন—ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ভগবানও তেমনি ভক্তের জন্য ব্যাকুল। ভগবান ছাড়া ভক্তের চলে না, ভক্ত ছাড়াও ভগবানের চলে না। ভক্তের সহিত ভগবানের সম্পর্ক প্রেমাত্মক। মঙ্গলকাব্যকারগণ দেখাইলেন ভক্ত না হইলে দেবতার চলে না সত্য, তবে প্রেমের প্রয়োজনে নয়—আত্মপূজা প্রচারের জন্য। আর ভক্তেরও ভগবান না হইলে চলে না, তাহাও প্রেমের প্রয়োজনে নয়—ইষ্ট সাধনের জন্য, সুখসৌভাগ্য-লাভের জন্য। প্রেমের সম্পর্ক নয় বলিয়া দেবতা ভক্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া নিজেও ছলে বলে কৌশলে আত্মপূজা প্রচারের চেষ্টা করেন। আর ভক্তও দেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না—নিজের পুরুষকারের ও আত্মশক্তির প্রয়োগে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করে না।

বৈষ্ণবের দেবতা আনন্দলীলা-সম্ভোগের জন্য নরদেহ ধারণ করেন—মঙ্গলকাব্যের দেবতা কোন একটা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য ধরাতলে অবিভূর্ত হন এবং প্রয়োজন হইলে নরদেহ ধারণ করেন।

বৈষ্ণব কবি তাঁহার দেবতার মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কিছুই দেখে না। মঙ্গলকাব্যের কবি উপাস্য দেবতার রোষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, ছলনা ইত্যাদি বহু বৃত্তিরই আরোপ করিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্য-রচনার ভঙ্গীটা ক্রমে একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গী বা মামুলী প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখনকার দিনে যে কেহ খণ্ডকাব্য রচনা করিত, সে ঐ কাব্যরূপই গ্রহণ করিত, সব সময়ে দেবদেবীর প্রতি ভক্তি বশতঃ নয়। তাই দেখি বৈষ্ণবও চণ্ডীমঙ্গল লিখিতেছে—গোঁড়া হিন্দুও ধর্ম্মমঙ্গল লিখিতেছে। এ যেন মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য লেখার মত।

নূতন একটা কাব্যরূপ (form) আমাদের দেশের কবিদের মাথায় সহজে আসিত না। চিরপ্রচলিত রূপ ছাড়া তাহাদের গতি ছিল না। দেবতার মহিমা প্রচারই সকলের উদ্দেশ্য ছিল না—দেশের জনসাধারণকে ধর্ম্মকথার ছন্দে আনন্দদান ও তখনকার আদর্শে সাহিত্য-সৃষ্টিও অনেকের উদ্দেশ্য ছিল। *

কেবল কাব্যের বহিরঙ্গীয় রূপ নয়, নূতন আখ্যানবস্তু বা বিষয়বস্তুও কবিদের মাথায় আসিত না। এমনই গতানুগতিকতা ও মৌলিক চিন্তার অভাব দেশের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, কবিরা একটা নূতন

* একই উপাখ্যান লইয়া শত শত মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিতে আখ্যান ভাগ পরিপূর্ণাঙ্গ এবং সাহিত্যাংশে যেগুলি উৎকৃষ্ট সেই গুলিই টিকিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে survival of the fittest এর নিয়মই কাজ করিয়াছে। যে কবি আখ্যান ভাগের প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ হয়ত কালসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যিনি ঐ আখ্যান-ভাগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপ দিতে পারিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থই কালপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এক রাত্রির অন্ধকারে আলোক দিয়া দীপান্বিতার মৃৎপ্রদীপগুলির মত অধিকাংশই আবর্জ্জনা স্তূপ বাড়াইয়াছে—যেগুলি তৈজস প্রদীপের মত সেইগুলিকেই সযত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। যেগুলি লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেটুকু উৎকৃষ্ট তাহা লুপ্ত হয় নাই, যে গ্রন্থ কালজয়ী হইয়াছে তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

গল্পেরও উদ্ভাবন করিতে পারিত না। তাই কয়েকটি দেবদেবীঘটিত গল্প ছাড়া তাহাদের বিষয়বস্তু জুটিত না। কাজেই যে কেহ কাব্য লিখিতে চাহিত, তাহাকে মঙ্গল কাব্যই লিখিতে হইত।

উপন্যাস বা নাটক লেখার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। গান লেখার প্রথা অবশ্য ছিল। কিন্তু এখনকার ধরণের গীতিকবিতা লেখারও প্রথা ছিল না। গদ্য-রচনার পদ্ধতিত ছিলই না। প্রথা না থাকিলে কি হয়, মনের কথা ঐ সকল ভঙ্গীতেও প্রকাশ চায়। ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণের ভঙ্গী না পাইলে অগত্যা এমন একটা ভঙ্গী অবলম্বন করিতে হয়, যাহা ঐ গুলির অনুকল্প। সেকালে ঐ মঙ্গলকাব্যের ভঙ্গীটাই হইয়াছিল সকল প্রকার ভঙ্গীর সম্মিলিত অনুকল্প।

এই ভঙ্গীটাই একাধারে ইতিহাস, কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, পুরাণ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, গদ্যসাহিত্য ও গানের মিশ্রণে উৎপন্ন। মঙ্গলকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাই আমরা দেখি ইহার কতকটা গীতাত্মক, কতকটা উপন্যাসের মত, কতকটা নাটকের মত। এক রসপাত্রেই সকলপ্রকার পানীয়ের বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল।

মঙ্গল কাব্যগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য,— ইহাতে দেবতা ও মানবের, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের, কল্পনা ও সত্যের মধ্যে একটা ব্যবধান রাখা হয় নাই। মানুষও দৈববলে বলী হইয়া অলৌকিক শক্তিতে প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করিতেছে—দেবতাও মানুষের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা লইয়া মানুষের মত আচরণ করিতেছে, মানুষের ভয়েই হয়ত ব্যাকুল। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য যেন নদীর এপার-ওপার, কল্পনা ও সত্য সর্ব্বত্রই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাই কত অলৌকিকতা, অস্বাভাবিকতা ও অসম্ভাব্যতা যে ইহাতে স্থান পাইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক কোন শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে ইহা

বাঁধা নয়। মঙ্গল কাব্যের রসাস্বাদ করিতে হইলে চিত্তকে তদনুযায়ী করিয়া বসিতে হইবে। কোন অস্বাভাবিক অঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া, ইহাও কি সম্ভব,— এ প্রশ্ন করিলে চলিবে না। সব মানিয়া লইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার মত ইহার ভিতরটা দেখিতে হইবে অর্থাৎ মর্মার্থ টুকু গ্রহণ করিতে হইবে।

মঙ্গলকাব্য দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যে দেবতাবিশেষের। পূজা প্রতিষ্ঠাই উদ্দিষ্ট, তাহাতে অন্যান্য দেবতা লইয়া টানাটানি করা হয় নাই। আর এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যে এক দেবতাকে ছোট করিয়া অন্য দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। এইরূপ কাব্য সাম্প্রদায়িক বিসংবাদের ফল। আর এক শ্রেণীর কাব্য আছে—তাহাতে ভিন্নভিন্ন দেবতার মধ্যে একটা সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। নানাশ্রেণীর কবিরা মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছে—তাই বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মের আদর্শের পার্থক্যের জন্য এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

বহু দেবদেবীর স্তবস্তুতি করিয়া গ্রন্থের সূত্রপাত হয়। ইহা একটা মামুলী প্রথা মাত্র। চৈতন্য মঙ্গলের কবি লোচনদাসও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। আসরে নানা ধর্ম্মমতের লোক, নানা দেবতারই উপাসক উপস্থিত থাকিত। সকলেরই মনোরঞ্জনের প্রয়োজন, অন্ততঃ প্রারম্ভে। বোধ হয় ইহা হইতেই এই প্রথার উৎপত্তি। তাই কবিকঙ্কণকে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে চৈতন্যেরও বন্দনা করিতে হইয়াছে। চৈতন্য যে তখন দেবতা বলিয়াই অর্দ্ধবঙ্গের পূজ্য।

মঙ্গলকাব্যগুলি সবই স্বপ্নাদেশে রচিত বলিয়া কবিরা এই ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহার তিনটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ১. স্বপ্নাদেশে রচিত, অতএব এই গ্রন্থ শ্রদ্ধেয়—ভক্তির সামগ্রী। ২. ইহার একটি আত্মসমর্থন। একই দেবতার মঙ্গলকাব্য একাধিক থাকিতে দেবতার

স্বপ্নাদেশ ছাড়া পুনরায় আর একখানি রচনার সার্থকতা থাকে না। প্রকারান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলির নিন্দা করিবার জন্য এমন স্বপ্নও কল্পিত হইয়াছে যে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে দেবতার তুষ্টি হয় নাই। ইহা ছাড়া, বাংলা ভাষায় দেবতার কথা লেখা গৌরবের ব্যাপার ছিল না—নিন্দনীয়ই ছিল। দেবতার স্বপ্নের দোহাই দিয়া কবিরা তাই ধর্ম্মকথা বাংলায় লিখিতেন। মোটকথা, স্বপ্নাদেশের দোহাই দেওয়া একটা প্রথায় (Convention) দাঁড়াইয়া ছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলির সাধারণতঃ দুইটি ভাগ। একটি ভাগে অবিমিশ্র দেবলীলা —স্বর্গে। আর একভাগে নরলীলা—মর্ত্ত্যে। প্রয়োজন হইলে মর্ত্ত্যে দেবতার আবির্ভাব। প্রথমাংশের এই দেবলীলার সঙ্গে কোন কাব্যের অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই —কোন কাব্যের আছে। এই দেবলীলাচ্ছলে পাঠকদিগকে কতকটা পৌরাণিক জ্ঞান বিতরণ করা হয়। * এটা যেন সমগ্র কাব্যের গৌরচন্দ্রিকা। হরগৌরীর দাম্পত্য-লীলাই প্রথমাংশের প্রধান উপজীব্য। কতকগুলি কাব্যের দেবলীলা শুধু কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে স্বর্গলোক কিংবা গন্ধর্ব্বলোক হইতে শাপভ্রষ্ট করিবার জন্য। শাপভ্রষ্টদের স্বর্গারোহণ ও শাপমুক্তির দ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

গ্রন্থের মধ্যেও খানিক খানিক পৌরাণিক কথাও কাহারও কাহারও

---

* মঙ্গল কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষাদান। পূর্ব্বে এই কার্য্য প্রধানতঃ পুরাণের দ্বারা চলিয়া আসিতেছিল। মঙ্গলকাব্য গ্রামে গ্রামে গীত হইত। এই কাব্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুনির্ব্বাচিত পৌরাণিক কাহিনী সন্নিবেশ করিয়া কবিরা লোকশিক্ষার প্রচলিত ধারা বজায় রাখিয়াছেন।

তাহা ছাড়া দেবতা নিজেই পুরাণে একটি চরণ রাখিয়া কাব্যে আর একটি চরণ স্থাপন করিয়া দুইএর মধ্যে যোগ সাধন করিয়াছেন। তাই পুরাণ কাহিনী আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষের মত আচরণের দ্বারা দেবতারা যে দেব মহিমা হারাইতে বসিয়াছে পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা সে দেব-মহিমাকে রক্ষা করা হইয়াছে।

জবানীতে সন্নিবিষ্ট হইত। মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশ সংস্কৃত হইতে গৃহীত। লৌকিক অংশ খাঁটী বাংলার নিজস্ব। দুই অংশের মধ্যে মিলন-সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য কবিরা পৌরাণিক অংশে কিছু কিছু যোগ বিয়োগ সাধনে কল্পনার প্রয়োগ করিয়াছেন। লৌকিক অংশেই কবিদের কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষায়, ভূষায়, আখ্যানভাগে, রসসৃষ্টির আদর্শে মঙ্গলকাব্যে, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য ধারার মিলন ঘটিয়াছে।

গ্রন্থের পরিপুষ্টি হয় নায়ক-নায়িকার জীবনে নানা অনর্থ, নানা বিপৎপাতের সৃষ্টির দ্বারা। এই অনর্থ বা বিপৎপাত আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক। নায়ক-নায়িকা দেবতার অনুগ্রহে অথবা দেবদত্ত শক্তিবলে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হয়—প্রতিপক্ষের দর্পচূর্ণ হয়।

দেবতা বিশেষের পূজা প্রচারের সঙ্গে সকল মঙ্গলকাব্যে সতীধর্ম্মের জয়গান করা হয়। সতীর জীবনেও নানা পরীক্ষা, নানা সঙ্কট ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত সতীত্বের জয় হয়, কোথাও দেবানুগ্রহে, কোথাও সতীত্বের নিজস্ব তেজো-বলে। কাব্যে সতীত্বের কঠিন পরীক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে। প্রলোভন সৃষ্টি করিয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্রবল ও ধর্ম্মবল-পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকে। এই অঙ্গটি লোকশিক্ষার জন্যই বিশেষভাবে পরিকল্পিত।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে এক বা ততোধিক বিবাহের চিত্র দেখানো হইয়াছে। ঘটকের আগমন হইতে বরকন্যার বিদায় পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক বর্ণনা থাকে। স্ত্রী আচার ও এয়োদের কথা থাকা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল। কাব্যের মধ্যে এই অংশে রসসৃষ্টির প্রচুর অবকাশ থাকে *।

ইহা ছাড়া নানা প্রকারের তালিকা। বিশেষতঃ বারমাস্যা বর্ণনা, ভোজ্য-

* ইহা বিশেষভাবে কাব্যের লৌকিক অঙ্গ। এই লৌকিক অঙ্গটি শিবের বিবাহকেও আশ্রয় করিয়া কোন কোন কাব্যে রূপ লাভ করিয়াছে। হিমালয়ের চূড়া ইহাতে বাংলার বাঁশ বনের মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং শিব হইয়াছেন দ্বিতীয় পক্ষের বুড়া বর, দরিদ্র ও কুলীন।

দ্রব্যের তালিকা, নারীগণের পতিনিন্দা, স্বপ্নাদেশ, নায়িকার রূপ বর্ণনা, নায়িকার বেশভূষার বর্ণনা, দুঃস্বপ্ন ও যাত্রার কুলক্ষণের বিবৃতি, ডিঙ্গা সাজানো ও জলপথের বিপদ আপদের কথা, প্রাণদণ্ড, মশানদৃশ্য, শাপপ্রাপ্তি, শাপাবসান, বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্ব, হনুমানের সহায়তা, সতীত্ব-পরীক্ষা ইত্যাদি কতকগুলি অঙ্গ প্রায় সকল কাব্যেরই মামুলী উপকরণ।

মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের ইতিহাস নয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস। সে কালের আচারব্যবহার, উৎসব-পার্ব্বণ, ভোজনশয়ন, গমনাগমন, শিক্ষাদীক্ষা, কুসংস্কার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির ইতিবৃত্তও ঐগুলি হইতে উদ্ধার করা যায়। বলা বাহুল্য, ঐ সকলের পরিচয় দেওয়ার জন্যই কবিরা কাব্য লেখেন নাই, ঐগুলি কাব্যের উপাদান বা অঙ্গস্বরূপ স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও সরস হইয়াছে—কোথাও হয় নাই; কোথাও কেবল তালিকা, কোথাও তালিকা মালিকার আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকলের পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের অধিকারভুক্ত নয়।

বাঙ্গালী বড় দুর্ব্বল, অনুন্নত ও মৃদু প্রকৃতির জাতি, আত্মশক্তিতে তাহার বিশ্বাস বড় অল্প। তাহার বিশ্বাস, দৈবী শক্তির কাছে আত্মশক্তি কিছুই নয়। দেবতা প্রসন্ন না থাকিলে কোন প্রয়াসই সার্থক নয়। আমরা দৈবীশক্তির হাতের পুতুল মাত্র। এই দেবতা কিন্তু স্বয়ং ভগবান ন'ন। এই দেবতা যে কে তাহা তাহার অভ্রান্ত ভাবে জানা নাই। তাই সে এক এক ব্যাপারের জন্য পৃথক পৃথক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। সে জানে যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের অদৃষ্টকে শাসন করিতেছেন, তিনি যেই হউন না কেন, যে কোন মারফতে তাহার আবেদন যথাস্থানে গিয়া পৌছিবে। অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে আবেদন-নিবেদন পাঠানো চলে না। তাই ভিন্ন ভিন্ন আবেদন বহনের জন্য সে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীকে ধরিয়াছে।

যে ধর্ম্মের উপাস্য সাংখ্যের শিবরূপী নিষ্ক্রিয় পুরুষ, সে ধর্ম্মের কথা ভুলিয়া যে ধর্ম্মের মূল প্রার্থনা,—"দেবি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি"—সেই ধর্ম্মকেই বাঙ্গালীর প্রপন্নার্ত্ত চিত্ত আশ্রয় করিল। মহাশক্তির কাছে সে শক্তি প্রার্থনা করিল। তাই স্বভাবতঃ মঙ্গলকাব্য-রচনার ভার পড়িল শাক্ত কবিদের উপর। শাক্ত কবিগণ তখন দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাব্যে তাঁহারা দেখাইলেন—নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মের ত কথাই নাই, এমন কি শিব বা বিষ্ণু আপন আপন উপাসকের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু শক্তি আপন উপাসককে ঐহিক ঋদ্ধি দান করেন, বরদানে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন এবং শরণাগতকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করেন। যাহার প্রতি তিনি অপ্রসন্ন—কোন দেবতার ক্ষমতা নাই তাহাকে রক্ষা করেন। যাহার প্রতি তিনি বিরূপ, তাহার লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারেন দেবী ভক্তকে রক্ষা করেন—বিরোধীকে ধ্বংস করেন। *

* যাহারা বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছে—দারাপুত্রপরিবারের ধার ধারে না—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ছেলেপুলে লইয়া ঘর-সংসার করিতে হইলে দেবতার কৃপা চাই। দেবতার কৃপা চাই দুই কারণে। প্রথম মঙ্গলবিধানের জন্য, দ্বিতীয় অমঙ্গল বারণের জন্য।

আর একটি কথা এই—ভৌগোলিক দিক হইতেও দেখিলে বাঙ্গালীর মত অসহায় জাতি আর নাই। এত বেশি প্রাকৃতিক উপদ্রব অন্য কোন দেশে নাই। বন্যাঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাতা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প এদেশে লাগিয়াই আছে। ঐ সকল উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কখনও কোন মানুষের শরণাপন্ন হওয়া চলে বাঙ্গালী তাহা জানিত না। কোন মানুষ, এমন কি রাজাও কোন প্রতিকার করিতে পারিত না। ঐতিহাসিক দিক হইতেও এই যুগের বাঙ্গালী সব চেয়ে অসহায়। তাই মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদির উপদ্রব এবং মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার হইতে তাহারা কোন প্রকারেই আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। তাহাদের আবেদন-নিবেদন অভাব-অভিযোগের কথা শুনিবারও কেহ

বৈষ্ণব সাহিত্য ভক্তকে এই আশ্বাস দিতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব দেশের সুপ্ত শাক্ত মনোভাবকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং এই শ্রেণীর শাক্ত-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রণোদনা দিয়াছিল।*

মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাতে বৌদ্ধপ্রভাব অল্পবিস্তর বর্তমান। বুদ্ধরূপী-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই বৌদ্ধদের মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য ছিল। তাহা

ছিল না। রাজা বিদেশী—বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী। রাজার সহিত প্রজার প্রতিপালক-প্রতিপাল্য সম্বন্ধ তখনও স্থাপিত হয় নাই। রাজশক্তি তখনও বিজিত জাতিকে বিশ্বাস করে না—মিত্র ভাবে না—শত্রুই ভাবে। এইরূপ স্থলে আবেদন-নিবেদন চলে না। ভূস্বামীরা নিজেরাই বিব্রত—কি করিয়া রাজাকে প্রসন্ন রাখিয়া আত্মরক্ষা করিবে তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা। প্রতিকার করিবে কে? কাজেই দেশের লোকের যুক্তকর উর্দ্ধপানেই উঠিয়াছে। দৈবশক্তির নিকট আবেদন ও দেবতার কাছে সর্ববিধ আকিঞ্চন জানানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—যখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্ব্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইতেছে—প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইতেছে। ইহারই মূলে শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই 'প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।'—সেই জন্য সর্ব্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাতখুন মাপ। যতক্ষণ যে প্রিয়পাত্র তত ক্ষণ তাহার সংগত অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ংকরী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নাই। (রবীন্দ্রনাথ)

* দেবদেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহচ্ছলে কবিরা বলিতে চাহিয়াছেন, যে-দেবতা অনুগ্রহ করেন এবং না মানিলে নিগ্রহ করেন, তিনিই নিয়তি। এই নিয়তির কাছে পুরুষকারের কোন মূল্যই নাই। পুরুষকার যতই বিরাট হউক, তাহা লইয়া ক্ষুদ্র মানুষের অহঙ্কার সাজে না। অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কবি নিয়তির সহিত পুরুষকারের সংগ্রামে নিয়তিকে বিজয়িনী করিয়া আনন্দই পাইয়াছেন এবং অদৃষ্টবাদী স্বজাতিগণকে আনন্দ দিয়াছেন। যে নিয়তিকে মানে না তাহার লাঞ্ছনাতে বাঙ্গালী আনন্দই পাইয়াছে।

হইতেই হিন্দুদের দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সেকালের বৌদ্ধগণ শিবপূজাও করিতেন। তবে বৌদ্ধ সাহিত্যে শিবের স্থান ছিল বুদ্ধ বা ধর্ম্মের নীচে। শিব ধর্ম্মেরই আজ্ঞাবহ।‡

শিব ছিলেন চাষবাসের দেবতা। শিব তাঁহার পত্নী মহামায়ার সঙ্গে অন্নাভাব লইয়া কলহ করেন এবং ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শিবের এই বৌদ্ধচিত্র পরবর্ত্তী হিন্দু কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন। 'ধান ভানিতে যে-শিবের গীত' গাওয়া হইত, সে শিব ইনিই।

এদিকে দেশের মন্দিরে ধর্ম্মঠাকুর ধর্ম্মরাজ নামে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর ধর্ম্মরাজ নামে রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে থাকিয়া গিয়াছেন; অথচ বৌদ্ধ নাই দেশে। তাই বলিয়া দেবতা ত লুপ্ত হইতে

---

‡ নিরঞ্জন ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তির জন্ম। তাহার বিষপানের ফলে শিবের জন্ম। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও আদ্যার সন্তান। ইঁহারাই সৃষ্টি করিলেন। আদ্যা শিবের জননী, কিন্তু সাত জন্ম পার হইয়া দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হইলেন।

বৌদ্ধ কবিরা শিবকে ধর্ম্মদেবতার অধীনে চাষী বানাইয়াছিলেন—শূন্যপুরাণে তাঁহার চাষের বর্ণনা আছে। বহুদিন পরেও শিবায়ন গ্রন্থে তিনি আবার চাষীরূপে দেখা দিয়াছেন। শিব সকল মঙ্গলকাব্যেই আছেন—তবে অন্যরূপে। মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য লোকসাহিত্যে ত্রিলোচন তিন রূপে দেখা দিয়াছেন। এক রূপে তিনি ধর্ম্মঠাকুরের সহিত মিশিয়া পাঁচালী ও গম্ভীরার গান শুনিয়াছেন। আর এক রূপে তিনি বঙ্গকবিদের উপাস্য না হইয়া উপহাস্য হইয়াছেন। এই শিবই একদিকে সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন—অন্যদিকে উমার প্রসঙ্গে করুণরসের সঞ্চার করিয়াছেন। আর একরূপে তিনি হিন্দুপুরাণের ব্রহ্মময় শিব—জ্ঞানিগণের উপাস্য—চাঁদ সওদাগরের পরমারাধ্য। ইঁহার উপাসকদের সঙ্গেই শাক্ত সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি। নাথসাহিত্য বৌদ্ধসাহিত্যেরই একটি ধারা হইলেও ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের সহিত একাত্মক হইয়া শিবের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়াছে। নাথসাহিত্যে শিব অনাদিনিধন ব্রহ্মস্বরূপ। গোরক্ষনাথ এই শিবেরই, উপাসক না হইলেও, ভক্ত। নাথযোগীদের ধর্ম্ম আংশিক শৈবধর্ম্ম।

পারে না, দেবতা যে অমর। হিন্দুরা ধর্ম্মরাজকে বুড়া শিব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের চড়কগাজনই শিবের চড়কগাজন। চড়ক গাজনের গান ও গম্ভীরার গান বৌদ্ধসাহিত্যেরই পরিণতি। শিবের গাজনের সহিত ধর্ম্মের গাজন মিলিয়া মালদহের গম্ভীরা উৎসবের উৎপত্তি।

বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে বজ্রতারা, আর্য্যতারা, আদ্যা, বজ্রেশ্বরী, বিশালাক্ষী ইত্যাদি নামে যে দেবী পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন, তিনিই হিন্দুর ভবানী দেবীর সহিত মিলিত হইয়া চণ্ডীরূপ ধরিয়াছেন। শিবঠাকুর আর ধর্ম্মঠাকুর যেমন এক হইয়া গিয়াছেন—নিরঞ্জনপত্নী আদ্যাও তেমনি শিবজায়া শঙ্করীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন।‡ মাণিক দত্তের চণ্ডী মঙ্গলকাব্যই আদিমতম। এ গ্রন্থের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলের (শূন্যপুরাণ) * সৃষ্টিতত্ত্ব অভিন্ন। ধর্ম্মঠাকুরের নাম পরবর্ত্তী চণ্ডীকাব্যেও

---

‡ মনীষী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—চণ্ডীর উপাসক মাত্রই বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিলেন। চণ্ডী, শুভচণ্ডী (সুবচনী), কুলুইচণ্ডী, বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজিতা চণ্ডী বৌদ্ধ আদ্যাদেবীরই বিবিধরূপ। এই সকল চণ্ডীপূজায় বর্ণাশ্রমী পুরোহিত লাগে না। শীতলামঙ্গলের শীতলাদেবী বৌদ্ধ ডোম পুরোহিতদের পূজিতা হারিতী দেবীর রূপান্তর মাত্র। আজিও ডোমশ্রেণীর লোকেরাই শীতলার পূজারী এবং শীতলামঙ্গলের গায়ক।

* শূন্যপুরাণ—ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতের রচিত। ইহাকে কেবল ধর্ম্মমঙ্গল নয়—সকল মঙ্গলকাব্যের উৎস বলিয়া মনে করা হয়। ইহার প্রকৃত নাম আগম পুরাণ। বৌদ্ধশূন্যবাদের কথা ইহাতে আছে বলিয়া বর্ত্তমান যুগে ইহার শূন্যপুরাণ নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রন্থে ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা ও ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময়ে ইহা রচিত। সাহিত্যের দিক হইতে ইহার মূল্য নাই—বঙ্গভাষার ক্রমোন্নয়নের ইতিহাসে ইহার স্থান আছে। বৌদ্ধের শূন্যবাদের সহিত হিন্দুর পূজাপদ্ধতির মিশ্রণে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন। ধর্ম্মপূজায় যে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ইহাতে তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে। ইহা ধর্ম্মপূজক সম্প্রদায়ের স্মৃতি-সংহিতা। শূন্যপুরাণে হিন্দুপুরাণ ও বৌদ্ধপুরাণের সৃষ্টি-পত্তন, উপাসনাপদ্ধতি ইত্যাদির একটা সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারক

আছে। অন্যান্য দেবতার সহিত ধর্ম্মদেবতার স্তব করিয়া হিন্দু কবিগণ মঙ্গলকাব্য রচনা করিতেন।

মনসামঙ্গলেও বৌদ্ধপ্রভাব আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বৌদ্ধজাঙ্গুলী দেবীই মনসায় পরিণত হইয়াছেন। মনসামঙ্গলের উপাখ্যানটি বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ বাংলায় পরিকল্পিত। মনসামঙ্গলে যে দৈবজ্ঞ আচার্য্যদের শক্তির উল্লেখ আছে তাহা বৌদ্ধসাহিত্য হইতেই সংক্রমিত। মনসামঙ্গলে চাঁদ-সওদাগরের যে মহাজ্ঞানের কথা আছে তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের মহাজ্ঞানেরই অনুরূপ। হেঁতালের লাঠি, মনপবনের নৌকা ইত্যাদি বৌদ্ধসাহিত্যেরই সামগ্রী। সকল মঙ্গলকাব্যেই ব্রাহ্মণজাতিকে কতকটা উপেক্ষা করা হইয়াছে। লোকদের ভক্তি, সদাচার, শৌর্য্যবীর্য্য এবং মনুষ্যত্বে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধপ্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। শৌর্য্যবীর্য্য ক্ষত্রিয়ের একচেটিয়া নয়। কালু ডোম (ধর্ম্মমঙ্গল) একজন মহৎ চরিত্রের বীর। কালকেতু (চণ্ডীমঙ্গল) ব্যাধও একজন বীর ও মহাপুরুষ। বীরশ্রেষ্ঠ ইছাই ঘোষও (ধর্ম্মমঙ্গল) উচ্চজাতীয় লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব ছিল অপরিসীম। মঙ্গলকাব্যে বণিকসমাজই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়সমাজের স্থান অধিকার করিয়াছে।

"শিবহীন যজ্ঞ যেমন অসম্পূর্ণ, শিবহীন মঙ্গলকাব্যও তেমনি অসম্পূর্ণ।" শিব সকল মঙ্গলকাব্যেই আছেন। ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুরই শিব। তবে এ শিবে আর মঙ্গলকাব্যের শিবের মধ্যে প্রভেদ আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের শিব

মঙ্গলকাব্যই এই শ্রেণীর প্রথম কাব্য। তাহার অনুকরণেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধগণ যে ভাবে ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—হিন্দুরাও সেই-ভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধরা যেমন এজন্য লাউসেন রঞ্জাবতী, কানড়ার উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছিল—হিন্দুরাও তেমনি বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর, কালকেতু, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, ধনপতি, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আপন মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের জন্য একেবারেই চেষ্টা করিতেছেন না। তবু তাঁহার ভক্তের অভাব নাই। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণে উদাসীন—ভক্তকে শক্তির রোষ হইতে রক্ষা করিতেও পারেন না—তবু ভক্ত তাঁহাকে ত্যাগ করে না। ভক্ত তাঁহার কাছে কিছু চায় না, তিনি নিজেই নিষ্কিঞ্চন, শ্মশানবাসী, সর্ব্বত্যাগী—তাঁহার কাছে প্রার্থনীয়ই বা কি আছে? ভক্তেরা তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির ও ত্যাগতিতিক্ষার আদর্শ বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করে। মঙ্গলকাব্যে তাঁহার ভক্তেরা সবই পুরুষ। তাহারা পৌরুষ শক্তিতে বলীয়ান, নারীদেবতার পূজা করিতে তাহারা রাজী নয়। তাহারা তাহাদের ইষ্টধনের জন্য নিজেদের পৌরুষশক্তির উপরই নির্ভর করে,—উপাস্যের নিকট প্রার্থনা করে না। তাহারা বিপন্ন হইয়া তাহাদের উপাস্যকে স্মরণ করে বটে, কিন্তু সে শুধু মহাসঙ্কটেও তাহাদের ভক্তি বিচলিত হয় নাই—তাহাই জানাইবার জন্য। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা যে রক্ষা পায়—তাহা শিবের কৃপায় নয়,—শক্তিরই কৃপায়।

বৌদ্ধেরা শিবকে দরিদ্র ভিখারীর রূপে কল্পনা করিয়াছে এবং তাঁহার দ্বারা চাষ করাইয়াছে। শিব যখন বৌদ্ধসাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন—তখন তিনি তাঁহার লাঙ্গল ও ভীম ভৃত্যকে রাখিয়া আসিলেন,—সঙ্গে আনিলেন তাঁহার বুড়া বলদ, ভিক্ষার ঝুলি, ভাঙ ধুতুরার ঝোলা, হাড়ের মালা, করোটির পানপাত্র, ত্রিশূল ইত্যাদি।

বৌদ্ধসাহিত্যের একটা ধারা স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি চলিয়াছিল—তাহাতে তাঁহাকে পরেও চাষ করিতে হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যে শিবের দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, মদনভস্ম ইত্যাদি কীর্ত্তির কথা আছে—গৌরীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাও আছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রকট হইয়াছে তাঁহার দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের জন্যই গৌরীর সঙ্গে কলহ। সংসারী হইয়াও শিব উপার্জ্জনে উদাসীন,—ইহাতেই যত গোলযোগ।

শিবের জীবনের অন্যান্য ব্যাপার সম্পূর্ণ দেবলীলা, তাহার সহিত মানব-সংসারের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার দাম্পত্য-জীবনযাপন এবং শ্বশুরবাড়ীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক অবলম্বনেই কবিরা বাঙ্গালীর দরিদ্র সংসারটিকে ফুটাইয়াছেন। শিবের দেবলীলা পৌরাণিক উপাখ্যানের পুনর্বিবৃতি মাত্র। তাঁহার দাম্পত্য জীবনকেই কবিরা লৌকিক রূপ দিয়া আসল সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সাহিত্যেই কবিরা প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। শিবকে কেবল দরিদ্র করা হয় নাই—তাঁহাকে বিগত-যৌবনও করা হইয়াছে কিন্তু তিনি ধনীর জামাতা। এইরূপ দাম্পত্য জীবন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে,—অন্ততঃ প্রাচীনকালে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই। তাহাতে বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।"

দরিদ্র সংসারের সর্ব্ববিধ জ্বালা, কোন্দল-কোলাহল, রাগরোষ, অভিমান, আত্মধিক্কার সমস্ত ভেদ করিয়া যে আদর্শ মহাপ্রেমের গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী শিখর স্বর্গের দিকে উঠিয়া গিয়াছে ভক্ত কবিগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই।

আবার রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উৎকলন করি:—"দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্য-শৈলটাকে বেষ্টন করিয়া হরগৌরীর কাহিনী নানাদিক হইতে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। কখনও বা শ্বশুরবাড়ীর স্নেহ সেই দারিদ্র্যকে আঘাত করিতেছে, কখনও বা স্ত্রীপুত্রের প্রেম সেই দারিদ্র্যের উপর প্রতিহত হইতেছে। বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে ও দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য ও

আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন—দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় সান্ত্বনা আর নাই। আমার সম্বল নাই যে বলে সেই গরিব, আমার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের? শিব ত তাহারই আদর্শ।

অন্য দেশের ন্যায় ধনের সম্ভ্রম ভারতবর্ষে নাই—অন্ততঃ পূর্ব্বে ছিল না। যে বংশে বা যে গৃহে কুলশীল সম্মান আছে, সে বংশে বা গৃহে ধন নাই এমন সম্ভাবনা আমাদের দেশে বিরল নয়। এইজন্য আমাদের দেশে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক আদর্শ যেমনই হউক, ধনের একটা স্বাভাবিক মত্ততা আছে। ধনগৌরবে দরিদ্রের প্রতি ধনী কটাক্ষপাত করিয়া থাকে। যেখানে সামাজিক উচ্চনীচতা নাই—সেখানে ধনের উচ্চনীচতা আসিয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থা দাম্পত্য সম্বন্ধে একটা মস্ত বিপাকের কারণ। স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনিকন্যা দরিদ্র পতি ও নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন গৃহধর্ম্ম কম্পান্বিত হইতে থাকে। দাম্পত্যের এই দুর্গ্রহ কেমন করিয়া কাটিয়া যায়, হরগৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সতী স্ত্রীর অটলশ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান, তাহার আর একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতা-মোচন, মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন এবং শ্মশানচারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্যবন্ধনের আর একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্দ্ধক্য ও কুরূপতা। হরগৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহসভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন—তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক

রূপযৌবন প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে। তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি-প্রীতির উপর নির্ভর করে। গ্রামের ভিক্ষুক, কথক, গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তি উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।

হরগৌরীর কথা সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়-কাহিনী। হরগৌরী-প্রসঙ্গে আমাদের একান্ন পারিবারিক সমাজের মর্ম্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনি হোক, স্ত্রী রূপযৌবন, ভক্তি-প্রীতি, ক্ষমাধৈর্য্য ও তেজোগর্ব্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মান-লক্ষ্মী।"

মঙ্গলকাব্যে দেবতা প্রধানতঃ দুইটি। শিব ও শক্তি। শ্মশানচারী নৃমুণ্ডধারী নটরাজ পিনাকপাণি রুদ্র অনার্য্যসমাজ হইতে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করেন। আর্য্যগণ সহজে ইঁহাকে দেবতা বলিয়া বরণ করেন নাই। বৈদিক আর্য্যগণের অগ্রগণ্য কুলপতি দক্ষের যজ্ঞসভায় শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। মনে হয়, রুদ্র যেন নিজের প্রতাপবলে ও ঐশ্বরিক শক্তিতেই আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আর্য্যগণ তাঁহাকে ধ্যানপরায়ণ জ্ঞানাবতার শিবমূর্ত্তি দান করেন। আর্য্যগণের শিবই মহাকবি কালিদাসের উপাস্য, কুমারসম্ভবের শিব। বৌদ্ধ-সাহিত্য শিবকে নূতন রূপ দিয়াছিল—সে কথা বলিয়াছি। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের ধারা পাইলেন বৌদ্ধদের নিকট হইতে—উপাদান উপকরণ পাইলেন পুরাণ হইতে। কাজেই, মঙ্গলকাব্যে শিব আর্য্য, অনার্য্য ও বৌদ্ধদের পরিকল্পনার একটা মিশ্ররূপ লাভ করিয়াছেন। (প্রথমে যাহারা অক্ষরে অক্ষরে আনুষ্ঠানিক পৌরাণিক ধর্ম্ম পালন করিতে সম্মত ছিল না—শিব ছিলেন তাহাদের দেবতা। আর যাহারা হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ভীতিবোধিত সকাম ধর্ম্মের সেবক ছিল তাহাদের দেবতা ছিল শক্তি।) কিন্তু ইহারও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

এই শক্তিই নানারূপে মঙ্গলকাব্যে দেখা দিয়াছেন। ইনিই চণ্ডী, ইনিই

মনসা, ইনিই কালিকা, ইনিই শীতলা। আবার ইহারই দাক্ষিণ্যময় রূপ অন্নপূর্ণা।

সমাজে শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই ছিল, যদিও তাহার স্পষ্ট ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যে সেই দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট। সমাজে শাক্তের সহিত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আরো প্রবল ছিল—কিন্তু মঙ্গলকাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। লোক-সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে। শৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব লইয়াও কোন কাব্য রচিত হয় নাই। তবে দ্বন্দ্ব যে একেবারে ছিল না, তাহাও মনে হয় না। কবিদের কল্পিত হরিহররূপ তাহার সমন্বয়—অর্দ্ধনারীশ্বররূপ যেমন শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্বসমন্বয়ের অভিসূচক।

ক্রমে শিবই সাধুশিষ্ট সমাজের উপাস্য হইলেন এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই শক্তির উপাসনা করিয়া একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন —"স্পষ্টই দেখা যায় এই কলহ বিশিষ্টদলের সহিত ইতর সাধারণের কলহ। উপেক্ষিত জনসাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্ত সমাহিত নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইল। * * এইরূপ বিদ্রোহকালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষণতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাঁহার ইচ্ছা কোন বিধি বিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে। তাহা বাধাবিহীন লীলা, কখন কি করে, কেন কি রূপ ধরে তাহা বুঝিবার জো নাই, এইজন্য তাহা ভয়ঙ্কর। * * শিব আর্য্যসমাজে ভিড়িয়া যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন, নিম্নসমাজ তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্তভাবকে তাহারা উচ্চশ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজাই খাড়া করিল। * * যাহা-

দিগকে আশ্রয় করিয়া শক্তি পূজা প্রচার করিতে উদ্যত, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচে আছে তাহাকেই উপরে উঠাইবেন,—ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা—এমন বলের কথা আর কি আছে ?”

এইখানে আর একটি কথা বলার প্রয়োজন। মঙ্গলকাব্যে যে শিবের দাম্পত্য লীলা দেখানো হইয়াছে এবং যে শিবকে ভিখারী বানাইয়া বলদে চড়াইয়া উপহাস্য করা হইয়াছে—সে শিব শক্তির স্বামী মাত্র। এই শিব মঙ্গলকাব্যের নায়কদের উপাস্য নহেন। শক্তির উপাসকদের সঙ্গে যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন—তাঁহাদের উপাস্য যিনি, তিনি সাংখ্যের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষের ধ্যানতন্ময় রূপ,—দ্বন্দ্বাতীত—ভোলানাথ। এই শিবের উপাসকের সংখ্যা বেশি হইতে পারে না। যে দেবতা বলেন—“সুখ দুঃখ, দুর্গতি সদ্গতি ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ওদিকে দৃকপাত করিও না,—সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজন মানই চায়।”

কাজেই বাঙ্গালীর সমাজে শিবের পরাভব ও শক্তিরই জয়জয়কার হইল। সাহিত্যে তাহাই দেখানো হইয়াছে। শক্তির বিজয় লাভের পরে শাক্তরা যে শিবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—সে শিব সংসারী লৌকিক শিব। এ শিব আদর পাইয়াছেন—মহাশক্তির অক্ষম স্বামিরূপে—মহাশক্তির কৃপাপাত্ররূপে। বিজয়লাভের পর রুদ্রাণী প্রসন্নদক্ষিণা মূর্তি ধরিয়া অন্ন বিতরণ করিতেছেন, আর ‘ভিখারী’ স্বামী অঞ্জলি পাতিয়া সেই অন্ন গ্রহণ করিতেছেন।

চণ্ডীদাস—(১)

বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক নহেন—সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। যাঁহারা বলেন, বড়ু চণ্ডীদাসই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন যৌবনে, আর পদাবলী লিখিয়াছেন বার্দ্ধক্যে,—রসাদর্শের পার্থক্যের জন্য তাঁহাদিগকেও প্রকারান্তরে দুই চণ্ডীদাসই স্বীকার করিতে হইতেছে। দ্বিজ চণ্ডীদাস আর বড়ু চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি হউন আর পৃথক্ ব্যক্তিই হউন—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলিকে উপেক্ষা করিবার যো নাই। এইগুলি এমন চমৎকার যে, এইগুলিকে মণিরত্নের সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর দীন চণ্ডীদাসের ভাগ্য এমন ছিল না যে, তাঁহাকে এই মণিরত্নভরা হেমঘটের অধিকারী মনে করা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনাগুলি তাঁহার হইতে পারে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেকগুলি পদ কোন কোন পুঁথিতে অপরের ভণিতাতে পাওয়া যায়, সেগুলি তাঁহাদেরও হইতে পারে—চণ্ডীদাসেরও হইতে পারে। যদি সেগুলি অন্যের বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও অনেক উৎকৃষ্ট পদ অবশিষ্ট থাকে। এইগুলির জন্য দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের বিশেষ প্রয়োজন ঘটিতেছে। চণ্ডীদাসের নামে কোন গৌরচন্দ্রিকার পদ নাই। আরও দুই একটি কারণে দ্বিজ চণ্ডীদাসকেও শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

নরহরি যে চণ্ডীদাসের প্রশস্তিতে বলিয়াছেন—

সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝুরে পশুপাখী পিরীতে মজিল যে॥

সে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস বলিয়া মনে হয় না। ইনি পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

এই নিবন্ধে প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি লইয়া আলোচনা করা হইল। ইহাদের কোন কোন পদ দীন চণ্ডীদাসেরও হইতে পারে। †

নায়ক-নায়িকার রূপ-মাধুরী অনুরাগের উদ্দীপন-বিভাব। সে জন্য রূপবর্ণনার প্রয়োজন আছে। যে রূপ দেখিয়া নায়ক-নায়িকা জীবন-যৌবন লাজ ভয় মান—সব ভুলিয়া যাইবে তাহা অপূর্ব্ব হওয়াত চাই-ই। বৈষ্ণব কবিগণ রূপবর্ণনার প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন। এ জন্য চিরকাল কবিরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপূর্ব্বতা দেখাইবার জন্য যে সকল উপমা ব্যবহার করেন চণ্ডীদাসও সেগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—তবে বিদ্যাপতি বা সংস্কৃত কবিদের মত খুঁটিনাটি করিয়া নয়। এ জন্য ডম্বরু, বিম্ব, কনক-কটোরা, চাঁদ, কমল, খঞ্জন, দাড়িম্ববীজ, বন্ধুজীব, চামর, থির বিজুরি,

† চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত পদগুলি অন্য কবির নামেও পাওয়া যায়। ১। কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি। ২। পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাগর মাঝে—নরহরির নামে। ৩। সই কত না রাখিব হিয়া। আমারি বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া—(ঈষৎ রূপান্তরিত জ্ঞানদাস ও নরহরি দাসের নামে)। ৪। সজনি, ও ধনি কে কহ বাটে—লোচনদাসের নামে। ৫। কাহারে কহিব মনের কথা, কেবা যাবে পরতীত—রামচন্দ্র ঠাকুরের নামে। ৬। বন্ধু কি আর বলিব তোরে, এ তিন ভুবনে আর কেহ নাই দয়া না ছাড়িহ মোরে—দীনবন্ধু দাসের নামে। ৭। কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে (বিদগ্ধ মাধবের শ্লোকানুবাদ)—যদুনন্দন দাসের নামে। ৮। থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিনু ঘাটের কূলে, ৯। ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে, ১০। চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার—রামগোপাল দাসের নামে। ১১। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল—জ্ঞানদাসের নামে কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের কোন কোন পদ সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ অথবা চণ্ডীদাসের পদই সংস্কৃত শ্লোকের রূপ ধরিয়াছে।

কুন্দকুঁড়ি, মুকুতার পাঁতি ইত্যাদি সমস্তই কবি উপমায় লাগাইয়াছেন। মনে হয় কবির ইহাতে মন উঠে নাই। তাই তিনি অনেকক্ষেত্রে রূপ-মুগ্ধতার গভীরতার দ্বারাই মনোমোহনের মোহনতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।)

ইহা ছাড়া, মাঝে মাঝে এমন অপূর্ব্ব তুলিকাস্পর্শ দিয়াছেন যাহাতে সমগ্র রূপ আপনা হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছে—দশটি উপমাঙ্গ জোড়া দিয়া রূপ পরিকল্পনা করিতে হয় নাই। কয়েকটি সেই শ্রেণীর পংক্তির এখানে উৎকলন করি,—

১। স্বপ্নসম দেখি তারে ছায়ার সমান ফুয়ে মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।

২। বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন মোহন লখিয়া নাহিক লখি॥

৩। জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর লোল পিতে করে উতরোল নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

৪। সই চাহনি মোহিনী থোর
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল রূপের নাহিক ওর।

৫। নয়ন কমল অতি নিরমল তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি যেন বা দিয়াছে দেখা।

৬। চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে দেখিতে যাইবে চল।

কবি নায়িকার লীলাভঙ্গ, চলনবলন, হাবভাব, বিলাস-বিভ্রমের ইঙ্গিত করিয়া রূপের আকর্ষণী মাধুরী বাড়াইয়াছেন,—

১। বসন খসায়ে অঙ্গুলি চাপায়ে কর সে করচে থুইয়া। * *
ধীরে ধীরে যায় থমকিয়া চায় ঘন না চায় সে লাজে।

২। ফুলের গেডুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস।

চণ্ডীদাস (মতান্তরে লোচনদাস) নিম্নলিখিত পদে একবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন,—

সজনি, ও ধনি কে কহ বাটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নয় থির মনমথ জরে ভোর।

সরল মাধুরীর দ্বারাই রসসৃষ্টির জন্য দ্বিজ চণ্ডীদাস বিখ্যাত,—তাই বলিয়া কবিজনসুলভ চাতুরীও তাঁহার কম ছিল না। স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে কবি যথেষ্ট চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে নাপিতিনী, দেয়াসিনী, গ্রহবিপ্র, চিকিৎসক, বাজিকর, দোকানী, বেদিয়া, মালিনী ইত্যাদি নানা রূপ ধরাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বাজিকরবেশে রাধিকার মন ভুলাইতে আসিলেন। পুরুষের পৌরুষব্যঞ্জক কৃতিত্ব-কৌশল দেখিলে নারীর মন ভুলে, ইহাই কবির ইঙ্গিত।

শ্রীকৃষ্ণকে নাপিতিনীবেশে সাজাইয়া কবি রাগরসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইহাও চাতুর্য্যের দ্বারা রসসৃষ্টি। ফাঁকি দিয়া প্রণয়িণীর চরণসেবার মধ্যে যে গূঢ় রস আছে—'দেহি পদপল্লব মুদা-রম্'-এর মধ্যেও তাহা নাই।

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি তলে লেখে নাম আপনার।
নাপিতিনী বলে ধনি দেখত চরণখানি ভাল মন্দ করহ বিচার।

কবি চাতুর্য্যের দ্বারা এখানে আদিরসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

(আত্মবিস্মরণময় সর্ব্বজয়ী প্রেমের স্বরূপ, তাহার গাঢ়তা, গূঢ়তা ও গভীরতা, তাহার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, তাহার আকুলতা ও বিহ্বলতা দেখাইতে, কবি আপনার রসঘন অন্তরের সর্ব্বস্বই পদাবলীর মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন।)

রাধায় অন্তরে পূর্ব্বরাগের স্পর্শ লাগিয়াছে—রাজার ঝিয়ারী, কোনদিন কোন বেদনা তিনি পান নাই—"আজনম ধনী হাসি বিধুমুখে কভু না হেরিয়ে আন,"—তাহার অন্তরে এমন কি হইল—সে একদিনে 'মহাযোগিনীর পারা' হইল কেন? অসময়ে এই কিশোরী বয়সে অনিদান বৈরাগ্য কোথা হইতে?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায়।

সখীদের সঙ্গে মিশে না, রাঙা বাস পরে, আহারে রুচি নাই, কখনও চোখে শ্রাবণের ধারা—কখনও—

এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দু'হাত তুলি।

সেকি হাত বাড়াইল চাঁদে? সখী গূঢ় রহস্য বুঝিয়াছেন, তাই তিরস্কার করিয়া সখী বলিতেছেন,—

বুঝি অনুমানি কালারূপখানি তোমারে করিল ভোর।

রাধার আবেদন—"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

নামের প্রতাপেই এই দশা, তাহাকে দেখিলে যুবতী-ধর্ম্ম থাকিবে না, অঙ্গের পরশে কি হইবে কে জানে? শ্যামনাম শুধু কাণে প্রবেশ করিয়াই এই অঘটন ঘটাইয়াছে। কোন যুগ-যুগান্তরের কত জন্মজন্মান্তরের পরিচিত এই নাম রাধার মরমে প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রসুপ্ত জন্মান্তর-সৌহৃদ-স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিল! এখনও রাধা চোখে দেখেন নাই—রূপজ অনুরাগ কি করিয়া বলা যাইবে? নামে যে প্রেমের সূত্রপাত নামগানেই তাহার পর্য্যবসান হইয়াছে, ইহার বেশী কিছু বলিব না। প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় এ কোন্ প্রেমের কথা?

তারপর প্রথম দর্শনে কি রসমুগ্ধতা, কি বিহ্বলতা! এ যেন কত যুগ-যুগান্তরের হারাধন সহসা নয়নে পড়িল!—

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল-নন্দন হরিল আমার মন ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।
মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে তাহে শোভে ময়ূরের পাখ।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখ।
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্ব হেলন গা গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয় রসের নাগর বড় কালা।

শ্যামকে রাধা প্রথম দেখিলেন। কবি কি চিত্তোন্মাদক আবেষ্টনীর মধ্যে শ্যামকে দেখাইলেন! যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে, মুখে বাঁশী, গলে মালতীর মালা, মল্লিকাদামবেষ্টিত ময়ূরপাখার চূড়া, সে চূড়ার টালনি আবার বাম দিকে—ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়াছেন—এই চিত্রটি রাধার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইল। সেই সঙ্গে এই মূর্ত্তি বাঙ্গালী জাতির চিন্ময় মন্দির আর মৃন্ময় মন্দিরেও চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

তারপর মুরলীর ধ্বনি।

'বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।'
"শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরয না ধরে প্রাণ।" —চণ্ডীদাস

কালা শ্রীমতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিল। শ্রীমতী কালারূপ ভাবিতে ভাবিতে নিজেই কালো হইয়া গেলেন। নিজে কৃষ্ণভাবে তন্ময় হইয়া রূপান্তর লাভ করিলেন—কবি বলিয়াছেন "এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে ভাবিয়ে তাহার রূপ।"

এ যেন বিদ্যাপতির—"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধব।"

শ্যাম গোষ্ঠে চলিয়াছেন সাথীদের সঙ্গে—রাধা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন—

আঁখির পুতলি তারকার মণি যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল পাছে বা গলিয়া ঝরে ॥
ননীর অধিক শরীর কোমল বিষম ভানুর তাপে।
জানি বা অঙ্গ গলি পানি হয় ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
বিপিনে বেকত ফণী শত শত কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙা চরণ ভেদিয়া ছেদিবে মোর মনে হেন ভয় ॥
কেমনে যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা হেনক সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয় হায়রে বুঝিতে নারি ॥
ছারে পারে যাক অমন সম্পদ অনলে পুড়িয়া যাক।
এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিলে পায় কত সুখ পাক ॥

কি দরদই না ইহাতে ফুটিয়াছে! যশোদার দরদও এখানে হার মানিয়াছে।

শ্রীমতী—'যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।'
'পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি।'

শ্যাম হেন ধন কোথায় রাখিবে ঠিক করিতে না পারিয়া রাধা বলিতেছে,—

হেন মনে করি আঁচল থাপিয়া আঁচলে ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে ডাকা চুরি দিয়া পাছে লয়ে যায় সখি।
এ রূপ লাবণ্য কোথায় রাখিতে মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যেথায় সেখানে করেছি ঠাঁই।
সবার গোচর নাহি করি, কত রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া সিঁধ যবে যাই নিঁদ কেহ বা করয়ে চুরি।

রাধার সব চেয়ে বড় বেদনা—

শ্বশুর নই গুরু পরিজনা তাহার আছয়ে ডর।
যেন বেড়া জালে সফরি সলিলে তেমতি আমার ঘর।

বঁধুর পীরিতির সম্যক্ আদর করিবার উপায় নাই। তাই রাধার

মনে হয়—'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অনল ভেজাই ঘরে।'

নহি স্বতন্তরা গুরুজন ডর বিলম্বে বাহির হৈনু,
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কত না যাতনা দিনু।
এ ঘোর রজনী মেঘঘটা বঁধু কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।

প্রেম বড় বেদনার ধন। সুখের লাগিয়া যে প্রেম করিতে যায়, সে মূঢ়। প্রেমে জ্বালা আছে জানিয়া শুনিয়াই যে এ প্রেমকে বরণ করিতে পারে—জ্বালা তাহার মালা হইয়া তাহাকে গৌরব দান করে। যে প্রেম 'নিমিখে মানয়ে যুগ ক্রোড়ে দূর মানে' সে প্রেমে সুখ কোথায়? এ প্রেমে সম্ভোগেও সুখ নাই—কবি বলিয়াছেন—

দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

এ প্রেম—দুই আত্মার একত্ব লাভের প্রয়াস। এ প্রেম এমনি চিন্ময় যে, 'হারচন্দন চুয়া চীরের ত' কথাই নাই রক্তমাংসের ব্যবধানটি পর্য্যন্ত এ প্রেম সহ্য করিতে পারে না।

যুগে যুগে কবিরা যে প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কত উপমাই প্রয়োগ করিয়াছেন—এ প্রেম সে প্রেম নয়। ইহা কি উপমা দিয়া বুঝাইবার জিনিস? কবি বলিয়াছেন—

জল বিনে মীন কভু কবহুঁ না জিয়ে। মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥

কবি যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন—সে প্রেমের কোন উপমা নাই। তাহা যদি থাকিত—তবে কবি ভাল ভাল অলঙ্কার দিয়া বেশ শাসনসংযত

ভাষায় ও ছাদে তাহার বর্ণনা করিয়া অমরুশতক শ্রেণীর কাব্য লিখিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রকাশের জন্য এত আকলি বিকলি করিতেন না— "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি"র ভাষায় কবিতা লিখিতেন না।

✓চণ্ডীদাস যে গভীর প্রেমের কথা বলিয়াছেন তাহা তিলমাত্র উপেক্ষা সহ্য করিতে পারে না। উপেক্ষায় এই প্রেম অনুযোগ, অভিযোগ, অভিমান, অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও মরণাকাঙ্ক্ষার রূপ ধারণ করে। প্রেমের এইরূপ বৈচিত্র্য বর্ণনায় কবির সমকক্ষ কেহ নাই।

অধীর প্রতীক্ষার পর যখন আশাভঙ্গ হইল, তখন শ্রীমতী বলিতেছেন— 'ফুলের সুবাসে নিদ নাহি আসে।'

কুসুম তুলিয়া বোঁটা ফেলাইয়া শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায় রসিক নাগর বিনে।

পাছে বঁধুয়ার গায়ে কাঁটা বিঁধে, সেই ভয়ে ফুলের বোঁটা ফেলিয়া কেবল পাপড়ি দিয়া শয্যা বিছাইলাম—কিন্তু রসিকনাগরের না আসায় তাহা কাঁটায় ভরিয়া উঠিল। তখন শ্রীমতী অভিমানে কাতর হইয়া বলিতেছেন—

কুসুম কস্তুরী চুবক চন্দন লাগিছে গরল হেন।
তাম্বূল বিরস ফুলহার ফণী দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার আর ত না যায় দেখা।
ভালের সিঁদূর মুছি কর দূর-নয়ানে কাজর রেখা।
আর না রাখিব এছার পরাণ না যাব লোকের মাঝে।

রাই ছার পরাণ ত রাখিবে না—

পরাণ গেলে কি হবে পিয়া দরশন ?

প্রাণ হইতেও বঁধুয়া বড়। প্রাণ অতি তুচ্ছ—সে প্রাণ দিতে রাধার আপত্তি নাই—কিন্তু প্রাণ না থাকিলে বঁধুয়াকে কি করিয়া পাওয়া যাইবে ? বঁধুয়ার

জন্যই প্রাণ রাখিতে হইবে—মহাশ্বেতার মত জপমালা ধরিয়া অথবা শবরীর মত অর্ঘ্য সাজাইয়া।

রাধার আক্ষেপে নিখিল-জগতের সকল উপেক্ষিত হৃদয় হইতে উদ্গত যুগ যুগান্তরের বিলাপ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
কোন বিধি সিরজিল সোঁতের সেঁওলি। এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

শ্রীমতী বলেন—বঁধু আজ কি মনে পড়ে—'মুই ত অবলা অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি' বনের হরিণীকে বাঁশীর তানে ভুলাইয়া হাতে চাঁদ দিলেন, তারপর—স্রোতের সেওলার মতো ভাসাইয়া দিলে। ভুলিয়া গেলে—কুলে কালি দিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় নিলাম।

এতেক সহিল অবলা ব'লে ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।

তোমাকেই বা কি দোষ দিব? সকল দোষ আমারই।

আমারই জানা উচিত ছিল—

সোনার গাগরী যেন বিষ ভরি দুধেতে ভরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায় পরিণামে পায় দুখ।
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পূরিয়া যতনে তাহাকে পোষে।
কোন একদিন সেই বাদিয়ারে দংশে সে আপন রোষে।

রাধা সখীদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন—'আর কেহ যেন এ রসে ভুলে না ঠেকিলে জানিবে শেষে।'

সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে না চাহিও তার পানে কালিয়া বরণ যার দেখ।

বলিতেছি বটে সই—ছাড়িলে ছাড়ন যায় না যে। আমি ত ভুলিবার চেষ্টা কম করিতেছি না—

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে এবড়ি মরমে বড় ব্যথা,
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই কানাকানি শুনি এই কথা।
সই—লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ।
যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি নাহি চাই তরুয়া কদম্বতরু পানে।
যেখানে সেখানে থাকি বাঁশীটি শুনিয়া গো দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥

কিন্তু কালো জলও ঢালিতে হয়—কালো চুলও এলাইতে হয়। কাজেই কালাকে যে ভোলা যায় না।

উপেক্ষিতা রাধার প্রাণের বেদনা বুঝাইতে শ্যামের পীরিতি কত ভাবেই না উপমিত হইয়াছে! শ্রীমতী নিজেকে বনের মৃগী, জলের শফরী, গগনের চাতকীর সহিত উপমিত করিয়াছেন; এ সমস্তই গভীর প্রণয়-মথিত অভিমানের বাণী।

১। নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর লেহা।
২। আপনা খাইনু সোণা যে কিনিনু ভূষণে ভূষিব দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল এমতি কানুর লেহ।
৩। কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয়।

অনুরাগের একটি প্রধান অঙ্গ অনুযোগ। এই অনুযোগে যে অভিমান মিশ্রিত আছে—তাহাই রসের প্রেরণা।

ছায়ার আকার ছায়াতে মিলায় জলে বিম্বকি প্রায়।
হেন নিশাকালে নিশার স্বপনে তেমতি পীরিতি ভায়।

'যেদিন যাইয়া ধরেছিলে দুই পায়' সেদিনের কথা ভুলিয়া গেলে?

যেদিন দশনে কুটা ধরিলে সেদিনের কথা ভুলিয়া গেলে? শপথি করিয়া পীরিতি করিলে তাহা কই রাখিলে? আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম পুরুষ বলিয়া উদাসীন হইয়া আছ।

শ্রীমতী বড় বেদনাতেই বলিতেছেন—

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।
কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।
তখনি জানিবে পীরিতি কেমন জ্বালা।

দারুণ অভিমানে শ্রীমতী ভুরু নাচাইয়া বলিতেছেন—

পীরিতি রসের পশরাটি তাকি রাখালে বহিতে পারে?
রসিকের রীতি সহজ সরল রাখালে তাহা কি জানে?
চণ্ডীদাস কহে রাধার গঞ্জনা সুধাসম কানু মানে।

প্রেমের ইহাই ধর্ম্ম। প্রেয়সীর ভৎ র্সনা প্রেমের কলকাকলীর মত। এই অনুযোগের মাধুরীর লোভেই দয়িত নব নব অপরাধ করে। জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—কুটিল নেহারি গারি যবে দেয়বি তবহি ইন্দ্রপদ মোর।
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ র্সন। দেবস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।
প্রেমের এ রঙ্গ প্রেমিক বুঝে।

প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ—কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পীরিতি নিজেই জ্বালাময়ী—পীরিতির স্পর্শ একবার লাগিলে তাহার স্বস্তি-সুখ চিরদিনের জন্যই গেল।

শ্রীমতী পীরিতির স্বরূপ বলিতেছে—

কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে বুকের পাঁজর ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে॥

জানি না কাহার ধন আমি কড়িয়া লইলাম।

একদিকে 'কুলের করাতি' অন্যদিকে 'শ্যামের পীরিতি'—
এই দোটানায় শ্রীমতীর মন দোল খেলিয়াছে—আর চণ্ডীদাস রঙ্গ উপভোগ করিয়া রঙ ছড়াইয়া বলিয়াছেন—

যেই মনে ছিল তাহা না হইল সোঙরি পরাণ কাঁদে।
লেহ দাবানলে মন যেন জ্বলে হরিণী পড়িল ফাঁদে।
পালাইতে চায় পথ নাহি পায় দেখিয়ে অনলময়।
বনের মাঝারে ছটফট করে কত যে পরাণে সয়।

এ কিরূপ দশা—না—

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে।

শ্রীমতী বলেন—চরণ থাকিতে আমি পঙ্গু, বদন থাকিতে আমি মূক, আর নয়ন থাকিতে আমি অন্ধ—

এই দোটানা যখন অসহ্য হইয়াছে শ্রীমতী তখন গালাগালি করিয়াছেন, ডাইনী পাপপড়সীদের অভিসম্পাত দিয়াছেন—

আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর। দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর।
আবার তিনি মরণও চাহিয়াছেন—কিন্তু মরণও হয় না—"নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে।" মরিলে কি কলঙ্ক যাইবে? 'বিষ খেলে দেহ যাবে রব রৈবে দেশে।' শ্রীমতী শেষ পর্য্যন্ত বিজয়িনী—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন এদুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলি নিমিখে নিমিখে হারা।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখুন শ্যামবঁধু বিনু আর কেহ মোর নয়।
গুরু দুরজন বলে কুবচন সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু তিল ও তুলসী দিয়া।

শ্রীরাধার প্রেমের এই দ্বন্দ্ব-লীলার শেষ পরিণতি সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মরণ—সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। ইহা রস-জীবনের পরম সাধনা—সকল প্রেমেরই এই ধারা। জীবনে এই ধারা অনুসরণ করিয়াই সাধক শেষে পরমেষ্ট ধনকে লাভ করে। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ না হইলে পীরিতি জ্বালাময়ই থাকে—আত্মসমর্পণেই সুখ—পরম মুক্তি।

তোমার চরণে আমার পরাণে বাধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমতি হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী।
সতী বা অসতী তোহে মোর পতি তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর ভূষণে দূষণ বাসি।
অবলাজনের দোষ না লইবে তিলে কত হয় দোষ,
তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িও মোরে না করিও রোষ।
তুমি যে পুরুষ শকতি ভূষণ সকল সহিতে হয়।
কুলের কামিনী লেহ বাড়াইয়া ছাড়িতে উচিত নয়।
তিলেক না দেখি ও চাঁদ বদনে মরমে মরিয়া থাকি।
নয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া চণ্ডীদাস আছে সাথী।

সত্যই রাধার আত্মবিস্মৃত সর্ব্বস্বপণ প্রেমের যদি সাক্ষ্য মানিতে হয়—তবে চণ্ডীদাস হইতে বড় সাক্ষী আর মিলিবে না।

অসূয়া ও অমর্ষ গভীর অনুরাগের একটি অঙ্গ। শ্রীমতী কুল-মান-শীল সমস্তের শিরে পদাঘাত করিয়া নিজের যৌবনজীবন সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রত্যাশা করেন শ্রীকৃষ্ণ রাধা ছাড়া অন্য কাহারও প্রেমে বাঁধা পড়িবেন না। শ্যামনিন্দা তিনি সহিতে পারেন না—শ্যামানুরাগের নিন্দাও তিনি সহিতে পারেন না—শ্যামের সোহাগে অন্য কেহ অংশিনী হয়—তাহাও তিনি সহিবেন কেন? ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্।

রাধিকার প্রতিনায়িকা কেহ না থাকিলে লৌকিক হিসাবে ভাল হইত,

কিন্তু প্রতিনায়িকা না হইলে রসোৎসবের পরিপূর্ণতা হয় না,—রাধার প্রেমের মূল্য-মর্য্যাদাও বাড়ে না। প্রেম-লীলার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া কাব্যের বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য বৈষ্ণব কবিগণ চন্দ্রাবলীর অবতারণা করিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর নাম পুরাণে আছে—কবি চন্দ্রাবলীতে জীবনসঞ্চার করিয়া রাধানুরাগে নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন।

বাসক-সজ্জা করিয়া রাধিকা শ্যামের জন্য সারারাত্রি প্রতীক্ষা করিলেন—শ্যাম আসিলেন না। মালতীর মালা শুকাইল, অগুরু চন্দন চুয়ার আয়োজন ব্যর্থ হইল,—রাধার বেণীবন্ধন শিথিল হইল না—তাহার অঙ্গের মৃগমদ-পত্রলেখা লুপ্ত হইল না—শ্যাম আসিলেন না। শ্যাম তবে কোন্ কুঞ্জে গেলেন ?

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে শ্যাম—

"গলে পীতবাস করিয়া সাহস দাঁড়াল রাইএর আগে।"
রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি নাগরেরে পাড়ে গালি।
নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে কালোর উপর কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু দিন যাবে আজ ভাল।
নীল কমল ঝামরু হয়েছে মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি নিঙাড়ে লয়েছে লেহ।

এইভাবে রাধার প্রাণের বেদনা গভীর ব্যঙ্গরূপ ধরিয়া ব্যঞ্জনাগর্ভ রস-কবিতায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমতী যে কথা বলিলেন তাহা সাংঘাতিক—

সাধিলে মনের কাজ কি আর বিচার। দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম আমার।
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে। চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে।

সত্যই তাই। শ্রীমতী ব্যঙ্গভরে বলিলেন—তোমাকে এতকাল চুম্বন করিয়াছি—আজ প্রণাম গ্রহণ কর। এই প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া রাধা উচ্চতম

প্রেমসম্বন্ধকে সাধারণ পতিপত্নীর লৌকিক সম্বন্ধে নামাইয়া যে কোপ প্রকাশ করিলেন—এইরূপ কোপ আর কিছুতে প্রকাশ পাইতে পারে না। প্রেমের পাত্রকে ভক্তির পাত্র বলিলে তাহাকে বুক হইতে সরাইয়া মাথায় রাখা হয়—তাহাতে নিকটকে দূর করা হয়। ইহাতে অভিমানের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করা হয়। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"এ কথা বলিলে কেমনে?" যে ভক্তি প্রেমের তরল অবস্থা শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভক্তির ভয় দেখাইলেন। দাস্যরস নিম্নস্তরের বস্তু—দাস্যরসের স্তরে নামিয়া আসিয়া শ্যামকে জব্দ করিতে চাহিলেন। মাধুর্য্যের ক্ষীর-সরোবরের কলহংসকে দাস্যরসের ক্ষারসরোবরে টানিয়া আনার মত দণ্ড আর কি আছে?

তারপর শ্রীমতী মানে বসিলেন—দুর্জ্জয় মানে। সখীরা অনেকে সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। শ্যামের হইয়া ওকালতি করিতে আসিয়া তাহারা বলিল—

সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত না বৈসে নদীর তীরে।
নবজলধর বরিষণ বিনে না পিয়ে তাহার নীরে।
যদি দৈবদোখে অধিক পিয়াসে পিবয়ে সে নীর থোর।
তবহু তাঁহারি জল সোঙরিয়ে গলে গতগুণ লোর।

শ্রীমতীর উত্তুঙ্গ মান-শৈল তাহাতে বিগলিত হইল না—তখন সখীরা শাসাইয়া কহিলেন—মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া নিভাইবে আর কিসে? চণ্ডীদাস তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠে মিলাইয়া বলিলেন—শ্যামজলধর আর মিলিবে না কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে। এই ভাবে শ্রীমতীর আশঙ্কার সঙ্গে অনুতাপ জন্মিল।

কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল গোড়া কেটে আগে জল দিয়া।

এ দিকে শ্যামের অবস্থাও তথৈবচ। শ্রীকৃষ্ণ সখীকে বলিতেছেন—

হাত দিয়া দেখ সই মোর কলেবর। ধান দিলে হয় খই, বিরহ প্রখর।
জিভা খণ্ড খণ্ড হলো রাধা রাধা বলি। তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হৈল সলি।

মরিলে পোড়াইও সই যমুনা কিনারে। সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে।
মরিবার বেলে রাধা সোঁওরাও একথা। জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা॥
সখীরা আবার রাধার কাছে গেলেন—তখন রাধার কৃপা হইল।

এই যে মানের লীলা—ইহার কতকটা প্রথাগত,—সংস্কৃত সাহিত্য ও সেকালের সাহিত্যে যেরূপ নির্দ্দেশ ছিল বৈষ্ণব কবি তাহার কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতকটা চণ্ডীদাসের নিজস্ব। বাঙ্গালী কবির নিজস্ব অংশই সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্টতর। গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাষায় মান ভঞ্জন করিয়াছেন—তাহা প্রাণের ভাষা নয়। তাহা বরাত-দেওয়া অলঙ্কৃত ভাষা—ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরিয়াছিলেন, নতুবা শ্রীমতী নাটুকে ভাষায় আরও চটিয়া যাইতেন। চণ্ডীদাসের মানলীলায় একটা অকৃত্রিম মাধুর্য্য আছে—কবি কোথাও রসশাস্ত্রের প্রথা অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

এই দুর্জ্জয় মান দূর করিবার জন্য যে নারীকে শ্যাম উপেক্ষা করিয়াছিলেন চণ্ডীদাস শ্যামকে সেই নারীরূপই ধরাইয়াছেন।

নাপিতানীর ছদ্মে কবি রাধার চরণ ধরাইয়াছেন—

চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে। যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে।

তারপর রাধা দেখিলেন—

কি ছার মানের দায়ে রমণী সাজিল। এত বলি সুন্দরী পাশে দাঁড়াইল।

(চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সম্ভোগের বিশেষ স্থান নাই॥ চণ্ডীদাস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের কবি,—সম্ভোগের মাদকতা তাঁহার অন্তরে রসাভাস ঘটায়। সম্ভোগের মধ্যেও তিনি আনন্দ পান না।)—তাই তিনি বলেন—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"
"নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূর মানি।"

Shelley যেমন বলিয়াছেন—

We look before and after and pine for what is not.

Our sincerest laughter with some pain is fraught.

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

অতীত-ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া বর্ত্তমানে মুহ্যমান হইয়া ভোগ করিতে না পারিলে অবিমিশ্র আনন্দলাভের উপায় নাই। গভীর অনুরাগ কখনও অতীত-ভবিষ্যৎকে ভুলিতে পারে না। মায়ের গভীর স্নেহ তাই নিত্যশঙ্কী। অনাগত অনর্থের শঙ্কায় সজল নয়নে জননী সন্তানকে বুকে চাপিয়া ধরে। গভীর প্রেম সম্বন্ধেও এই কথা। প্রেমিক প্রেমিকাকে বুকে চাপিয়াও মেঘপানে চাহিয়াই অন্যমনা হইয়া যায়—কেবল ভাবে এত সুখ সইবে ত?—এ মিলন যদি চিরন্তনই না হয়—এ মিলনে যদি বিচ্ছেদই ঘটে, তবে এ মিলনে সুখ কোথায়? গভীর প্রেম বিচ্ছেদাশঙ্কায় অস্থির—মিলনেও তাই চোখের জল ঝরে। চণ্ডীদাসের প্রেম এই শ্রেণীর। তাই সম্ভোগের মাদকতা তাঁহার কাব্যে নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীমতী স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিতেছেন তাহাতেই বা মাদকতা কোথা?

"পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়রপাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।
পরশ করিতে রস উপজিল জাগিয়ে হইনু হারা।

কিন্তু কপোতপাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়—তেমনি উচ্চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলাম—আর রস সম্ভোগ হইল না।" জ্ঞানদাসেও স্বপ্নমিলন আছে—কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের নির্ম্মম বাস্তবতা পর্য্যন্ত তিনি যান নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যে মাথুরের মত করুণ চিত্র আর নাই। সম্ভোগের কবি জয়দেবের এ বালাই ছিল না—বিরহের কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ইহা রসমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মুরলীর আহ্বানে আপনার যে লীলাকুঞ্জে মোহমুগ্ধ তরুণ তরুণীদের আহ্বান করিয়া লীলাময় রসোৎসবে নিজে মাতিলেন, সকলকে মাতাইলেন—ভেরীর

আহ্বানে অনায়াসে অবলীলায় সেই লীলাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া জীবনমরণের মহাসংগ্রামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য বেদনার কিছুই নাই। মুকুল যেমন ফলে পরিণত হয়—তাঁহার স্বপ্ন তেমনি সত্যে রূপান্তরিত হইল। ইহাতে কারুণ্যের কিছু নাই। যাহারা লীলাকে সর্ব্বস্ব মনে করে—যাহারা জলের মধ্যে মীনের মত স্বপ্নের মধ্যে জীবনযাপন করিতে শিখিয়াছে—বেদনা তাহাদেরই জন্য। লীলাময়ের বাঁশী অসিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু বংশীরবমুগ্ধ লীলাসহচর লীলাসহচরীদের মালা যে জ্বালা হইয়া জ্বলিতে থাকে।

বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসও মাথুরের আতুর আবেদন সর্ব্বপ্রথম গাহিয়া গিয়াছেন—তারপর কত কবি বিনাইয়া বিনাইয়া কবির অনুসরণে কত সঙ্গীত না রচনা করিয়াছেন। দুই চণ্ডীদাসের অশ্রুধারা আজ কত নদনদীর রূপ ধরিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের চিত্ত করুণায় শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে।)

যুগে যুগে দেশে দেশে এমনি করিয়া কত রসোৎসব ভাঙ্গিয়া যায়—কত স্বপ্নকুঞ্জে আগুন ধরিয়া যায়—কত আনন্দ-নিকেতন শ্মশান হইয়া যায়—কত প্রেমানন্দের মালঞ্চে নিদাঘ নিশ্বাস লাগে—লীলাভুবন ছাড়িয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে কত নরনারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পিছুপানে তাকাইতে তাকাইতে দূরে দূরে চলিয়া যায়—তাহাদের সকল বেদনা এই মাথুরের শোকঘন সঙ্গীতের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত আছে। ইহারই প্রধান কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের কণ্ঠে নিখিলের সকল বৃন্দাবন সকল লীলাভুবন সকল স্বপ্ন-মালঞ্চই আর্ত্তনাদ করিয়াছে।

এত নিবিড় অনুরাগ যে ছায়াবাজির মত, স্বপ্নের মত, জলবিম্বের মত মিলাইয়া যাইতে পারে, শ্রীমতী তাহা ভাবিতেই পারেন নাই। প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া, বহু বেদনা গঞ্জনা সহিয়া ভালবাসিয়া জগতের কোন শ্রীমতী তাহা ভাবিতে পারে? আশা যত ক্ষীণই হউক—সেই বৃন্তে ভর করিয়া তাহার পরিম্লান জীবনকুসুম ধীরে ধীরে শুকাইতে থাকে। শ্রীমতী ভাবিয়া-

ছিলেন—শ্যাম ফিরিয়া আসিব বলিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহা মিথ্যা হইবার নয়। চাতকী যেমন করিয়া নবজলধরের একবিন্দু বারির জন্য সারা গ্রীষ্মকাল আকাশে শুষ্ককণ্ঠ বিস্তার করিয়া থাকে—শ্রীমতী তেমনি অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন—

সখিরে—মথুরা মণ্ডলে গিয়া
আসি আসি বলি পুন না আসিল কুলিশ কঠোর হিয়া ॥
আসিবার আশে দিবস লিখিনু খোয়ানু নখের ছন্দ,
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে দুআঁখি হইল অন্ধ।

* * * *

কালি বলি কালা গেল মধুপুর সেকালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাটা তাহারে কেমনে রাখি।
জোয়ারের পানি নারীর যৌবন গেলে না ফিরিবে আর,
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব যৌবন মেলা ভার।
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল ভ্রমরা উড়িয়ে গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঁয়ানু বঁধু নাহি ফিরে এল।
বঁধু নাহি ফিরে এল।
এ নব যৌবন পরশরতন কাচের সমান ভেল।

জীবন থাকিলে—একদিন দণ্ডকারণ্যের শরবীর মত তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে—যৌবন গেলে অসময়ে আর রসময়কে পাওয়া যাইবে না। ব্যর্থ যৌবনের এই হাহাকার জগতের সাহিত্যে অমর।

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। পাখী হইয়া উড়ি যাই পাখা দেয় না বিধি।
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার। কলসে কলসে সিচো না ঘুচে পাথার।
আগুনেতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায়। পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায়।
তরুতলে যাই যদি না দেয় সে ছায়া। যার লাগি মরি তার কোথা দয়া মায়া।

তোমরা চলিয়া যাও আপনার ঘরে। মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাস বলে কেন কহ হেন কথা। শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা?

দেহত্যাগ ত বড় কথা নয়—স্নেহত্যাগই বিষম কথা। দেহ যে প্রেমের গেহ। দেহ গেলে প্রেম কোথায় থাকিবে? প্রিয়ের আশায় আশায় দেহ রাখিতে হয়। যদি প্রিয় না-ই আসে তবে তাহার প্রেমকে পোষণ করিয়াও একটা সান্ত্বনা আছে। তাহার লোভেও দেহত্যাগ করা চলে না। প্রেমের জন্য দেহরক্ষার যে আত্মনিগ্রহ তাহার চেয়ে বড় তপস্যা কি আছে? এ তপস্যা যদি ব্যর্থ হয় তবে প্রেমময়ের এই লীলাভুবনই মিথ্যা। শ্রীমতীর হৃদয় প্রেমের অনলে ধূপের মত পুড়িয়াছে—সেই ধূপের গন্ধে বঙ্গসরস্বতীর মন্দির চিরদিন আমোদিত হইয়া আছে।

শ্রীমতী বৃন্দাবনের পথে ঘাটে বাহির হইলেই ভাবঘোরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—একটি একটি করিয়া সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

বৃন্দাবনের রাধা পথে ঘাটে মূর্চ্ছিত হয়—আর জগতের ঘরে ঘরে যত রাধা ঘরসংসারের হাজার স্মৃতি বুকে পুষিয়া অশ্রুপাত করে। এ কাহিনী চিরন্তনী। শ্রীমতী বলিতেছেন—এই শতস্মৃতিকণ্টকিত বৃন্দাবনে আর থাকিব না-সীতার মত আমি বনবাসিনী হইব—এই বিনোদ কবরীকে জটায় রূপান্তরিত করিব—বনে গিয়া যোগিনী হইয়া কানুর ধ্যান করিব।

শ্রীমতী দূতীকে বলিতেছেন—

সখি, কইও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করয়ে সে মোরে দেখিলে হাসে।
কার শিরে হাত দিয়ে
কদম তলাতে কি কথা বলিলে যমুনার জল ছুঁয়ে।
এতেক সহিনু অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।

শ্রীমতীর সখীদেরও তিরস্কারের অধিকার আছে। তাহারা বলিতেছে—

ধিক্ ধিক্ বঁধু লাজ নাহি বাস না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলে অনল জ্বালায়ে জ্বালাইতে আর দেশ।
চণ্ডীদাস বলে মনের বেদনে কহিতে পরাণ ফাটে
সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি কুবুজা বসেছে খাটে।

শ্রীরাধার বেদনায় আর্ত্ত গৌড়জনকে প্রবোধ দিবার জন্য কবি রাধাকৃষ্ণের ভাবলোকে মিলন ঘটাইয়াছেন। ইহাকে বলিয়াছেন—ভাবসম্মিলন। ভাব সম্মিলনে শ্রীমতীর মুখে যে পদগুলি বসাইয়াছেন—প্রেমের আত্মসমর্পণের দিক্ হইতে তাহার তুলনা নাই। কোন বাঙ্গালী আছে যে শুনে নাই?

বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি?

এই গান শুনিয়া বাঙ্গালী বুঝে,—লৌকিক জীবনেরই হউক আর আধ্যাত্মিক জীবনেরই হউক সকল প্রেমাস্পদের উদ্দেশে বাঙ্গালার অন্তরের ইহাই চিরন্তন আবেদন।‡

‡ ভাবসম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া চণ্ডীদাস যাহা বলাইয়াছেন—তাহা প্রকৃত ভক্ত ছাড়া আর কেহ বলাইতে সাহস করিত না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিতেছেন—

ভজন সাধন করে যেই জন তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ তুমি রসময় নিধি।
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে কি হইব পার?

ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া বলিতেছেন রসের 'সায়রে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি।' প্রকারান্তরে কবি বলিতে চাহিয়াছেন—সকল ভজন পূজনের চরম, প্রেমের সাধনা—প্রেমের সাধনাই ভবার্ণব তরিবার 'নায়ের কড়ি'। একমাত্র রসসাধনাই মানুষকে অমর করিতে পারে। বাণী যেমন রসের সায়র হইতে না উঠিলে—অর্থাৎ রসময়ী না হইলে অমর হয় না—প্রাণীও তেমনি রসের সায়রে অবগাহন না করিলে অমৃতত্ব লাভ করে না। আমরাও শ্রীমতীকে বলি—তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে রসের সায়রে ডুবাইয়া অমর করিয়াছ, নতুবা তিনি পৌরাণিক

কল্পনা হইয়াই থাকিতেন—তোমারই কৃপায় ভক্ত তাঁহাকে রসলোকে পাইয়াছেন—আমরা তাঁহাকে কাব্যলোকে পাইয়াছি। আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

গঞ্জন বচন তোর শুনি সুখে নাই ওর সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ-নয়নে দেখি বিকাইনু জনমে জনমে।
তোমা বিনা যেবা যত পীরিতি করিনু কত সে পীরিতে না পূরল আশ।
তোমার পীরিতি বিনু স্বতন্ত্র না হইল তনু অনুভবে কহে চণ্ডীদাস।

যিনি প্রেমের বশ, তিনি স্তবস্তুতি চাহেন না—বরং তাঁহার কাছে প্রেমের অনুযোগ, অভিমান ও গঞ্জনাই অধিক প্রীতিকর। গঞ্জনারচনের ছলে তিনি ঐ প্রেমই চাহেন। রাধা-প্রেম মধুররসের আদর্শ—মধুররসের প্রেমে তিনি বশীভূত—তাঁহার কাছে অন্য রসের প্রীতি "এহো বাহ্য"। বৈষ্ণবরা বলেন—এই মধুররসের অনির্বচনীয় আস্বাদ লাভের জন্যই 'এক' তিনি 'দুই' হইয়াছেন—তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে—তাঁহার মহামায়াকে রূপ দান করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

চণ্ডীদাস বৈষ্ণব রসের চরম কথাটি এখানে বলিয়াছেন—

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার।

যাহাকে না হইলে রসাস্বাদ সম্ভব নয়—তাহার জন্য যে গোলোকনাথকে গোকুলে গোরু চরাইতে হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি। ঐশ্বর্য্যভাবমুগ্ধ ভক্ত মনে করে—রাখাল বানাইয়া, কিশোরী আভীরকন্যার প্রেমের কাঙ্গাল বানাইয়া বুঝি রসলোভীরা ভগবানকে ছোট করিতেছে—তাই কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলিয়াছেন ইহাতে যে সন্দেহ করে তাহার কোটিযুগের সাধনভজনও বিফল। তারপর—কহিতে কহিতে রসিকনাগর তিতিল নয়ন জলে।

আমরাও বলি প্রেমিকার বেদনায় যে প্রেমাস্পদের চোখে জল ঝরিবে না—সে প্রেমাস্পদকে আমরা চাই না। আমরা যে ভগবানকে চাই সে ভগবান যদি আমাদের না চায়—আমাদের আর্ত্তিতায় যে ভগবানের চোখে জল ঝরে না—যে ভগবান্ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম চক্রের নেমিতে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইয়া বসিয়া আছে তাহাকেও আমরা চণ্ডীদাসের মতই চাহি না।

গৌরপদাবলী

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পদাবলী বঙ্গসাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। এই পদাবলী যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, নরহরি সরকার ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত, বংশীবদন, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু, নয়নানন্দ, অনন্তদাস ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। আর গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, ঘনশ্যাম, নরোত্তম, নরহরি চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি কবিগণ মানসনয়নে শ্রীচৈতন্যলীলা উপভোগ করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের পদই কাব্যাংশে চমৎকার হইয়াছে।

গৌরলীলার কবিগণ যে ভাবটিকে মনে রাখিয়া গৌরলীলার বর্ণনা করিতেন বলরামের নিম্নলিখিত পদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—

কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ কি কহব না পাইয়া ওর।
ভাবিয়া দেখিছু মনে তোহারি স্বরূপ বিনে এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেমগুরু করি নদীয়াতে করব উদয়।

স্বরূপ দামোদরই এই তত্ত্বের প্রচারক। *

* চণ্ডীদাসের কোন কোন পদের অংশবিশেষকে এইদিক হইতে ব্যাখ্যা করা হয়—

দেখিতে দেখিতে না চিনিয়ে কালা কিংবা গোরা।

এই চরণকে গৌর অবতারের অভিসূচক মনে করা হয়। চণ্ডীদাসের—

"সাগরে যাইব কামনা করিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দনন্দন তোমারে করিব রাধা।"

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবে বিভাবিত পরম ভক্ত ও কৃষ্ণাবতার (ভক্তাবতার, তাদাত্ম্যাপন্নতয়াবতীর্ণ বা ভক্তরূপেণ অবতীর্ণঃ যতিবেশঃ হরিঃ) বলিয়া মনে করিতেন এবং শ্রীচৈতন্যের মহাভাব-বিলাসকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় উপাসনা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে বৈধীভক্তির পথে উপাস্য ছিলেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তিপথের উপাসনা প্রচার করেন। ইঁহাদের চিন্তা ও বক্তব্য সংস্কৃত ভাষাতেই উপনিবদ্ধ। কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহাদের উপদেশমত ঐ তত্ত্ব বঙ্গভাষায় বিবৃত করেন।

বঙ্গের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যথা—মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, কবিকর্ণপুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসু ঘোষ, লোচনদাস ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভাবাশ্রিত বিগ্রহেরই রাগানুগা-ভক্তির পথে উপাসনা গৌড়দেশে প্রচার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনেই তাঁহারা ব্রজলীলার পুনরভিনয় দেখিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্য প্রধানতঃ গৌড়দেশ। সেজন্য ইঁহারা প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষাতেই ইঁহাদের বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপুর সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখিলেও বাংলাতেও

এই পদটিকে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণের প্রতিশ্রুতি বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।

ফিরে ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া। দেশে দেশে ফিরিব আমি যোগিনী হইয়া।
কালো মাণিকের মালা তুলে নিব গলে। কানুগুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥

ইত্যাদি পদকে সন্ন্যাসিরূপে পুনরাগমনের সংকল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

আজু কেগো মুরলী বাজায়। এতো কভু নহে শ্যামরায় ইত্যাদি পদের শেষ দুই চরণ—চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এ রূপ হইবে কোন্ দেশে। ইহা হইতে মনে হয়—চণ্ডীদাস গৌরাঙ্গের আগে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকারান্তরে গৌর অবতারের ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য—এ পদকে কেহ বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে করে না। ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্পর্কীয় অবতারবাদের প্রচার-বিভাগের কার্য্য (propaganda)।

পদাবলী রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের উপাসনার প্রবর্ত্তন প্রধানতঃ বৈদ্য জাতীয় সাধকদের কীর্ত্তি। ইহাই গৌর পারম্যবাদ।

অলৌকিক শক্তি ও মহাভাববিলাস দর্শন করিয়াই ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া চিনিতে পারেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই উপলব্ধির সমর্থন পাইয়াছিলেন ভাগবতের দুইটি শ্লোকে। সেই শ্লোক দুইটি এই—

আসন্ বর্ণস্ত্রয়ঃ হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ভাগবত দ্বাপরে (?) লিখিত, অতএব পীতবর্ণ কলিযুগের।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

বলা বাহুল্য, ভক্তগণ তাঁহাদের ভাববিশ্বাসের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ণের কথাটা তত বড় নয়, সংকীর্ত্তন কথাটার অবশ্য সার্থকতা আছে।

গৌরপারম্যবাদের সাধকগণ শ্রীচৈতন্যকে নাগররূপে দেখিয়াছেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসিবেশ ইঁহাদের রুচিকর হয় নাই।

১। চাঁচর চুলে চাঁপার ফুলে চারুচঞ্চরী চলে।
জলঝলমল সুরুজ লুকায় তায় অলকাকোলে। সর্বানন্দ।

২। শ্রুতি পদ্মযুগমূলে কনককুণ্ডল দুলে পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
চাঁচর চিকুর মাথে চম্পককলিকা তাতে যুবতীর মন মধুকর।
করিবরকর জিনি বাহু যুগ সুবলনি অঙ্গদবলয়া শোভে তায়,
অরুণ বসন সাজে চরণে নূপুর বাজে বাসু ঘোষ গোরাগুণ গায়।

৩। অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর বিহরই নবদীপ মাঝ।
করিবর জিনি বাহু সুবলনি দোসারি গজমতিহার।
সুমেরুশেখর উপর যৈছন বহই সুরধুনি ধার। গোবিন্দদাস।

৪। উপর পরিসর নানা মণিহার মকর কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি হানয়ে মরম বাণে।
বিনোদবন্ধন ঢুলিছে লোটন মল্লিকা মালতী বেড়া,
নদীয়া নগরে নাগরীগণের ধৈরজধরম ছাড়া। রায়শেখর।

৫। ধবলপাটের জোড় পরেছে রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে চরণ উপর ঢুলিয়াছে কোঁচা। বাঁকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুরমধুর রূপ দেখিতে ভুবন মুরুছা।
—(লোচনদাস)

প্রবোধানন্দ সরস্বতীও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে চৈতন্যের ঐ রূপেরই ধ্যান করিয়াছেন—

কোঽয়ং পট্টধটী বিরাজিত কটীদেশঃ করে কঙ্কণম্।
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্॥
ঊর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুণ্ডলভবপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা।
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যান্নিজৈর্নামভিঃ॥

বৃন্দাবন দাস এই গৌরনাগর ভাবের বিরোধী ছিলেন। তিনিও গৌরাঙ্গের উপাসক ছিলেন—কিন্তু তাঁহার এই কল্পিত রূপে নয়—বাস্তবরূপেই। তিনি ভাগবতে বিবৃত শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত মিলাইয়া গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করেন। সেজন্য তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন চৈতন্য ভাগবত। তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনে কেবল শ্রীকৃষ্ণ নয়, বিষ্ণুর সকল অবতারকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন।

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপলীলায় কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া রাধা রাধা বলিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন—নীলাচলে তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া দিব্যোন্মাদ প্রাপ্ত হইতেন।) একভাব হইতে অন্যভাবে পরিণতি অস্বাভাবিক নহে। বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজভাব সভাবহি বিছুরল আপন গুণ লুবধাই।

অনুখন রাধা রাধা রটতহি আধা আধা কহ বাণি।

রাধা সঙে যব পুন তঁহি মাধব মাধব সঙে যব রাধা।

রাধার বিরহজীবনের যে ভাবোন্মাদ বিদ্যাপতির দ্বারা কল্পিত, তাহারই অনুরূপ ভাবোন্মাদ শ্রীচৈতন্যের জীবনে পরিস্ফূর্ত্ত। অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞেরা বলেন—রায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্ববিচারের পর হইতে শ্রীচৈতন্যের জীবনে কৃষ্ণভাবের স্থলে রাধাভাবের উন্মেষ হয়। যেজন্যই হউক—চৈতন্যের রাধাভাব ও কৃষ্ণভাব দুই ভাবেরই দিব্যাবেশ লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্ব বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ত্বের অবতারণা ও ব্যাখ্যা আছে। সেই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত। স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত।

অন্য যে কেহ তাহা জানেন—তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা হইতেই জানিয়াছেন। স্বরূপ গোসাঞির সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যের শেষজীবনে অথবা তিরোধনের পর প্রচারিত হইয়াছিল।

গৌরাঙ্গলীলা ব্রজলীলারই অনুপূরক। শ্রীচৈতন্যরূপে রাধা ও কৃষ্ণের একদেহে মিলন। 'তনু তনু মেলি হোই একঠাম।' ব্রজে অনুপভুক্ত রসাস্বাদনের জন্য ও রাধাপ্রেমের মহিমাপ্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে একদেহে কৃষ্ণরাধা অবতীর্ণ। (রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে?) ইহাই গৌরলীলার অন্তরঙ্গ বার্ত্তা। বহিরঙ্গ বার্ত্তা জগতে প্রেম বিতরণ।

"কলিকবলিত কলুষজড়িত দেখিয়া জীবের দুখ।

করল উদয় হইয়া সদয় ছাড়িয়া গোকুল সুখ।"

"বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন ব্রজবাসী সখাসখী সঙ্গে।"

ব্রজের সখাসখীরাই শ্রীচৈতন্যের অনুচর সহচরগণরূপে অবতীর্ণ। গৌরলীলায়

কবিগণ এই তথ্যটিকে পদরচনায় বিস্মৃত হ'ন নাই। বহু পদে এই কথাটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে।

গৌরলীলার কতকগুলি পদ কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা। কতকগুলি তাঁহার মহিমার বর্ণনা। কতকগুলি দেবতার স্তবের অনুকরণে স্তবমাত্র। সাধক কবিগণ পদের উপসংহারে চরণাশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। অথবা করুণাসিন্ধুর কৃপাবিন্দু লাভ না করিয়া তাঁহারা আপনাদের ধিক্কৃত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোচনের একটি পদ তুলি—

অবতারসার গোরা অবতার কেন না চিনিল তারে।
করি নীরে বাস গেল না তিয়াস আপন করম ফেরে।
কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই অমৃতফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার তাহারে ভাবিলি বিষে।
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ চুষিলি কেমনে লাগিবে মিঠ।
হার বলিয়া গলায় পরিলি শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুনি পোহালি পাইলি বজর তাপ।
সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া না শুনিলি মোর কথা।
ইহপরকাল উভয় খোয়ালি খাইলি আপন মাথা।

শ্রীগৌরাঙ্গকে যে চিনিল না তাহার মত অভাগ্য কে আছে? অনেক পদে সেই অভাজনদের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ হইয়াছে—

ভব তরিবারে হরিনাম মন্ত্র ভেলা করি আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবু যে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে পরমানন্দের পরিহার।

ভক্তকবিরা বলিয়াছেন—গৌরাঙ্গ ভজনই সর্ব্বজ্ঞানের চরম সিদ্ধি—

"যেবা চারি বেদ ষড় দর্শন পড়িয়াছে, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন যেন দরপণে অন্ধে কিবা কাজে।

বেদবিদ্যা দুই কিছুই না জানত সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে সেই সে সকল জানে সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

শ্রীচৈতন্যকে যে মানে না কবিরা তাহার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—

১। দৈবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু নাহি জানে সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর।

২। নাচত উনমত ভকত ময়ুর। অভকত ভেক রোয়ত জলে বূর। (বলরাম)

৩। এমন দয়াল তুহুঁ যে না ভজে হেন পহুঁ সে ছারের জীবনে কি আশ?
সন্ন্যাসী বিপ্র ইহ অসুরগণ সেহ অনন্তদাসের এই ভাষ। ‡

---

‡ শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে পদাবলীতে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় যেমন বলরামদাস শ্রীচৈতন্যের কামিনী-কাঞ্চনে অসামান্য বৈরাগ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

সঙ্গে বিলসিত যার রাধাচন্দ্রাবলী আর কতশত ব্রজ কিশোরী।
এবে পহুঁ বুকে বুক না হেরেন নারীমুখ কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী।
সদা গোপীসঙ্গে রহে নানারঙ্গে কথা কহে এবে নারী নাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে।
ছাড়ি নাগরালিবেশ ভ্রমে পহুঁ দেশ দেশ পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজগুণে উদ্ধারিল জগজনে বলরামদাস রহু দূরে।

লোচন, বাসু ঘোষ যাঁহাকে নাগররূপে সাজাইয়াছেন বলরাম তাঁহার কথা বলিয়াছেন—

মরকত বরণ রতন মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস।

অনন্ত আচার্য্য বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্যের বিরোধীরা তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া শেষে পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল ভজিল বলিয়া নারায়ণ।

দক্ষিণাপথ ভ্রমণের সময় চৈতন্য সাধারণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—'কপটে সন্ন্যাসী বেশ ভ্রমিল অশেষ দেশ'।

প্রেমানন্দ বলেন—তিনি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য অভিমান দূর করিয়াছিলেন।

হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।

কতকগুলি পদে ছন্দোবন্ধের চাতুর্য্যের সহিত অলঙ্কৃত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে। এই শ্রেণীর পদরচয়িতাদের মধ্যে গোবিন্দদাসই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর পদগুলিই সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। কতগুলির দৃষ্টান্ত দিই—

১। ভকত কল্পতরু অন্তরে অন্তরু রোপয়ে ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে অবলম্বন পথিক পূরয়ে নিজ নিজ কাম।
ভাবগজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে ঐছন পহুঁক বিলাস।
সংসার-কাল-কূট বিষে দগধল একলি গোবিন্দদাস॥

২। অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো এক কৈল স্বধই স্নেহ।
ইন্দ্রধনুক আনি গোরার কপালে গো কেবা দিল চন্দনের রেখা।
পুরুষের স্বরূপ যত কুলের কামিনী গো দুহাত করিতে চায় পাখা।
নাচায় আঁখির কোণে সদাই সভার মনে দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি মুখের লালস গো আলসল জরজর গায়।
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভলড়ে গুণ গায় অসুর পাযণ্ড।
ধূলায় লুটায়্যা কাঁদে কেহ থির নাহি বাঁধে গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড।
(লোচন দাস)

বলরাম বলিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী"। "যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম"।
"রাজা ছাড়ে রাজ্যভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যানযোগ জ্ঞানী কাঁদে ছাড়ি জ্ঞানরসে।"

হরিপ্রেমে পাগলিনী হইয়া কুলের বধূও লোক-লজ্জা জয় করিয়াছে, যবনেও হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, ধনী ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছে—জ্ঞানযোগীরা জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া প্রেমের পথে যাত্রী হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যের জীবনের এ সকল কথা গৌরপদাবলীরও উপজীব্য।

৩। আজু সুরধুনী তীরে নাচত গৌর ঘন অবতার।
ললিত তনুদ্যুতি দমকে দামিনি চমকে অলি আঁখিয়ার॥
সঘনে হরিহরি বোল গরজন হোয়ত জগৎ বিথার।
ভকত শিখী অতি মত্ত গায়ত ষড়্‌জ সুর পরচার॥
তৃষিত চাতক অখিল জন পিয়ে প্রেমজল অনিবার।
ধন্য ধরণী সুভাগ ভয় বিহি দুলহ মোদ অপার॥
ভণত ঘন ঘনশ্যাম ঐছন দিনকি হোয়ব আর।

[ঘনশ্যাম এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের 'ঘন' অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন।]

৪। হেমবরণ বর সুন্দর বিগ্রহ সুরতরু বর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পকফল কুসুম মন্দ মৃদু হাস॥
নাচত গৌর মনোহর অদভুত রাজিত সুরধুনীধার।
ত্রিজগত লোক ওক ভরি পাওল ভকত রতন মণিহার॥
ভাববিভবময় রসরূপ অনুভব সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদমত্ত গতি অতি সুমনোহর মূরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল ধনি নদীয়াপুর ধনিধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার ধনিরে ধনি কীর্ত্তন জ্ঞানদাস নহ পার।

৫। নীরদ নয়ানে নবঘন সিঞ্চন পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাব-কদম্ব।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনীতীরে উজোর।
চঞ্চলচরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর।
অবিরত প্রেম রতনফল বিতরণে অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দদাস রহু দূর।

৬। অরুণ কমল আঁখি তারক ভ্রমর পাখী ডুবুডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমা চাঁদে ছটায় পরাণ কাঁদে তাহে নব প্রেমার আরম্ভে।
পুলকে পূরল গায় ঘর্ম্মবিন্দু বিন্দু তায় রোমচক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু যেন প্রভাতের ভানু আধবাণী কহে কম্বুকণ্ঠ।
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর দীপ হেন তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস।
কোটিকোটি ফুলধনু জিনিয়া বিনোদ তনু তাহে করে প্রেমের প্রকাশ।
(লোচনদাস)

৮। নিন্দই ইন্দুবদনরুচি সুন্দর বদনই নিন্দই কুন্দ।
বদন ছদন রুচি নিন্দই সিন্দুর ভুরুযুগ ভুজগগতি নিন্দ।
সুরধুনী-তটগত হরিণনয়নী কত গুরুজন করইতে আন্ধে।
কতকত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তছু লোচন ফান্দে।
তুয়া মুখ সদৃশ সুধাকর নিরজনে নিরখিতে যব কহ মন্দ।
কঙ্কণ ঘাতে মাথে দেই কাঁদই কি করব জগদানন্দ॥

কতকগুলি পদে অলঙ্কতির বড় বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে। এই পদগুলি সাধারণতঃ ক্লিষ্টরূপক ও শ্লিষ্টরূপকে গঠিত। এইগুলিতে ভক্তির গভীরতা প্রকাশিত হয় নাই—কাব্যাঙ্গেও এইগুলি উৎকৃষ্ট হয় নাই। তবু এইগুলির চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। কতকগুলি এই শ্রেণীর পদের নামোল্লেখ মাত্র করি।

১। শান্তিপুরের বুড়া মালী বৈকুণ্ঠ বাগান খালি
করিয়া আনিল এক চারা। (কৃষ্ণদাস)

২। কলিযুগ মত্তমতঙ্গজমরদনে কুমতি করিণী দূরে গেল।
পামর দূরগত নাম মোতিমশত দামকণ্ঠ ভরি দেল।
ত্যাগযাগ যম তিরিখি বরত শম শশ জম্বুকী জরি জাতি।
বলরাম দাস কহ অতএ সে জগমাহ হরি হরি শবদ খেয়াতি॥

৩। দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস
পুন গিরি ধারণ পূরব লীলা ক্রম নবদ্বীপে করিল প্রকাশ।
কালমেঘ বরিষণে ক্রোধবজ্র নিক্ষেপণে লোকের হইল বড় ভয়।
লোভমোহ শিলাঘাতে মাৎসর্য্যাদি খরবাতে ধৈর্য্যধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর।
(চৈতন্যদাস)

৪। সো গিরি গোচর বিপিনহি সঙ্কুল কুশকোটি কর অবগাহ
চম্পক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ।

৫। নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ। সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি সংকীর্ত্তন মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ। (কলির রণসজ্জা) *

এইভাবে শ্রীচৈতন্যের সহিত সিংহ, চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, কল্পতরু, মেঘ ইত্যাদির উপমা দিয়া আদ্যোপান্ত সাঙ্গরূপকে বহুপদ লিখিত হইয়াছে। এই সকল পদে ভক্তির মাধুর্য্য গৌণ,—অলঙ্কৃতিচাতুর্য্যই মুখ্য। এই সকল উপমায় বিরক্ত হইয়াই যেন সঙ্কর্ষণ দাস বলিয়াছেন। "ঐ সকল উপমার কোন সার্থকতা নাই—কারণ—

কল্পতরু অভিলাষ করয়ে পূরণ। যে জন তাহার স্থানে করয়ে যাচন।
সিন্ধু বিন্দু দেয় তথা করিলে গমন। ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ।
পাত্রাপাত্র নাহি মানে গৌরাঙ্গরতন। সময় বিচার তেঁহ না করে কখন।

পরমানন্দ বলিয়াছেন—

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে রতন হইল কত জনা।
এ গুণে সুরভি সুরতরুসম নহে রে মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন তরি জনে জনে যাচিয়া দেওল প্রেমধন।

* শেখর কবি চৈতন্য প্রেমমণ্ডলীকে আখমাড়াই কলের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন—
"বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরী গদাধর। নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥"

বাসু ঘোষও অনেক উপমা দিয়া শেষে বলিয়াছেন—"গোরারূপে কি দিব তুলনা।' কষিতকাঞ্চন, চম্পক গোরোচনা, বিজুলি কাহারও সহিত তুলনা হয় না।" ঘনশ্যাম উপমার অসার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

কো কহ অপরূপ প্রেমসুধানিধি কোই কহত রস-মেহ।
কোই কহ ইহ সোই কল্পতরু মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ।
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম॥
যোএক সিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত পরবশ জলদসঞ্চার।
মানস অবধি রহত কল্পতরু কো অছু করুণা অপার।
যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয় সরোবর পূর।
উমড়ই নয়ানে অধম মরুভূমহি হোয়ত পুলক অঙ্কুর।
নামহি যাক তাপ সব মিটই তাহে কি চাঁদ উপাম।
ভনে ঘনশ্যাম দাসি নাহি হোয়ত কোটি কোটি এক ঠাম। *

এসকল অংশও অলঙ্কৃত। উপমার অসারতা দেখাইয়া এই কবিরা সাঙ্গরূপক ও উপমার স্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কারকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ফলে উপমার তালিকার বদলে ব্যতিরেকের মালিকায় রচনা সরস হইয়াছে।

---

‡ লোচন দাস নিজেও অনেক উৎপ্রেক্ষা ও উপমার প্রয়োগ করিয়াছেন। মদন বাটিয়া বদন রচনা, চিনি হইতে তৈরী ফেনির সহিত গোরা অঙ্গের উপমা, প্রেমের সাচনা দেওয়া অনুরাগের দধির সহিত গোরার চোখের রূপকল্পনা ইত্যাদি অনেক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি বুঝিলেন গোরারূপ উপমাতীত। তিনি তাই লিখিলেন—

শারদ চন্দ্রিকা স্বর্ণ ধিক চম্পকের বর্ণ শোণকুসুম গোরোচনা।
হরিতাল সে কোন ছার বিকার সে মৃত্তিকার সে কি গোরারূপের তুলনা।
ধিক চন্দ্রকান্তমণি তার বর্ণ কিসে গণি কণিমণি সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চরূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ তুলনা কি দিব আমি তার।

যে সকল কবি শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাবলীতে কাব্যাঙ্গের অভাব আছে, কিন্তু ভক্তি ও আন্তরিকতার অভাব নাই। গোবিন্দ দাসের মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। অনুভব করিবার উপভোগ করিবার শক্তি ছিল তাঁহাদের অগাধ। নরহরি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিত্ত অতি অধম লিখিতে জানি না ক্রম কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনও জন্মেনি সে জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পঁহু॥

অকপট কবির বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ বাসনা পরে পূর্ণ করিয়াছেন চৈতন্য চরিত রচনা করিয়া। আর গোবিন্দদাস এ বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষার চাতুর্য্যে ও মাধুর্য্যে পদাবলী সাহিত্যে।

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। লোচনদাসই প্রকৃতপক্ষে নরহরির আকাঙ্ক্ষিত কবি। নরহরির নিদেশক্রমে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কেবল চৈতন্যমঙ্গল নয়, শতাধিক পদ রচনা করিয়া লোচনদাস নরহরির প্রাণের কথা নিঃশেষ

শুন ওগো প্রাণসই জগতে তুলনা কই তবে সে তুলনা দিব কিসে?
জগতে তুলনা নাই যাঁর তুলা তাঁর ঠাঁই অমিয়া মিশাব কেন বিষে।
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায় কেবা করে রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে ভাবিয়া বাউল হৈল মন।
পক্ষী যেন আকাশের কিছুই না পায় টের যতদূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের অনুসারে এ লোচন গায়।

উপমার অসারতা দেখাইতে গিয়া কবি যে উপমায় পদের উপসংহার করিয়াছেন, তাহারও তুলনা ন্যাই।

করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। নরহরি মনের মাধুরী দিয়া শ্রীচৈতন্যের যে রূপ রচনা করিয়াছিলেন—লোচনদাসই সেই অপূর্ব রূপটিকেই বাণীরূপ দিয়াছেন।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, বিবাহ, অভিষেক, গৃহত্যাগ ইত্যাদি অবলম্বনে যে সকল পদ রচিত হইয়াছে ২।১টি ছাড়া সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস তাঁহার জীবনে করুণতম বিষয়বস্তু, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে হৃদয়বিদারক। সন্ন্যাস অবলম্বনে যে সকল পদ রচিত হইয়াছে কেবল সেইগুলিই সৎসাহিত্যের পদবীতে স্থান পাইয়াছে।

গৌরাঙ্গের রূপ, গতি, চাহনি, বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া যে পদগুলি রচিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই কবিত্বময়। এই রসের প্রধান কবি লোচন, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব নৃত্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন—বাসুঘোষ, বৃন্দাবনদাস, নয়নানন্দ, রামানন্দ ইত্যাদি। নরহরিই এ লীলার প্রধান কবি। *

---

* নিম্নলিখিত কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

১। বিহরে আজি রসিক রাজ গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ
কুঞ্চ কেশর পুঞ্জ উজোর কনকরুচির কাঁতিয়া। বলরাম।

২। অমৃত মথিয়া কে বা নবনী তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরা দেহ। লোচন

৩। দেখ দেখ গোরা নট রায়।
বদন শারদ শশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি কুলবতী হেরি মুরছায়। বাসুঘোষ

৪। প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ পুঞ্জ গঞ্জি গৌরবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপধাম।
জিনি রক্ত পদ্মদল শ্রীপাদযুগলতল দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম। প্রেমদাস

৫। চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবনি রে।
উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব জগমনোমোহন ভাঙ্গনীরে॥ গোবিন্দ দাস

৬। দেখত বেকত গৌরচন্দ্র বেঢ়ল ভকত নখত বৃন্দ
অখিল ভুবন উজোরকারী কুন্দকনক কাঁতিয়া॥ গোবিন্দ দাস

এখন কথা হইতেছে—শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের অসামান্যতা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন কি ? মানুষের ত এত রূপ হয় না। তিনিত কোন নাটকের নায়ক নহেন, রমণী মনোমোহনের জন্য তাঁহার জন্ম নয়, বরং তিনি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী। রূপে তিনি বিশ্বজয় করেন নাই, প্রেমে করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের এই অলৌকিক রূপ—কবিদের ও ভক্তদের মনের মাধুরী দিয়াই পরিকল্পিত। তিনি যে ভগবান, সাধারণ মনুষের মত তাঁহার রূপ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, তিনি যে রাধার অঙ্গকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। কাজেই সে রূপের তুলনা কোথা ? রূপ যখন অসাধারণ, তখন নদীয়ার নারীগণকে কি করিয়া স্থির রাখা যাইবে ? শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত অবতার—কখনও তিনি কৃষ্ণভাবে বিভাবিত—কখনও রাধাভাবে বিভাবিত। ব্রজলীলার প্রত্যেক অঙ্গটি শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রকটিত। ব্রজলীলা তাঁহার দেহ-মনের রঙ্গমঞ্চে যেন অভিনীত হইয়াছে। ভক্তকবিগণ তাই ব্রজলীলার অনুসরণে গৌরলীলার পদ রচনা করিয়াছেন। এইগুলিই অনুরূপ ব্রজলীলার সহিত গীত হয় গৌরচন্দ্রিকা-রূপে। গৌরলীলার পদেও রূপানুরাগ, বিরহ, মান, মিলনানন্দ ইত্যাদিও প্রকটিত হইয়াছে।* গৌরাঙ্গের সহচরগণকে ব্রজের সখাসখীর অবতার বলিয়া ঐ

৭। সুরধুনী তীরে তীর মাহা বিলসই সমবয় বালকসঙ্গ
করতল তাল বলিত হরি ধ্বনি নাচত নটবর ভঙ্গ। গোবিন্দ দাস

৮। শশধর-যশোহর নলিনমলিনকর বয়ন নয়ন দুহুঁ ভোর।
তরুণ অরুণ জিনি বদন দশন মণি মোতিম জ্যোতি উজোর। জগদানন্দ

৯। সুবলিত বলিত ললিত পুলকান্বিত যুবতী পীরিতিময় কাঞ্চন কাঁতি।
শরদচাঁদ চাঁদমুখমণ্ডল লীলাগতি রতিনাথক ভাঁতি। জ্ঞানদাস

১০। চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়। গোবিন্দ দাস।

* এখানে একটি উদাহরণ দিই—চণ্ডীদাস রাধার পূর্ব্বরাগপ্রসঙ্গে লিখিলেন—

লীলার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। গদাধরকে রাধা কল্পনা করিয়াও বহুপদ রচিত হইয়াছে। ভক্তকবিগণ ইহাতেই ক্ষান্ত হ'ন নাই। ব্রজগোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপে আত্মহারা হইয়া সংসারধর্ম্ম বিস্মৃত হইত—তাহাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইত—নদীয়া নাগরীগণও যেন গৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতেছে—এইভাবে ভক্তকবিরা বহুপদ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন—শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া সত্যসত্যই নদীয়ার কুলবধূগণের সতীধর্ম্ম বিচলিত। ইহা কেবল কবিকল্পনামাত্র। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম উদ্দেশ্য গৌরাঙ্গের অলোকসামান্য রূপের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ব্রজলীলার অন্ধ অনুস্মৃতি।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়,
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়।

রূপগোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে লিখিলেন—

ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকা মধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
অগণিত গুরু ত্রাসাশ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরী দৃশোর্দ্বয়ং ॥

নবঅনুরাগিণী শ্রীরাধার এই উন্মনস্ক ভাবের অনুকরণে গৌরচন্দ্রিকা গীত লিখিত হইয়াছে—

আজ হাম কি দেখিনু নবদ্বীপ চন্দ। করতলে করই বদন অবলম্ব।
পুনপুন গতায়ত কর ঘর পন্থ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত।
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত বিকাশ।
পুলক মুকুল বর ভরু সব দেহ। এ রাধামোহন কছু না পায়ল থেহ।

রাধার স্বয়ংদৌত্য বা অভিসার-যাত্রার অনুসরণে রাধামোহন লিখিলেন—

বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ বামপদ আগুসঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে বসন আগোরই গজগতি চলু অনিবার।

কোন পুরুষের রূপবর্ণনা করিয়া কবিরা যখন কিছুতেই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতেন না—তখন তাঁহারা নারীগণের পক্ষ হইতে সেই রূপের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখাইয়া রূপের অলোকসামান্যতার প্রতিপাদন করিতেন—ইহাই ছিল বঙ্গসাহিত্যের একটি মামুলী প্রথা। কবিরা দেখাইতেন—কাব্যের নায়ক শ্রেণীর কোন রূপবান্ পুরুষ পথ দিয়া পদব্রজে, দোলায় বা রথে চলিয়া গেলে পথের দুইধারের বাতায়ন-পথবর্ত্তিনী নাগরীরা সে রূপ দর্শনে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে এবং মনে মনে রূপবান্ পুরুষকে যেন হৃদয়ে বরণ করিতেছে। এই বর্ণনায় যে কুলবধূদের সতীধর্ম্মের অমর্য্যাদা করা হইতেছে—একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেন না—এ ক্ষেত্রে তাঁহারা কন্দর্পের প্রভাবকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতেন। ইহার মধ্যে সত্যও থাকিতে পারে—কিন্তু এরূপ নগ্ন সত্যকে কাব্যে স্থান দেওয়া অশোভন কিনা তাহা তাঁহারা ভাবিতেন না। এই প্রথাই পরে "পুরনারীদের পতিনিন্দা" নামক জঘন্য পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল। গৌরলীলার পদরচনাতেও নারীগণের চিত্তচাঞ্চল্যের বর্ণনা একটা প্রথায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আধ্যাত্মিক সার্থকতাও আছে। প্রেমের ঠাকুরের প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল আপামর সাধারণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই। সেকথা বলা হইয়াছে শ্রীচৈতন্যের রূপ ও নদীয়া নাগরীদের মুগ্ধতার রূপকাত্মক ভাষায়। ইহা যে রসসৃষ্টির কৌশলমাত্র, অনেক ভণিতায় তাহার ইঙ্গিত আছে। যেমন,—'নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে।' কবিরা ত নিজেরাই নাগরী। লোচন নিজেই বলিয়াছেন—রসিক ছাড়া এ তত্ত্ব কেহ বুঝিবে না।

কুল খোওয়াবি বাউরী হবি লাগবে রসের ঢেউ।
লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পারে কেউ।

এখানে কুলবতী সতীর অর্থ সংসারাশ্রমে আসক্ত শত সংস্কারের নাগপাশে

আবদ্ধ মতি। "রূপসাগরে সবই গেল ভেসে" এখানে রূপসাগরের অর্থ হরিপ্রেমের সাগর।

লোচনের অনেক পদে রহস্যময়ী ভাষায় লোকোত্তর ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত আছে।

আর এক নাগরী বলে এদেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরী হবো॥
এ দেশে ত কবাট দিলে সে দেশত পাই।
বাহির গাঁয়ে কাজ নাই সই ভিতর গাঁয়ে যাই॥
সাপের মণি বার করলে হারাই যদি মণি।
মণি হারা হলে তবে না বাঁচয়ে ফণী॥
যতন ক'রে রতন রাখা বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকি দিতে হয়॥
লোচন বলে ভাবিস কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরা চাঁদে মন ভুলায়ে ধর॥

লোচন ভগবানের প্রতি ভক্তের রাগময় আকূতির কথাও গোরাচাঁদ ও নদীয়া নাগরীদের মারফতেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

নবদ্বীপ নাগরী আগরি গোরারসে। কহিতে গৌরাঙ্গ কথা প্রেমজলে ভাসে।
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা। জীবনে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা।
গোরা রূপগুণ অবতংস পরে কানে। দিবানিশা গোরা বিনা আর নাহি জানে।
গোরোচনা নিবিড় করিয়া রাখে গায়। যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায়।
গোরোচনা হরিদ্রার পুত্তলি রচিয়া। পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া।
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝরে দুনয়নে। তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দুচরণে।
পীরিতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল। পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকূল।
অঙ্গকান্তি প্রদীপে করয়ে আরাত্রিকে। কঙ্কন শবদে ঘণ্টা আনন্দ অধিকে।
অঙ্গগন্ধ ধূপধুনা রহে অনুরাগে। পূজা করি দরশ পরশ রস মাগে।

দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।‡ লোচন বলে এতদিনে জ্ঞান শেল গেল।

১। জ্ঞানদাসের পিয়ার পীরিতে জানি ঘুমায়লুঁ না জানি বিহান নিশি।

২। ননদী গো রহিতে নারিলুঁ ঘরে—এই পদ দুইটির অনুকরণে বধূ

‡ নদীয়া নাগরী ভাব বিলাসের কতকগুলি দৃষ্টান্ত—

"ঢল ঢল কাঁচা সোনার বরণ লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদর কেশে রহই পরশ আশে।"
"ওরূপ হেরিয়া নদীয়ানাগরী পতি উপেখিয়া কাঁদে।"
"কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতীসতী ঘরে ঘরে প্রেমের কাঁদনা।"
"হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জরজর প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি।
সুরধুনীতীরে যাঙা ভাসাইব কুলক্রিয়া ভজিব সে গোরাগুণমণি।"
"যেবা ধনী দেখে তারে পাশরিতে নারে। কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে।"
"বাসু ঘোষ কহে এমন নাগর দেখি যে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী ওরূপ দেখিয়া কেমনে আছয়ে ঘরে।"
"ভাঙ ভুজঙ্গমে দংশন মঝু মন অন্তর কাঁদয়ে মোর।"
"লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ লও মোর জীবন-যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি সেই মোর সরবসধন।"
"আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক। স্বপনে দেখিনু আমি গোরা চাঁদের মুখ।"
"কে আছে এমন নারী নয়ান সন্ধান হেরি মুখচাঁদে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরজ ধরে তবে সে যাইবে ঘরে মনমথে না করে বাউরী।"
"কাঁপে কলেবর গায়ে আসে জ্বর চলিতে না চলে পা
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা।
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে মদন কাঁপয়ে ডরে।"
"মন ছন ছন প্রাণ ছন ছন পরাণ দিয়া পরে।
আধ কপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥

ননদীর রসালাপের পদ গৌরলীলাতেও রচিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের পদে শ্রীমতী ভাবাবেশে 'কানু কানু' বলিয়া উঠিয়া শেষে 'ভানু ভানু' বলিয়া সারিয়া লইয়াছে। বাসু ঘোষের গৌরলীলার পদে নদীয়া নাগরী 'গৌর গৌর' বলিয়া শেষে 'চৌর চৌর' বলিয়া বাগ্‌চ্যুতিকে গোপন করিতেছে।

১। অবশ হইয়া কহে কানু কানু ভানু ভানু করিয়া লহয়ে পুন বোধ।

২। গৌর গৌর করি উঠলুঁ রোই। চৌর চৌর করি উঠায়লুঁ ভাষ।

এখানে বাসু ঘোষেরই অনুসরণ করিয়াছেন জ্ঞানদাস। নরহরি বৃন্দাবনের অনুকরণে বধূ, ননদী, শ্বাশুড়ী লইয়া অনেক চাতুরীর সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাতে স্থলে স্থলে বড়ই বাড়াবাড়িও হইয়া গিয়াছে। এই পদগুলিতে 'ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদাই' প্রবল হইয়াছে।

"খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোল" (জ্ঞানদাস)—দুই লীলারই সাধারণ অঙ্গ। শুধু তাহাই নয় গৌরাঙ্গের পক্ষ হইতে উদ্দীপনা দানের কথাও আছে। নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বটে হেলিতে দুলিতে তিনি সুবোধ ছেলের মত যাতায়াত করেন না।‡

দিনদুপুরে ডাকাতি করে মুচকে হাসি হেসে
নয়ান বাণে বধে প্রাণে কুল মান যায় ভেসে।"
"এ কাঠকঠিন হিয়া সার্থক হোয়ব কবে ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া।
ও কুচ কমল মধু সার্থক হোয়ব কবে ও ভোমরে মকরন্দ দিয়া।"
"সুরধুনীতটগত হরিণ-নয়নী যত গুরুজন করাইতে আঁধে।
কত কত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তছু লোচন কাঁদে।
"কারু—গলিত অম্বর তাহা না সম্বর কাহার গলিত বেণী।
যেন—চিত্রের পুতলী রহে সবে মেলি দেখে গোরাগুণমণি।"

‡ ১। অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে বরিষে কুসুমশর সাধে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাওব জনু পড়ু গঙ্গা অগাধে॥

২। হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গে। কৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে।

এ সমস্তকে রসসৃষ্টির কৌশল বলিয়াই মনে করিতে হইবে। নদীয়ার ননদী ব্রজের ননদীর মত নয়, সেও মাঝে মাঝে বাউরী হয়—আর নদীয়ার শ্বাশুড়ী ব্রজের শ্বাশুড়ীর মত নিষ্ঠুরা নয়। নদীয়ায় যমুনার বদলে সুরধুনী আছে। নাগরীদের গাগরীভরণের সমস্যা দুই স্থলেই এক। ব্রজ ও নদীয়া দুই ঠাঁইয়ের নাগরীদের একই কথা।—কেবল কালার স্থলে গোরা আর কালো যমুনার স্থলে গোরা সুরধুনী। যেমন—

কি খেনে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোঁড়া সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল কত যাব সুরধুনী-তীরে।

ব্রজলীলায় যে রসের কথা কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরের চিত্র দিয়া বলা হইয়াছে—নদীয়া লীলায় স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া বলিতে হইয়াছে—

যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে রয়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখছি যেন বুকের উপর গোরা ॥‡

৩। রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়।
ভবিয়া চিন্তিয়া মন দঢ়াইনু পরাণ রহিবার নয়।

৪। "আমার পানে নয়ান কোণে চাইল একবার।
মন-হরিণী বাঁধা গেল ভুরুপাশে তার।
যদি বাঁধে বিনোদ ছাঁদে চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী রসবতী রাখতে নারে কুল।"

‡ গৌরচন্দ্রের পক্ষ হইতে যে উদ্দীপনা ও প্রতিবোধনের কথা মাঝে মাঝে পদগুলিতে দেখা যায়—তাহা যে বাচ্যার্থে গ্রহণ করিতে হইবে না—নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

অলখিতে লখি ও চাঁদ মুখ। বিসরিনু কিছু হিয়ার দুখ।
তুরিতে মলিন কমল কলি। গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি ॥
তা দেখিয়া গোরা চতুর অতি। করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি।
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে। দিনকর তাপ দূরেতে যাবে।

এই শ্রেণীর রচনায় কবিত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক পদে কবিত্ব ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

সখি—গৌর যদি হৈত পাখী—
করিয়া যতন করিতু পালন হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি।
সখি—গৌর যদি হৈত ফুল,
পরিতাম তবে খোপার উপরে দুলিত কাণেতে দুল।
সখি—গৌর যদি হৈত মোতি,
হার যে করিতু গলায় পরিতু শোভা যে হইত অতি।
সখি—গৌর যদি হত কালো,
অঞ্জন করিয়া রঞ্জিতাম আঁখি শোভা যে হৈত ভালো।
সখি—গৌর যদি হৈত মধু,
জ্ঞানদাস কহে আস্বাদ করিয়া মজিত কুলের বধূ।

মুরারিগুপ্তের—সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ইত্যাদি একটি উৎকৃষ্ট পদ। এই পদের মধ্যে ব্রজ বা নদীয়া কোন ঠাঁইয়েরই উল্লেখ নাই।

এত কহি হাসি নয়নকোণে। বারেক চাহিল আমার পানে।

মলিন চিৎকুমুদ হরিপ্রেমের চন্দ্রিকালোকে বিকসিত হইবে—সংসারতাপ দূর হইবে। ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আশ্বাসবাণী ছাড়া আর কি?

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন—নদীয়া নাগরীরা গৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া নানাভাবে প্রেম আবেদন জানায়—কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাহাতে সাড়া দেন না। এই উপেক্ষিত প্রণয়ের ব্যথাই লোচন নরহরি বাসু ঘোষের পদে কবিত্বের আশ্রয়। পরবর্ত্তী সহজিয়ারা চৈতন্যে এই সাড়ার আরোপ করিয়া পদরচনা করিয়া ঐ কবিদের নামে চালাইয়া দিয়াছে। গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেছে—ইহাতে গৌরাঙ্গের মর্য্যাদাহানি হইতেছে না। কিন্তু গৌরাঙ্গ নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহাদের মনে লালসার উদ্দীপন করিতেছেন—একথা বলিলে গৌরাঙ্গের চরিত্রের মর্য্যাদা থাকে না। ভক্ত কবিরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের উপাস্য পুরুষের এরূপ মর্য্যাদাহানি করিতে পারেন না। বাসু ঘোষের নামে প্রচলিত স্বপ্নসম্ভোগের পদও সম্ভবতঃ জাল।

ভক্তিভূষণ মহাশয় ইহাকে গৌরলীলার পদ বলিয়াই ধরিয়াছেন
পরবর্ত্তী পদেই কিন্তু আছে—"গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রৈতে নারি ঘরে।"

"আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥"

এই পদটিও সুন্দর।

গৌরলীলা বর্ণনায় বলরামও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। বলরামের পদের অনেক অংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ‡

গৌরলীলা বর্ণনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—লোচনদাস। ইনি নদীয়া নাগরীভাবের সাধক ছিলেন। এইভাবের দীক্ষা ইনি গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট হইতে লাভ করেন। ইনি যে কেবল পদাবলী রচনায় নাগরী সাজিয়াছেন তাহা নয়, ইহার জীবনের সাধনাই ছিল নাগরী-ভাবের। ইহাকে ব্রজের বড়াই বুড়ী

---

‡ বলরাম দাস—বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরুতে লিখিয়াছেন—

কবিনৃপবংশজ ভুবন বিদিত যশ ঘনশ্যাম বলরাম।

একাধিক বলরামের নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়—সেজন্য কে এই বলরাম দাস ইহা লইয়া পণ্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরামেরই স্তব করিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যে কবিনৃপবংশজ অর্থাৎ রামচন্দ্র কবিরাজের বংশজাত—তাঁহার শিষ্যমাত্র নহেন—সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে তিনি কবিরাজ মহাশয়ের ভাগিনেয় না হইতে পারেন—জ্ঞাতিপুত্র হইতে পারেন। শিষ্য হইলে বৈষ্ণবদাস 'বংশজ' বলিতেন না। নিবাসও ত তাঁহার বুধরী গ্রামে। বলরামের রসোদগারের পদগুলি চমৎকার। গোষ্ঠলীলার বর্ণনায় বলরাম যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অবলম্বনে একটি বারমাস্যা রচনা করিয়াছেন তাহার প্রথম চরণ—

আঘন মাস নাহ হিয় দহই শুনইতে ঋতুপতি নাম।

অন্যান্য বারমাস্যা হইতে কবিত্বে বিন্দুমাত্র ন্যূন নয়। অপূর্ব্ব পদবিন্যাসের পরিপাট্য এই রচনায় আছে।

বলা হইত। ইনি নিজে যে পুরুষ সে কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি নিজে বৈষ্ণবসুলভ দীনতাবশতঃ যাহাই বলুন ইনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।‡‡ কিন্তু পদ রচনায় তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য একেবারে নিগূহিত করিয়াছেন।' সে জন্য ইহার রচনা-পদ্ধতি গোবিন্দদাসের পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া খাঁটি মেয়েলি চলতি ভাষায় ইনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন। পুরুষের রচনা বলিয়া মনেই হইবে না। রচনার উপাদান-উপকরণ, উপমাদি অলঙ্কার, ইনি ঘরগৃহস্থালী হইতে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সেজন্য বাটনা বাটা, দইপাতা, দধিমন্থন, এবং রান্নাঘরের খুটীনাটি হইতে উপমাঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই লিখিতে পারিয়াছেন—"রন্ধন শালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।" অথবা "কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা। আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা।" লোচনের নাগরীভাবের সাধনায় আর একটি লাভ হইয়াছে। ব্রজবুলিতে তিনি লেখেন নাই, ব্রজবুলির ছন্দও তিনি গ্রহণ করেন নাই। খাঁটি বাংলা ভাষার যে ছড়ার ছন্দ বা ধামালী ছন্দ তখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পায় নাই, নাগরী ও গ্রামবধূদের মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল, সেই ছন্দটি লোচনের রচনার মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

চরণ তলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়।
চলে চলে ঢ'লে ঢ'লে পড়ছে সখার গায়।

‡‡ তাঁহার রচিত চৈতন্যমঙ্গলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কড়চা অবলম্বনে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লক নাটক ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর কতক অংশের তিনি পদ্যানুবাদ করেন। চৈতন্যমঙ্গলের সূত্রখণ্ডে ভাগবতের বহু শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে।

আমাপানে নয়ন কোণে চাইল সে একবার।
মনহরিণী বাঁধা গেল ভুরুর পাশে তার।
যদি বাঁধে বিনোদ ছাঁদে চাঁচর চিকন চুল।
তবে সতী কুলবতী রাখতে নারে কুল।
যারে ডাকে নয়ন বাঁকে তার কি রহে মান।
যদি যাচে তায় কি বাঁচে রসবতীর প্রাণ।
যদি হাসে কতই আসে রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন পরাণ ধন কে নিবি আয় ফিরে।
গলায় মালা বাহুর দোলা দিয়া চলে যায়।
কামের রতি ছেড়ে পতি ভজে গোরার পায়।
লোচন বলে ভাবিস্ কেন থাক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরা নাগর আটক ক'রে ধর।

ধামালী ছন্দের সঙ্গে বংলার খাঁটি চল্‌তি ভাষাও সহিত্যে স্থান পাইয়াছে। লোচনদাসই সর্বপ্রথম বাংলার চল্‌তি ভাষাকে কৌলীন্য দান করেন। তাঁহার নাগরীভাবের সাধনার ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার নিজস্ব ছন্দ ও নিজস্ব ভাষাকে সর্ব্বপ্রথম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। সংস্কৃত হইতে সংক্রামিত অলঙ্কারে মণ্ডিত ব্রজবুলির প্রাধান্যের যুগে পদরচনায় লোচন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য পূরাপূরি বজায় রাখিয়াছিলেন। লোচন বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ বা রাধামোহনের সগোত্র নহেন ; চণ্ডীদাস, সরকার ঠাকুর, বাসুঘোষ, নয়নানন্দ ইত্যাদির সগোত্র। চণ্ডীদাস-লোচনদাসের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালার নিজস্ব কাব্যের ভাব, ভাষা, ও অলঙ্কারের প্রবাহ মৈথিলী ধারার পাশে পাশে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, শ্রীধর, রামবসু, হরুঠাকুর ও দাশুরায়ের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাংলায় নামিয়া অসিয়াছে। বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের

সহিত ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্করণের ত্রিধারা-যোগ প্রাচীন কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনের রচনার সঙ্গেই আছে।

গৌরলীলার পদ রচনায় লোচনের পর নরহরির নাম করা যাইতে পারে। লোচনের ভাষা পল্লীর ভাষা, নরহরির ভাষা নাগরী ভাষা। দুইই চল্‌তি বাংলা। লোচনের ভাষার পক্ষে ধামালী ছন্দ উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু নরহরির ভাষার পক্ষে লঘু ত্রিপদীই উপযোগী হইয়াছে। বাংলার নিজস্ব লঘু ত্রিপদীর আদর্শরূপ আমরা নরহরির রচনায় পাই। নরহরির ভাষায় আমরা বাংলার ইডিয়ম (লক্ষ্যার্থক চল্‌তিগৎ) ও প্রবাদ-প্রবচনের মুহুর্মুহু সাক্ষাৎ পাই। যেমন—"আপনার দোষ আঁচলে বাঁধিয়া পরকে দূষিতে চায়।"

"চুপ করি থাক গোপনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কান।"

"নরহরি কয় তু বড় আজুলী ননদীরে কিবা ভয়।
চোরের উপর বাটপাড়ি করি চোখে ধূলা দিতে হয়।"

"নরহরি কহে তুয়া শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি।"

"নরহরি কয় যে বল সে বল একথা কানে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে।"

নরহরি সরকারই নাগরীভাবের প্রবর্ত্তক। সেজন্য তাঁহার রচনায় নদীয়া নাগরীদের প্রেমমুগ্ধতার কথা নানা রস-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। এই সকল রচনায় প্রভূত কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নারীজীবনের এত খুটিনাটি পরিচয় কাহারও রচনায় নাই। বাঙ্গালী নারী জীবনে যে কত রস-মাধুরীর অবকাশ ও অবসর আছে, তাহা নরহরির পদগুলি হইতে জানা যায়।

নরহরি কবি হিসাবে বাসুঘোষ, রায়শেখর ও লোচন দাসের গুরুস্থানীয়। নরহরি মধুমতী-সখীর ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গকে চামর ঢুলাইতেন।

নরহরি ঠাকুরের পর বাসুঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ব্রজলীলার

কোন পদ লিখেন নাই। ইনি সরকার ঠাকুরের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। বাসু নিজেই বলিয়াছেন—"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে। পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা হইল মনে।" ইনিও নরহরির ভাবের ভাবুক ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।" বাসুদেব সুগায়ন ছিলেন। অতএব—গীত বলিতে কণ্ঠসঙ্গীত ও পদরচনা দুইই বুঝাইতেছে। বলাবাহুল্য, রসগুরু নরহরির অনুকরণে বাসুঘোষও নাগরী ভাবের বহু পদ রচনা করিয়াছেন। সেগুলিতে নরহরির মত কলা-কৌশল ও চাতুর্য্যের বৈচিত্র্য নাই। গৌরাঙ্গের বাল্যকৈশোরের লীলা বাসুর প্রত্যক্ষ নয়—তিনি কল্পনার সাহায্যে সে লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। বাসু শ্রীক্ষেত্র-লীলা ও গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদের কথাও লিখিয়াছেন। তিনি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহাতেও তিনি ভাবকল্পনার সংযোগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন মধুরভাবের সাধক। সেজন্য বহু পদে গৌর-গদাধরলীলা ও নদীয়া নাগরী ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার রচিত নিমাই সন্ন্যাসের পদ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরাঙ্গলীলার পদগুলিও চমৎকার। ইনি গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের সগোত্র। ছন্দের ছটায় ও অলঙ্কারের ঘটায় ইহার পদগুলি ঝলমল। ইহার একটি পদ—

বিহরত সুর-সরিৎতীর গৌর তরুণ বয়স থির
তড়িৎ-কনক-কুঙ্কুম-মদমর্দ্দন তনু কাঁতি।
মদনকদন বদনচন্দ্র নিখিলতরুণী নয়ানফন্দ
হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দকুসুম পাঁতি।
অঞ্জনঘন পুঞ্জ বরণ কুঞ্চিতকচ ধৈর্য্যহরণ
বেশ বিমল অলকাফুল রাজত অনুপাম।

ভালতিলক ঝলকত অতি ভাঙভূজগ মঞ্জুল গতি
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রসসিঞ্চিত ছবিধাম ॥
কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড কলিত কণ্ঠহি বনমাল বলিত
বাহু বিপুল বলয়া কর কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলবধূ কুল
ললিত কটি সুকেশ কেশরী-গরব-খরব কারী।
ডগমগ ভুজ জানু তরুণ অরুণাবলী কিরণ চরণ
কমল মধুর সৌরভ ভরে ভকতভ্রমর ভোর।
করুণাঘন ভুবন বিদিত প্রেম অমিঞা বরখত নিত
নরহরি মতি মন্দ কবহু পরশত নাহি থোর ॥

জগদানন্দ গৌরলীলার একজন পদকর্ত্তা। ইঁহার রচনায় ছন্দোবন্ধের ও বহিরঙ্গের পারিপাট্যের অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা যায়।‡

‡ শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে থাকিয়া যে জগদানন্দ সেবা করিতেন পদকর্ত্তা জগদানন্দ সে জগদানন্দ নহেন। পদকর্ত্তা জগদনন্দ শ্রীখণ্ডের বৈদ্যঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জগদানন্দের ব্রজলীলার পদাবলী ব্রজবুলিতে রচিত। ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে, পারিপাট্যে ও কারুকার্য্যে, পদ লালিত্যে, পদের গঠন-সৌষ্ঠবে জগদানন্দের সমকক্ষ দুর্লভ। রচনার বহিরঙ্গের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়ার জন্য কবির রচনায় অন্তরঙ্গের ভাব-মাধুর্য্যের কিছু অভাব হইয়াছে। জগদানন্দের অন্তশ্চিত্র পদাবলী—শাব্দিক কৌশলেরই নিদর্শন। দীনেশ বাবু জগদানন্দকে তৃতীয় শ্রেণীর এবং জগদ্বন্ধু বাবু ও কালিদাস নাথ ১ম শ্রেণীর কবি বলিয়াছেন। দুই মন্তব্যই সুচিন্তিত নয়। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায়ের মন্তব্যই সমীচীন। তিনি তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বলিয়াছেন। জগদানন্দ অতিরিক্ত অনুপ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। গোবিন্দদাসের মত তিনি একই অক্ষরের অনুপ্রাস অনেক পদে আগাগোড়াই চালাইয়াছেন—তাহাতে রচনায় প্রসাদগুণের অভাব হইয়াছে। জগদানন্দের ২।৪টি পংক্তি এখানে উৎকলন করি।

১। দামিনীদামদমনরুচি দরশনে দূরে গেও দরপ কি দাপ।
২। ঢলঢল গণ্ডমণ্ডল মণিমণ্ডিত ঝলমল কুণ্ডল বিকাশ।

কীর্ত্তন গানের আগে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার সার্থকতা একাধিক। একটি সার্থকতা এই—রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীতে কোথাও ঐশ্বর্য্য আরোপিত হয় নাই, তাহাতে এই সঙ্গীতকে প্রাকৃত প্রণয়ের লালসামূলক সঙ্গীত মনে হইতে পারে। গৌরচন্দ্রিকা প্রথমে উদ্গীত হইয়া প্রথমতঃ একটা আধ্যাত্মিক

৪। পীন উর উপনীতকৃত উপবীত সীতিম রঙ্গ।

৫। দ্বিজকুল-গৌরব গৌরক সৌরভে চৌরসদৃশ ভেল মোর (ময়ূর)।

৬। পদকর শরদরবিন্দই নিন্দই নখবর নখতর পাঁতি।
রসনারসায়ন বদন ছদন হেরি মোতিম রোহিত কাঁতি॥

জগদানন্দ কয়েকটি গৌরলীলার পদ বাংলাতেও লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটিতে শ্রীরাধার স্বপ্নে গৌর অবতারের পূর্বসূচনা দেখাইয়াছেন। অদ্ভুত কল্পনা। স্বপ্ন দেখিয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—'গৌরাঙ্গ হরিল মোর মন।' এই বলিয়া শ্রীমতী মূর্চ্ছিত হইলেন।

ব্রজবুলির পদগুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ নানাপ্রকার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ছটায় প্রকাশিত হইয়াছে। নদীয়া নাগরী ভাবের পদও আছে—

সুরধুনীতটগত হরিণনয়নী যত গুরুজন করইতে আঁধে।
কতকত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তছু লোচন ফাঁদে।
সুমরণে যাক শিথিল নীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ।
দরশনে ত্যাক ধিরজ ধরু কো ধনী পড়ু কুলবতী কুলে লাজ।

জগদানন্দ-রচিত গৌরলীলার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার পদ এই—

(আলিরি) হোত মনহুঁ উলাস সুলছন বাম নিজভুজ উরজ ঘনঘন
ফুরই দুর সঞে প্রাণ পিউ কিয়ে অদূর আওল রে।

বিরহিণী নিজ অঙ্গে সুলক্ষণের সঞ্চার দেখিয়া কল্পনা করিতেছে—প্রিয়তম নিশ্চয় আসিতেছে। সে কাছে আসিলে ঘোমটা দিয়া 'পীঠ দেই হাসি পালটি বৈঠব'—কিছু সরস কিছু বিরস হইয়া তাহাকে নানা দোষে দুষিব—তারপর "যব পীন কুচ করকমলে পরশব, ক্ষীণতনু মঝু পুলকে পূরব"—তখন চোখ বুজিয়া 'না না' বলিব এবং রস রাখিয়া রোষ করিব। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার এইরূপ মিলন-কল্পনা কবিতাটিতে মাধুর্য্য সঞ্চার করিয়াছে। জগদানন্দের দুইটি বিখ্যাত পদ—

১। করুণাবরুণ নয়ন অরুণারুণ তনু জনু তরুণ তমাল।

পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে; তারপর মূল রাগলীলা-সঙ্গীতকে একটা mystic Interpretation দান করে। শ্রোতা শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত-জীবনের লীলা-বিশেষকেই বৃন্দাবনলীলায় রূপে রসে পরিমূর্ত্ত বলিয়াই মনে করে। বলা বাহুল্য, সঙ্গীতের নিজস্ব কলাগৌরব ও সুরের mystic appeal ও ইহার সঙ্গে কার্য্য করে।* শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গরূপে অভিনব লীলা করিয়াছেন—

২। মৌলিমিলিত শিখিশিখণ্ড চলকুণ্ডল ললিতগণ্ড ইত্যাদি

* কেবল বাঙ্গালী কবিগণ নয় হিন্দী ভাষার সাধক-সাধিকারাও শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশে এইভাবে পদ রচনা করিয়াছেন।

অব তৌ হরি নাম লৌ-লাগী
সব জগকো যহ মাখন চোরা নাম ধরয়ো বৈরাগী।
কিও ছোড়ী বহ মোহন মুরলী কহ ছোড়ী সব গোপী।
মুঁড় মুঁড়াই ডোরি কটি বাঁধি মাথে ন মোহন টোপী।
মাত জসোমতি মাখন কারণ বাঁধে জাবে পাঁব।
শ্যাম কিসোর ভয়ো নব গৌরা নব চৈতন্য জাকো নাঁব।
পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ।
গৌরকৃষ্ণকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ।

একটি সংস্কৃতে রচিত পদও এই সঙ্গে উৎকলন করি—

মধুকর রঞ্জিত মালতী-মণ্ডিত জিতঘন কুঞ্চিত কেশম্।
তিলক-বিনিন্দিতশশধররূপক যুবতীমনোহরবেশম্॥
সখি কলয় গৌরমুদারম্।
নিন্দিত হাটক কান্তি কলেবর গর্বিত মারকমারম্॥
মধু মধুর স্মিত লোভিত তনুভৃতমনুপম ভাববিলাসম্
নিজ নব রাগ বিমোহিত মানস বিকথিত গদ্‌গদ্ ভাষম্।
পরমাকিঞ্চন কিঞ্চন নরগণ করুণা বিতরণ শীলম্।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি রাধা মোহন নামক নিরুপম লীলম্॥

(রাধামোহন)

কীর্ত্তনগানের গৌরচন্দ্রিকায় অনুরূপ লীলা-গানের দ্বারা সকলকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। ব্রজলীলার রস যিনি নিজের জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই ভাবে শ্রোতৃগণকে তন্ময় ও বিভাবিত করাও ইহার একটি উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিলে চেতোদর্পণ মার্জ্জিত হয়, তাহার ফলে স্বচ্ছনির্ম্মল চিত্তে ব্রজলীলার প্রকৃত-স্বরূপটি প্রতিফলিত হইতে পারে। রায় রামানন্দের কথায় গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে একবিন্দু কর্পূরের কাজ করে। একবিন্দু কর্পূরে সমগ্র-লীলার মাধুরী-সম্পুটই সুবাসিত হয়। বর্ত্তমান যুগের লীলারস-কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া সংকীর্ত্তনইবা কি করিয়া আরব্ধ হইবে ?

ব্রজলীলার পদে যশোদার স্থান অনেকটুকু। গৌরলীলার পদেও শচী দেবীর বেদনা লইয়া অনেকগুলি পদ রচিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বড়ই করুণ ঘটনা—শ্যামের মথুরাযাত্রার চেয়ে কম করুণ নয়। কবিগণ কবিতার এমন প্রেরণাটি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বাসু ঘোষ ও প্রেমদাস ইহার প্রধান কবি। বাসু ঘোষ রচিত 'শচীমাতার স্বপ্ন' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম চরণ—'আজিকার স্বপনের কথা শুনলো মালিনী সই।' গৌরলীলায় শ্রীচৈতন্য নিজেই রাধা। গদাধর তত্ত্বহিসাবে কতকটা রাধার স্থান দখল করিয়াছে বটে, কিন্তু গদাধরকে লইয়া ভাবাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে কবিত্ব-স্ফুরণ হয় নাই। কবিত্ব-স্ফুরণের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। কয়েকটি পদে বিষ্ণুপ্রিয়ার খেদোক্তি চমৎকার বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। বাসু ঘোষ ইহাতেও গৌরাঙ্গে ভগবত্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

অক্রূর আছিল ভাল রাজবলে লৈয়া গেল রাখিল সে মথুরা-নগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাক সংবাদ পায়, ভারতী করিল দেশান্তরী ॥

কবি ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিচ্ছেদ-বেদনাকে রাধার বিচ্ছেদবেদনার চেয়ে অধিকতর শোকাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

লোচনদাস, ভুবনদাস ও শচীনন্দনদাস—এই তিনজন কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা রচনা করিয়াছেন। কবিত্বের দিক হইতে এই তিন কবির তিনটি পদের তুলনা সমগ্র গৌরাঙ্গ-সাহিত্যে নাই। লোচনদাসের পদটিতে বাস্তবতা পুরামাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। কবি চৈতন্যের গামছা, বসনের কোঁচা, সরু পৈতা ও ভোটকম্বলের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দরদটুকু বাস্তবভাবেই ফুটিয়াছে। নিজের কথাই তাঁহার বিশকাহন হইয়া উঠে নাই—প্রিয়তমের জন্যই তাঁহার বেদনা বেশী।

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা। কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা।
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা। কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা।

এই পদে আশ্বিনে অম্বিকাপূজার উল্লেখ আছে। এই পদে একটি এমন পরম সত্য কথা আছে—যাহা অন্য কোন কবি বলিতে সাহস করেন নাই।

এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি। পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি।

পৃথিবীর পক্ষ হইতে ইহা বড় কথা নয়, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে ইহার চেয়ে আর বড় কি আছে? শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সত্যের সাহায্যেই শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে আবেদন জানানো হইয়াছে—

সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম্ম নয়!

অর্থাৎ সংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুমি দুর্দ্দান্ত সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসধর্ম্ম হরণ করিতেছ, তুমি মনে প্রাণে জান, সন্ন্যাসের চেয়ে নামকীর্ত্তন বড় ধর্ম্ম, তবে কি শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুঃখ দেওয়ার জন্যই তুমি নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে?

শচীনন্দনদাসের পদটিতে শব্দের চয়ন ও বয়ন, ছন্দের চাতুর্য্য, ভঙ্গীর মাধুর্য্য, পদলালিত্য ও বাক্যবিন্যাসের পারিপাট্য গোবিন্দদাসের ন্যায় অনবদ্য। তবে ইহা রাধার বারমাস্যারই সার্থক অনুস্মৃতি। একটি স্তবক এইরূপ—

ইহ—মাধবী পরবেশ। পিয়া—গেল কিয়ে দূর দেশ।
ইহ—বসন তনুসুখ ছোড়। অব—ধরল কৌপীন ডোর।

অব—ধরল কৌপীন ডোর অরুণ হি বাস ছোড়ল চন্দনে।
তেজি সুখময় শয়ন আসন ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে।
যো বুক পরিসর হেরি কামিনি পরশ রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর পতিত কোলে করি অবনি মূরছিত রোয়ই।

ভুবনদাসের পদটি শচীনন্দনদাসের পদের মতই অনবদ্য এবং অধিকতর করুণ বলিয়া মনে হয়। এই পদে প্রকৃতির বর্ণনা আরও চমৎকার এবং প্রকৃতির সহিত বিরহিণী-হৃদয়ের সংযোগ গভীরতর। ভুবনদাসের এই একটিমাত্র পদ পাওয়া যায়। একটি পদই ভুবনদাসকে শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি নচ তারাগণৈরপি।

কয়েকটি পংক্তি যদৃচ্ছাক্রমে উৎকলন করি—

আওল ভাদর কো করু আদর বাদর তবহুঁ না যাত।
দাদুরি দাদুর রব শুনি বেরি বেরি অন্তরে বজর বিঘাত।
অন্তর গর গর পাঁজর জর জর ঝর ঝর লোচনবারি।
দুখকুলজলধি সগন অছু অন্তর তাকর দুখ কি নিবারি॥
আওল আশ্বিন বিকসিত সব দিন থলজল পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লি কুসুম ভরে পরিমলে গন্ধিত শারদ কাল।
বিধি বড় দারুণ অবিধি করয়ে পুন সবরস যাহে যোই দেই।
তাকর ঠামে লেই পুন•পরিহরি পাপ করয়ে পুন সেই।

লোচনের নামে আর একটি বারমাস্য পাওয়া যায়। ইহাতেও কবিত্ব আছে।
বৈশাখে বিষম ঝড় বহিয়া আকাশে। কে রাখে এ তরী পতি কাণ্ডারী বিদেশে।
আষাঢ়েতে রথ-যাত্রা দেখি লোক ধন্য। আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য।
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী। একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী।
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে। কান্ত বিনু অভাগী তুলিবে তার কোলে।

গৌর-পদাবলীর মধ্যে এমনি বহু রসাত্মক চরণ আছে।

মাথুর

নামে অক্রূর, কিন্তু যাহার মত ক্রূর কেহ নাই, সে ব্রজপুরে আসিয়াছে শ্যামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য। শ্রীমতী তখনও জানেন না, কিন্তু Coming events cast their shodows behind শ্রীমতী ভাবিতেছেন কোন' দিকে ত অকুশল নাই তবে—"চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি?" এক সহচরীর সঙ্গে দেখা হইল—"মোহে হেরি সো ভেল সজল নয়ান।" ইহার কারণ কি? মথুরা হইতে কে যেন বৃন্দাবনে আসিয়াছে।

"তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি।

তবধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে লোরে লোচন যুগ ঝাঁপি।"

একটা বিষাদের ছায়া সর্ব্বত্র। "কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে সঘনে রোয়ত শুকসারী।" আসল কথা বেশিক্ষণ চাপা থাকিল না। সখীরা গোপন করিলে কি হইবে? (শ্যামের সঙ্গে কুঞ্জে শ্রীমতীর শেষ সাক্ষাৎ হইল, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে—রাইকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—শ্যামের নীরদনয়নে ঢরঢর অশ্রু ঝরিতেছে।) শ্রীমতী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তখনও আশা আছে, ভাবিলেন বুঝি শ্যামের অভিমান হইয়াছে। "যবহুঁ পুছঁলু বেরি বেরি সজল নয়নে রহু হেরি।" (আজিকার এ মিলন বিরহ অপেক্ষা বহুগুণে করুণ ও দারুণ। চুম্বনের অমৃতরস অশ্রুজলে লবণাক্ত।) "নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ। দরদর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ।" (আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাগরসের কি অদ্ভুত অভিব্যক্তি! কামনালেশশূন্য নির্লালস প্রেমের অবিমিশ্ররূপ শিথিল ভুজবন্ধে আত্মপ্রকাশ করিল।) 'রভসরস কেলির' সে উন্মাদনা কোথা গেল? "আনহি ভাতি রভসরস কেলি।"

সখীদের সঙ্গে দেখা হইল। রাধা বলিলেন—"তুহু পুন কি করবি গুপতহি

রাখি। তনুমন তুহুঁ মঝু দেয়ত সাখী। তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়। বজর কি বারণ করতলে হোয়।" হাত দিয়া কি বজ্র ঠেকানো যায়? কালিন্দী দেবীকে বল—তাহার পিতাকে (সূর্য্যদেবকে) ধরিয়া রাখুক, (আজিকার রাত্রি যেন প্রভাত না হয়।) আর যদি তাহা না পারে, তবে তাহার ভ্রাতা (যমকে) পাঠাইয়া দিক। (শ্রীমতী পরক্ষণেই বলিলেন—"না না!—

গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়। পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়।

অর্থাৎ আমার যাহা হয় হইবে, প্রিয়ের অমঙ্গল না হয়।" শ্রীমতী চিত্তের দৃঢ়তা রাখিবার বৃথা প্রয়াস করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব।"

"যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দেল।

সে কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিবে? ইহা কি সম্ভব? আবার—

যো মঝু সরস পরশ রসলালসে মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টককুঞ্জে জাগি নিশি বাসর পন্থ নেহারই মোরি।

সে তাহার প্রিয়তমাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবে, এ কি সম্ভব?)

শ্রীমতী 'উরপর করাঘাত হানিতে হানিতে' মূর্চ্ছিত হইলেন। 'শ্যাম' অক্ষর দুইটি সখীরা উচ্চস্বরে কানের কাছে উচ্চারণ করিতে লাগিল—তাহাতে সংজ্ঞা ফিরিল। কিন্তু তাঁহার "বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে মুছত উতপত বারি।" (তিনি ভাবিতে লাগিলেন) "কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।" (তাহার প্রেম কিসে শিথিল হইল? "পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোরে বাম।" পিয়ার দোষ নাই, বিধিই আমার প্রতি বাম।)

(তারপর শ্রীমতীর দিব্যোন্মাদ—

খেনে উচ্চ রোয়ই খেনে পুন ধাবই খেনে পুন খলখল হাস।
চীত পুতলি সম খেনে পুন হোয়ই প্রলাপই খেনে দীর্ঘশ্বাস॥

(এই দিব্যোন্মাদই শ্রীচৈতন্যের জীবনেও প্রকটিত। নরহরি গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—রাধার পিরীতি হৈল হেন।)

(শ্রীরাধা বড় ক্ষোভেই বলিতেছেন—"সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান। কান হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা।") কানু রাধা হইয়া না জন্মিলে বিরহের দুর্বিষহ বেদনা উপলব্ধি করিবেন না। বৈষ্ণব মনীষীরা বলেন,—রাধা কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই রাধার এই অভিশাপ ফলিয়াছে

নিজের এই হাহাকারে লজ্জা পাইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—(শ্যাম চলিয়া গেল—দুই চোখ মেলিয়া তাহাই দেখিলাম, শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলাম—তবু প্রাণ বাহির হইল না। কি নির্লজ্জ এই জীবন।) "না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি।" "ক্ষণ রহুঁ জীবন বড় ইহ লাজ।" "দেখ সখি নীলজ জীবন মোয়। পিরীতি জানায়ত অব ঘন রোয়॥" (কৃষ্ণহীন জীবনের মূল্য কি? "কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক।" এতদিনে বুঝিলাম "চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত।" জীবন কিছুতেই যাইতে চায় না। ইচ্ছা করিয়া এ জীবন বিসর্জ্জনও করা যায় না। কারণ, আশা ত ত্যাগ করা যায় না—"তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।" কিন্তু আশা রাখিয়াইবা লাভ কি? আশাই বা কতদিন রাখিব?)

("অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
এ নব জীবন বিরহে গোয়ায়লুঁ কি করব সোপিয়া লেহে।)

যৌবন গেলে প্রিয়ের প্রসাদ লইয়াই বা কি করিব? "কনয়া বিহনে মণি কবহুঁ না সাজ।" যৌবন বিনা প্রেমের মূল্য কি?

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিনু সূরে।
জোবন বিনু তন তনু বিনু জোবন কী জোবন পিয়া দূরে।

(শ্রীমতী একবার ভাবিলেন—

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমিব যোগিনী হৈয়া।
কারু ঘরে যদি মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়া।

এই কথা মনে করিয়াই তাঁহার দরদী অন্তরে ব্যথা বাজিল—

বাঁধিব কেমনে সে হেন তুলহ হাতে।
বাঁধিয়া পরাণ ধরিব কেমনে তাহা যে ভাবিছি চিতে।

শ্রীমতী আবার ভাবিতেছেন—জীবনে প্রিয়তমকে আর পাওয়া যাইবে না—কিন্তু মরণে ত পাওয়া যাইতে পারে। মরণে এ দেহ ত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। তখন ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোমের মধ্য দিয়া যেন তাঁহাকে পাই।

* যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
সো সরোবরে পহুঁ নিতিনিতি নাহ। মঝু অঙ্গসলিল হোই তথি মাহ।
যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ।
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহিঁ হোই মৃদুবাত।
যাহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥

এইভাবে শ্যামকে পাইলে বিরহ মরণের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইতে পারে। *

শ্রীমতী বৃন্দাবনের বনপথ-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—সর্ব্বত্রই দেখিতেছেন—লীলা মাধুরীর স্মৃতিচিহ্ন। শ্রীমতী বলিতেছেন—

গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন কালিন্দীকেলি কদম্ব,
মন্দির গোপুর নগর সরোবর কো কাহা করু অবলম্ব।

মাধবীতলে আসিয়া বলিতেছেন—

---

* গোবিন্দদাস একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাব লইয়া এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—
পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং। ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তথাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে। ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তাল-বৃন্তেঽনিলঃ।

এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগী হেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না পড়ে কেন নিলজ পরাণ নাহি যায়।
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ। শুনইতে পিকবর অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী পরিমল এহ। কো জানে জীউ রহত এই দেহ॥

ইহাতেও জীবন যে কি করিয়া আছে তাহা কে জানে?

দিবস লিখিয়া লিখিয়া নখ ক্ষয় গেল। গৃহ-ভিত্তির গাত্র কালির দাগে ভরিয়া গেল। "দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।" স্বপ্নেও আজ সে দুর্লভ।

নয়নক নিন্দ গেও মঝু বৈরিনি জনমহি যো নাহি ছোড়।
সপনহি সো মুখ দরশন দুলহ অতএ নহত্ত কভু মোর।

পথ চাহিতে চাহিতে 'নয়ন অন্ধায়ল'।

"এখন তখন করি দিবস গোয়ায়লুঁ দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোয়ায়লুঁ ছোঁড়লুঁ জীবনক আশা।
বরিখ বরিখ করি সময় গোয়ায়লুঁ খোয়লুঁ এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে॥

শ্রীমতীর মনে এ কথাও জাগিয়াছে—মথুরানগরে বিলাসিনী রাজবালাদের পাইয়া শ্যাম হয়ত গোপবালাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—

গ্রাম্য কুলবালিকা সহজে পশু-পালিকা হাম কিয়ে শ্যাম উপভোগ্যা।
রাজকুলসম্ভবা সরসিরুহ-গৌরবা যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা।

অমিয়া ফলের আস্বাদ পাইলে কি কেহ নিম্বফলের দিকে চায়? মালতী ফুল পাইলে কি ভ্রমর ধুতুরা ফুলে যায়? পদকর্ত্তা ইহাতে রাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীমতীর পক্ষে এ চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন—তোমরা প্রিয়ের কাছে গিয়া কদম্বতলের শপথ স্মরণ করাইয়া দিও। বৃন্দাবনের শুকশারী ও কপোত সাক্ষী আছে। "কহিও তাহার পাশে যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম সে মোরে দেখিয়া

হাসে।" তাহাতেও তাহার দয়া হইতে পারে। আমারত জীবন শেষ হইয়া আসিল। আমি আর রহিব না। তবু সে যেন একবার ব্রজপুরে আসে। আমার স্মৃতিচিহ্ন এখানে থাকিল।

নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মোর এই গলার হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার।
এই তরুশাখায় রহিল শারি শুকে। মোর দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে।
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী। পিয়া হেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী।

আমার জন্যই শুধু এই অনুরোধ জানাইতে বলিতেছি না। শ্রীদাম সুদাম সখাগণ আছে, তাহাদের সঙ্গে যেন একবার দেখা করে। আমি হয়ত অপরাধ করিয়াছি—তাহারাত নিরপরাধ। আর অভাগিনী যশোদা জননী?

দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী। আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি।
তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন। কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন।

শ্রীমতীর অঙ্গের ভূষণ এখন দূষণ হইয়া উঠিয়াছে। ভূষণে দূষিয়া তাই বলিতেছেন—

শঙ্খ কর চুর বেশ কর দূর তোড় গজমতি হার রে।
সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া কর দূর পিয়া বিনা কেবা কার রে॥

শ্রীমতী নিজ অঙ্গের ভূষণগুলি সখীদের বিলাইয়া দিয়া বলিলেন—

সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে আনলো সখি গরল করি গ্রাসে।

তারপর আমার প্রাণহীন দেহ—"নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি"—শ্যামলরুচি তমাল তরুর শাখায় বাঁধিয়া রাখিবি। কেন এই অনুরোধ জান?

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে॥

শ্রীমতীর আক্ষেপের মধ্যে মান অভিমান আর নাই। আপনার দীনতাই তিনি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব ভৈগেল নিরাশা।

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোন অপরাধে তাঁহার এ দুর্দ্দশা। "কার পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিলু বাম পায়।" "না জানিয়া কোন দেবেরে নিন্দিল।" ইহা কি কোন অনাচার বা অহঙ্কারের দণ্ড?

পিয়াক গুরু গরবে হাম কবহু ধরণীতলে
তৃণহুঁ করি কাহুক না গণনা।
নহিলে কেন ঐছে গতি কাহে ভেলরে সখি
সোই অভিশাপ মুঝে ফলনা।

আবার বলিয়াছেন—

পূরব জনমে বিধি লিখিল ভরমে। পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে।

শ্রীমতীর এত অবিচারেও অভিমান নাই। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

জনমে জনমে রহউ সে পিয়া আমার। বিধি পায়ে মাগে মুঞি এই বর সার।
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ। মরণ সময়ে পিয়ার না হেরিনু মুখ।

শ্যামহারা বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দশা কবিরা নানা ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।
রোদতি পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।

পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—

তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর স্থল জল কমল হুতাশ।
শুকপিক পাখী শাখি পর রোয়ই রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকীসহ শিবা রহি রহি রোয়ই লোরহি পঙ্কিল ধরণী।

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

(১) সারী শুক পিক কপোত না ফুকরত কোকিল না পঞ্চম গান।
কুসুম তেজি অলি ভূমি তলে লুঠই তরুগণ মলিন সমান।

(২) কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বন দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাব।

কেবল প্রকৃতির কথা নয়, কবিরা সখীগণ, সখাগণ ও যশোমতীর বেদনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও অতি করুণ। বৃন্দাবনের সে দুর্দ্দিনের কথা বাঙ্গালার কবিরা আজিও ভুলেন নাই। বর্ত্তমান যুগের একজন কবি এক কবিতায় সে দুর্দ্দিনের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। সে কবিতার প্রথম চরণ—

গোকুলে মধু ফুরিয়ে গেল আঁধার হলো বৃন্দাবন।

আর একজন কবির কবিতার নাম অন্ধকার বৃন্দাবন।

প্রথম চরণ—নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

শেষ চরণ—গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো চলে না হৃৎস্পন্দ আর।

বৈষ্ণব কবিগণ শ্যামহারা বৃন্দাবনের ও শ্রীমতীর দুর্দ্দশার বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীমতীর সখীদের মথুরায় লইয়া আসিয়াছেন। সখীরা মথুরার অধিপতিকে 'ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়া' ইত্যাদি বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেছেন, সেই সঙ্গে শ্লেষ ব্যঙ্গও হানিয়াছেন।—

"সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়ায় কুবুজা বসেছে খাটে।"

"দেশে কে না জানে চোরা কালা কানে বিদেশে হয়েছ সাধু।" "আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি বিধি মিলিয়েছে জেনে।" ইহা ছাড়া, রাধার পায়ে যাবক রচনা, দাসখৎ লেখা, ক্ষীরননীচুরি ইত্যাদি অগৌরবের কথা এবং নানা-প্রকার লজ্জালাঞ্ছনার কথা সখীরা স্মরণ করাইয়া দিল। শেষ পর্য্যন্ত অনেক আবেদন নিবেদন। রাধার দুর্দ্দশার অতি করুণ বর্ণনা। কবিরা ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীকৃষ্ণকেও বিচলিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ 'কাঁহা মোর রাই' বলিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—এরূপ কল্পনাও করা হইয়াছে।

অবসর নাহি বাঁশী নিতে।
নূপুর বিহনে পায় গোকুলের পানে ধায় পীতধড়া পরিতে পরিতে।

ননী জিনি সুকোমল দুখানি চরণতল কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর।
দয়া করি চাতকীরে পিপাসা করিতে দূরে ধায় যেন নবজলধর।
সেই সে রাধার ধাম আসি উপনীত শ্যাম বিরহিণী জিউ হেন বাসে।
গোবিন্দদাসে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয় বসন্ত ঋতু পরকাশে।

ইহা ভাবসম্মিলনের পদ নয়। ইহা দরদী কবির একটা কল্পনাচিত্র মাত্র।

অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতীর মনে হইয়াছে 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ'— এই ভাব শ্রীমদ্‌ভাগবত ও গীতগোবিন্দেও আছে, কিন্তু বিদ্যাপতি ঠাকুর ঐ তত্ত্বকে রসের নির্ঝরে পরিণত করিয়াছেন—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্ব ভাবহি বিছুরল আপন গুণ লুবধাই।
রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা।
দুহুঁ দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি কবি বিদ্যাপতি ভান।

এই তত্ত্ব ও এই রস দুইই শ্রীচৈতন্যের জীবনে কিরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছিল বৈষ্ণব সাহিত্যের সকল রসিকই তাহা জানেন।

সখী-মুখে শ্রীমতীর দশা মামুলী কবি-প্রথায় বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি চরণে রসঘন হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন—

"নয়নক লোর লেশ নাহি আওত ধারা অব নাহি বহই।
বিরহক তাপ অবহুঁ নাহি জানত অনিমিখ লোচনে রহই।"
"মরকত স্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে খিন দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কষিল কনক রেহা।"

"ক্ষণে ক্ষণে অনুরাগে এমনি নিশ্বাস ছাড়ে নাসার বেশর পড়ে খসি।"
"শিশিরে লতা জনু বিনি অবলম্বনে উঠইতে করু কত সাধ।"

"ঘৃত দিয়া এক রতি জালি আইলা যুগবাতি সে কেমনে রহয়ে যোগান।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন ঝাট আসি রাখহ পরাণ।"
"অঙ্গুরী বলয়া ভেল দেহ দীপতি গেল দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে হোই নাহি পারই তন্তুক দোসর দেহা।

রাধার দেহের যৌবনশ্রী, ভূষণদ্যুতি ও শ্রীরূপ-লাবণ্য কৃষ্ণ-বিরহে চৌদশী চাঁদের মত একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে—এই কথা কবিরা নানাবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে কত ভাবেই না বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

শরদক শশধর মুখরুচি সোপলক হরিণক লোচনলীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোপল পায়ে মনোভব পীলা।
দশনদশা দাড়িবকে সোপলক বন্ধুকে অধররুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোপলক কাজরসম সব ভেলি।

ঘনশ্যাম বলিয়াছেন—

অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নবঘন দামিনী দ্যুতি হরি নিল।
লেই যৌবন ছিরি নব অঙ্কুর করি নিধুবন ঘন বন ভেল।

গতিগোবিন্দ বলিয়াছেন—

চামরী লইল কেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ মুখশোভা নিল শশিকলা।
মৃগ নিল দুই আঁখি ভ্রূ নিল খঞ্জন পাখী মৃদুহাসি লইল চপলা।

শ্রীরাধার দেহে সে কান্তি আর নাই। রাধার রূপ দেখিয়া যাহারা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়াছিল এখন তাহারা নিশ্চিন্ত হউক—

এত দিনে গগনে অখিন রহু হিমকর জলদে বিজুরী রহু থির।
চামরী চমরু নগরে পরবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর।
কুমুদিনীবৃন্দ দিনহু সব হাসউ বাঁধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজোর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ।

এইগুলি ছাড়া—"দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা" "তপত সরোবরে থোরি

সলিল জন্থ আকুল সফরি পরাণ।" "উচকুচ উপর রহত মুখমণ্ডল সো এক অপরূপ ভাতি। কনয়া শিখরে জন্থ উয়ল শশধর প্রাতর ধূসর কাঁতি।" "দিনে দিনে খীন তন্থ হিমে কমলিনী জন্থ।" "বিরহ জরে জরি কনয়া মঞ্জরি রহল সে রূপক ছাই।" ইত্যাদি অলঙ্কৃত চরণের দ্বারা কবিগণ শ্রীরাধার দুঃসহ বিরহদশার আভাস দিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিয়াছেন—এ দুঃখ বচনাতীত।

প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের যে গভীর চিরন্তন সংযোগ তাহা কবিরা ভুলেন নাই। মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির অঙ্গে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। এই বৈচিত্র্যের সহিত শ্রীমতীর প্রত্যেক প্রেম-লীলার স্মৃতি বিজড়িত। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যগুলি শ্রীমতীর বেদনার উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করিয়াছে। কবিরা ইহাতে নূতন নূতন কবিতার প্রেরণা ও উপাদান পাইয়াছেন। এই কবিতাগুলিই শ্রীমতীর বারমাস্যা।

কবিরা বলিয়াছেন—বিরহে প্রকৃতির পীড়ন দ্বিগুণিত, আর প্রকৃতির প্রসাদ নিগ্রহে পরিণত হইতেছে।

বসন্তে—চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহুকুহু কহ শুনি বিরহিনি কৈসে জীবই।

গ্রীষ্মে—একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুন তপনক তাপ।
ঘামি গলয়ে তন্থ নুনিক পুতলি জন্থ দেখি সখি করু পরলাপ।

বর্ষায়—কুলিশ কতশত পাত মোদিত মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাছরি ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।

শীতে—আশ্বিনমাসে বিকশিত পদুমিনি সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ।

হেমন্তে—আঘন মাস রাস রস সায়র নায়র মাথুর গেল।
পুরবাসিনিগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল।

শীতে—তুয়া গুণে কামিনি কত হিম যামিনি জাগয়ে নাগর ভোর।
সরসিজ মোচন বর লোচন য়হুঁ ঝরতহি ঝর ঝর লোর।

বারমাস্যা পদে প্রত্যেক মাস ধরিয়া রাধিকার বেদনার নবনব রূপ দেখানো হইয়াছে। এই সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যাও রচিত হইয়াছে। ঘনশ্যামদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস আঘন মাস হইতে ও বিদ্যাপতি আষাঢ় মাস হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির অন্য একটি বারমাস্যা চৈত্র হইতে আরব্ধ, তুই গোবিন্দদাস তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। বারমাস্যার পদগুলি ছন্দের মাধুর্য্যে, ভাষার চাতুর্য্যে, রসের প্রগাঢ়তায়, পদবিন্যাসের পারিপাট্যে অপূর্ব্ব। এইগুলি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। প্রত্যেকটি হইতে এক একটি স্তবক উদ্ধৃত করি—

বিকাশহাস বি-লাস সুললিত কমলিনী রস জৃম্ভিতা।
মধু-পান-চঞ্চল চঞ্চরী-কুল পদ্মিনী মুখচুম্বিতা।
মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু চারু চৌদিক সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি সকল সুখপরিবঞ্চিতা। বিদ্যাপতি
অব, ভেল শাঙন মাস। অব, নাহি জিবনক আশ।
ঘন, গগনে গরজে গভীর। হিয়া, হোত যেন চৌচির।
হিয়া--হোত জনু চৌচীর থীর না বান্ধে পলকাধো আর রে।
ঝলকে দামিনি খোলি খাপসে মদন লেই তলোয়ার রে। (ঘনশ্যাম)
শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগয়ে কামিনি জীবন কণ্ঠহি লোল।
ভাদর দরদর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর বহই মনোভব মন্দ। (গোবিন্দ দাস)
পৌষতুষার তুষানলে জারল জীবন নায়রি নাহ।
সুধির সমীর সুধাকর শীকর পরশ গরল অবগাহ।

অহনিশি ডহডহ হিয়া জিউ থির নহ দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ।
(বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণের বারমাস্যা)

মাস গণি গণি আশ গেলহি শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়া সে গেল পরদেশিয়া।
সময় শারদ চাঁদ নিরমল দীঘদীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া।
(গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী)

শারদ চন্দ্র, মলয়ানিল, ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিল-পাপিয়া-হংস-চক্রবাক-ডাহুক-ডাহুকীর কণ্ঠস্বর, দাদুরীর রোল, দামিনীর চমক, মেঘের মন্দ্র, ময়ূরের নৃত্য ও কেকা, মালতী, কুন্দ, কুমুদ, পদ্মিনী ও আম্রমঞ্জরীর সৌগন্ধ্য ইত্যাদি বিরহ-বেদনাকে নিত্য নবীভূত করিয়াছে।

মাসের পর মাস চলিয়া যায়, প্রিয়ের দেখা নাই। এই কালের অতিবাহন নৈরাশ্যকে কেমন করিয়া বাড়াইয়া দিতেছে কবিরা তাহা এই পদগুলিতে ফুটাইয়াছেন। এই নৈরাশ্যের বেদনাধারা কবিতাগুলিকে উদ্দীপন-বিভাবের নির্ঘণ্টে পরিণত হইতে দেয় নাই। শৈলসম যৌবনকে অঙ্গে ধারণ করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকা, একেশ্বরী হইয়া প্রিয়হীন শয্যায় অবলুণ্ঠন, প্রকৃতির মধ্যে ও লোকালয়ে নিত্য নব নব উৎসবের মধ্যে বিরহিণীর ভাগ্য-যন্ত্রণাভোগ কবিতাগুলিতে রস যোগাইয়াছে। কত কথাই শ্রীমতীর মনে পড়িতেছে—গ্রীষ্মের রজনীতে প্রিয়তমের কোলে তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়া যাইত, বর্ষায় অশনি-গর্জ্জনে ত্রস্ত হইয়া প্রিয়তমকে সে আঁকড়িয়া ধরিত; গভীর শীতের রজনীতে প্রিয়তমের অঙ্কের উষ্ণতায় শৈত্যের বেদনা বিদূরিত হইত—শরতে ও বসন্তে তাহার সঙ্গে কত রসলীলাই না হইত ইত্যাদি।

মাথুরের বারমাস্যা কবিতাগুলি জগতের বিরহ-সাহিত্যে অপূর্ব অবদান।

বৈষ্ণব কবিরা এইভাবে মাথুরের গান গাহিয়া গিয়াছেন। তারপর তাঁহাদের অনুকরণে এদেশে শতশত কবি রাধা-বিরহের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে ক্ষেতে ক্ষেতে পথে পথে গায়কগণ সেই সকল গীতি গাহিয়া বঙ্গদেশের হৃদয়াকাশকে মেঘমেদুর করিয়া রাখিয়াছে—গৃহস্থগণের চিত্তকে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে—গৃহসংসার হইতে তাহাদের মনকে কাড়িয়া লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজানা অনন্তের উদ্দেশে লইয়া গিয়াছে—তাহাদের মনে অজ্ঞাতসারে মানবাত্মার চিরবিরহের কথা জাগাইয়াছে—সংসারের কলকোলাহলের মধ্যেও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্যের উদ্দীপন করিয়াছে।—এবং পরিপূর্ণ সুখসৌভাগ্যের মধ্যেও একটা অনিদান অস্বস্তি ও অপূর্ণতার বেদনা সঞ্চার করিয়াছে।

(এই মাথুরের নানাভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কবিতায় সে ব্যাখ্যাগুলির কথা বলিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি। বৃন্দাবনকে লীলা-ক্ষেত্র বা স্বপ্নজগৎ এবং মথুরাকে সত্য লোক বা জীবন-সংগ্রামের কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিয়া একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। বৃন্দাবন লীলাভুবনই হউক, আর স্বপ্ন-লোকই হউক আর আহ্বান সত্যেরই হউক আর জীবন-সংগ্রামেরই হউক —বিদায়ের বেদনা মহাবীরের পক্ষেও মর্ম্মন্তুদ। সত্যের আহ্বানে চঞ্চল বীর-হৃদয়ও বলিবে—

বিদায় চন্দ্রাননে!
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে॥
সাঙ্গ আজিকে বাঁশরীর গান হলো ব্রজে কলহাসি অবসান
শেষ, অভিসার মান অভিমান উচ্ছল রসাবেগ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল নীপনিকুঞ্জ চারুচঞ্চল,
ময়ূর ময়ূরী রস ঢলঢল গুরুগুরু ডাকে মেঘ।

তবু হায় যেতে হবে।
বারতা বহিয়া মথুরার দূত দুয়ারে এসেছে যবে।
ব'লো সখাসখীগণে
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত বঁধুর কুঞ্জবনে।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে কালীদহে তটবিটপী কাঁপায়ে।
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল মিছে গাঁথ বনমালা।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে
যাই বুকে বহি রসরাস-দোল-ঝুলনের স্মৃতিজ্বালা।

মিছে আর মায়াডোর।
ভেসে যাক চলে যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর।
কেমনে হেথায় রহি ?
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায়-নিদেশ বহি'।
ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে জীবন-মরণ-রণ-প্রাঙ্গণে
ডাকে মাথুরের কাতর কাকুতি আতুরের আঁখি-লোর।
পাষাণ-কারার আকুল রোদন করেছে সুপ্ত তেজের বোধন
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল।
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল। (পর্ণপুট)

আর একটি ব্যাখ্যা এই।—ভগবান বলেন—"ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি।" তিনি সখ্যবাৎসল্য ও মধুর রসেরই বশীভূত। মাধুর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যভাব আসিয়া পড়িলেই বাহুবন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে। আর তিনি লীলাভুবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহাই ভক্তের সাধনমার্গে মাথুর।

আপনারে সংগোপন করি কত দিন র'বে শ্রীমধুসূদন,
গোকুলের সখাদের সখীদের লীলারসে হয়ে নিমগন ?
সখারা চড়িল কাঁদে মানিনী ধরাল পায় হইয়া ভামিনী,
জননী খাওয়াল ননী কহিল কঠোর বাণী ব্রজের কামিনী।
লীলার মাধুর্য্য ভুলি অসতর্ক একদিন দেখালে বিভূতি,
তব পীতবাস ভেদি বিকীর্ণ হইল কবে ভাগবতী দ্যুতি।
গোকুলের সখাসখী চাহিল স্তম্ভিত নেত্রে কুণ্ঠাভয়াতুর।
হয়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ সমাপ্ত লীলার রঙ্গ, জ্বলিল মাথুর।
মাধুর্য্য বিদায় নিল ঐশ্বর্য্যের বাধা এলো জীবনের পথে,
গোষ্ঠের রাখাল, তুমি তব দূর্বাসন ভুলি আরোহিলে রথে।
সে রথ ত মনোরথ, হৃদয় দলিয়া গেল। কোথায় অক্রূর ?
মন ছাড়া কোথা পাবে ? মানসেই বৃন্দাবন আর মধুপুর।
যুগে যুগে দেশেদেশে এই লীলা অভিনীত মানুষের মনে।
কৃতাঞ্জলি দাস্যভাব মাথুর ঘটায় হায় প্রেমের স্বপনে।

মাথুরের আর একটি ব্যাখ্যা। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মাথুর আসে। যৌবনই বৃন্দাবন, যৌবনাত্যয়ই মাথুর। যৌবন প্রেমের মধ্য দিয়া যাহা উপলব্ধি করে, যৌবনাত্যয়ের দাস্যভাবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এ অঙ্গ লালিত্যহীন দৃষ্টি হয়ে আসে ক্ষীণ খালিত্যে পালিত্যে ভরে শির।
ভ্রান্তি ঘটে প্রতি কাজে, ক্লান্তি আসে কর্ম্ম মাঝে, মতি আর রয়নাক স্থির।
নৈরাশ্যে হৃদয় ভরে শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে লইয়াছে বিদায় যৌবন,
শ্যাম গেছে মথুরায় প্রাণ করে হায় হায় অন্ধকার মোর বৃন্দাবন,
কুসুমে বসে না অলি পড়ে মধুধারা গলি যমুনা ধরে না কলতান,
গাহেনাক পিকপিকী নাচেনাক আর শিখী শুকসারী গাহেনাক গান,

যুগেযুগে দেশে দেশে যৌবন-লীলার শেষে মানবেরে করিয়া আতুর,
জীবনে জীবনে হায় উল্লাস মিলায়ে যায়, হানে বজ্র এমনি মাথুর।
শিথিল স্নেহের টান বন্ধুত্বের অবসান ম্লান হয় প্রেম প্রেয়সীর,
অক্রূরের সাথে সাথে দাস্যভাবে সন্ধ্যাপ্রাতে মন্দিরে প্রণত হয় শির।

একটি ব্যাখ্যা সার্বজনীন। রাধা-বিরহ মানবাত্মার চিরন্তন বিরহেরই সাহিত্য-রূপ। পূর্ণের সহিত অসীমের সহিত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ সে বিচ্ছেদের বেদনা মানবমাত্রেরই অন্তরে সুপ্ত আছে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য সেই বেদনাকে জাগাইয়া মানব-চিত্তকে অকারণে উদাসী করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ এই বেদনার কবি। এই বেদনাকেই বৈষ্ণব কবিরা রাধা-বিরহের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাণীরূপ দিয়াছেন।

অক্রূরের রথে চড়ি লীলারঙ্গ পরিহরি' কবে শ্যাম রায়,
কাঁদাইয়া গোপীগণ কাঁদাইয়া বৃন্দাবন গেল মথুরায়।
গন্ধে মিশাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ অনির্বচনীয়,
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন হলো অতীন্দ্রিয়।
উঠিল শ্রীরাধিকার বুকফাটা হাহাকার বিদারি' গগন
"কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ দাও দরশন।"
কাঁদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখী রাধিকার শোকে
কাঁদে গোপগোপী যত অশ্রু ঝরে অবিরত জটিলারও চোখে।
অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক ধূপে, কানু বৃন্দাবনে,
তাই আজো রাধিকার আর্ত্তনাদ হাহাকার ধ্বনিছে ভুবনে।
গুমরে গিরির বুকে ধ্বনিছে নির্ঝর-মুখে নদী কলকলে,
মর্ম্মরিছে বনে বনে গর্জ্জিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বারিদ-মণ্ডলে।

জীবনে জীবনে ব্যথা জাগাতেছে ব্যাকুলতা অজানার টানে,
মুখে অন্ন নাহি রুচে চোখে ঘুম-ঘোর ঘুচে, চাহি কার পানে।
সে বিরহ আজো বাজে মন নাহি লাগে কাজে কারে যেন চায়,
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে স্বস্তি নাহি পায়।
মান যশ ধনজন তৃপ্ত করেনাক মন, মিটেনাক সাধ।
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হ'য়ে যায় সকলি নিঃস্বাদ।
কাহার বরণ স্মরি মেঘ হেরি শির'পরি পরাণ উদাস।
প্রেয়সী রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে ভোলে শ্লথ বাহুপাশ।
ব্রজের সজল আঁখি যত মৃগ যত পাখী নব জন্ম লভি'
হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে শত শত কবি
রাধার বিরহ রাগে তাদের কল্পনা জাগে হইয়া অরুণ,
তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি করেছে করুণ।
জাগায় সে গূঢ় ব্যথা কোন সুদূরের কথা পূর্ণের পিয়াসা,
তাহাদের গানে গানে ছুটেছে অনন্ত পানে অমৃত তিয়াসা।
নিখিল ভুবন ভ্রমি' বিশ্বসীমা অতিক্রমি' লক্ষ্য নাহি জানি।
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশ-কালাতীত সুরে তাহাদের বাণী।

শ্রীচৈতন্য-চরিত

গৌরচন্দ্রিকা-পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের রূপ, ভাবাবেশ ও বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত লীলাবৈচিত্র্যের মাধুর্য্যকে বাণীরূপ দেওয়া হইয়াছে। ঐগুলি পদাবলী সাহিত্যেরই অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা, তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বাণী ও তাঁহার ভাগবত মহিমা অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর ভক্তগণ কতকগুলি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। সামসময়িক ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের জীবনের কোন কোন ঘটনার কথাও লিখিয়াছেন, কিন্তু সবই পদাবলীর ছাঁদে। মুরারিগুপ্ত এবং পরমানন্দ কবিকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনী-লেখকদের ঐ দুই গ্রন্থই প্রধান উপজীব্য হইয়াছিল।

এই কাব্যগুলির মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এইগুলি বৈষ্ণব জগতের শ্রুতি, সংহিতা, পুরাণ সবই একাধারে।

এইগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাধারণতঃ ভগবানের অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে এবং তাঁহার জন্ম, জীবন ও তিরোধানের সহিত নানা অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিজড়িত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়া পূজা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না—বিভূতিমত্তার জন্য তাঁহাকে আমরা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করি। এ বিষয়ে গীতার সমর্থনও আছে। তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া মহাপুরুষের অবতারত্ব প্রতিপাদনের জন্য আমাদের কল্পনা অনেক অলৌকিক ব্যাপারের মায়াজাল বুনিয়া তাঁহার জীবনকে ভাগবতী লীলায় পরিণত করে। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তাহাই করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তগণ যখন জীবনচরিত রচনা করিলেন, তখন

শ্রীচৈতন্যের সহচরগণের নিকট হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন এবং মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে যাহা লিখিত ছিল, সমস্তই নির্বিচারে গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ ঐ সকল অলৌকিক ঘটনা সমস্তই বিশ্বাস করেন। অবৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকে ঐ সকল ঘটনাকে কল্পিত বলিয়া মনে করিয়াও শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। আবার অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রচারক মহাপুরুষ বলিয়াই মনে করেন।

কেহ কেহ মনে করেন,—নবদ্বীপের বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অনেকে শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিত না। তাহাদের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের জীবনে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য-বিভূতির আরোপ করিয়া থাকিবেন। * শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলা এমনই অদ্ভুত, অপূর্ব এবং অসাধারণ, তাঁহার প্রেমধর্ম্মের নিজস্ব অন্তঃশক্তি এতই অধিক যে তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনের জন্য কোন অলৌকিকতা বা অতি প্রাকৃত ব্যাপারের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ভক্তের জন্য তাঁহার অনলঙ্কৃত, বিভূতিলেশ-শূন্য জীবনলীলা ও জীবন বাণীই যথেষ্ট। অবিশ্বাসীর জন্যই ঐশ্বর্য্য বিভূতির দৃষ্টান্তের প্রয়োজন।

মহাপ্রভুর জীবনে অতিপ্রাকৃত বিভূতির দৃষ্টান্ত বহু থাকিলেও ঐতিহাসিক ধারায় জীবনচরিত-বিচারে সে সকল কথা বর্জনীয়। তাহাতে তাঁহার মহাপুরুষত্বের এমন কি ভগবত্তারও হানি হয় না।

এই গ্রন্থগুলি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও একশ্রেণীর সাহিত্য। সেকালে

* শ্রীচৈতন্যের জীবনে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা—কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করিয়া উদ্ধার সাধন, শুষ্কবৃক্ষের জীবন-সঞ্চার, বরাহরূপ ধারণ, চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ, অষ্টভুজ ও রামরূপ ধারণ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সলিল-শয্যায় শয়ন, আম্রবীজ রোপণ করিয়া সদ্যঃ সদ্যঃ পক্ক আম্র ফলানো, কুকুর ও ব্যাঘ্রের হরিনামকীর্ত্তন, একা রথ টানা, সার্বভৌমের জামাতা অমোঘের দণ্ড বিধান ইত্যাদি।

গদ্য রচনার প্রথা ছিল না। গ্রন্থ লিখিতে হইলেই পদ্যে লিখিতে হয়, ইহাই ছিল সেকালের সাহিত্যিক পদ্ধতি। এই গ্রন্থগুলিকেই মিল-দেওয়া পংক্তির গদ্য রচনার গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কৃচ্ছ্র কল্পিত মিলগুলি বাদ দিলেই ভাষা একপ্রকার গদ্যেই দাঁড়ায়। এই গ্রন্থগুলি কেবল জীবন-চরিত নয়, সে কালের ইতিহাসও বটে। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ইতিহাস ছাড়া সেকালের সমাজের ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা, লোকচরিত্রের কথা, বৈষ্ণব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী, নানা ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা—এমনি বহু বিষয় জানা যায়। স্থলে স্থলে কবিত্বও আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে একটি বিষয় খুব স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমাজে জাত্যভিমানের বিষ অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছিল। জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রকৃত ভক্তগণ সকলেরই শ্রদ্ধেয় ও নমস্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুশীলনে, ধর্ম্মশিক্ষায় এবং গুরুপদের গৌরবে ব্রাহ্মণেরই একাধিপত্য আর রহিল না। আচণ্ডাল সর্ব্বজাতির লোকের সহিত একত্র নামসংকীর্ত্তনে, শূদ্রাধমের সহিত আলিঙ্গনে, নীচজাতীয় ভক্তের পদধূলিগ্রহণে, সকলের সহিত একত্র ভোজনে, উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-গ্রহণে উচ্চজাতীয় ভক্তগণ বারবারই নিজেদের জাত্যভিমানকে পদদলিত করিয়াছেন—এইরূপই দেখা যায়। শূদ্র ভক্ত শালগ্রামপূজারও অধিকার পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মুখেও নীচজাতীয় ভক্তদের আশাতীত মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। যবন হরিদাসকে প্রভু আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন—

তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
নিরন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র কর অধ্যয়ন। দ্বিজন্যাসী হ'তে তুমি পরম পাবন।

শ্রীচৈতন্যেরই মুখের কথা—

'বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।' সভারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়।
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে। বিপ্র নহে বিপ্র যদি অন্য পথে চলে।

প্রভু শূদ্র শিখী মাহাতীকে যেরূপ বাড়াইয়াছেন—তাহাতে প্রকৃত বৈষ্ণব না হইলে বহু ব্রাহ্মণ ভক্তেরই মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইত। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে জাত্যভিমান-গত সংস্কারের এমনই প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান জাতিভেদ-হীন সমাজেরও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে শ্রীচৈতন্যের প্রসাদ লইয়া ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে কাড়াকাড়ি। কেহ কেহ পাতার অংশ ছিঁড়িয়া চাটিতে লাগিল। আবর্জ্জনা-স্তূপে জগন্নাথদেবের যে প্রসাদ ফেলিয়া দেওয়া হইত, কেহ কেহ তাহাই ভক্ষণ করিতেন। কুকুরের মুখ হইতেও মহাপ্রসাদ লইয়া কোন কোন ভক্ত আহার করিতেন। কোন কায়স্থ ভক্ত এক ঝাড়ুদার ভুঁইমালীর পদধূলি লইবার জন্য তাহার পা ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিলেন।

মোটের উপর, মনুষ্যত্বের বিচারে জাতিকুলের কোন মূল্যই নাই, চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিই একমাত্র বিবেচ্য—সমগ্র সমাজে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কত বড় দান, বর্ত্তমান যুগের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই তাহা বুঝেন।

চরিত-শাখার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ **গোবিন্দদাসের কড়চা**। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা ইহাকে জাল বলিয়া মনে করেন। কাহারো কাহারো মতে খণ্ডিত কীটদষ্ট কোন পুঁথিকে শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী আপনার

* বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের গোবিন্দদাস কর্ম্মকার শ্রীচৈতন্যের ভৃত্যরূপে গৃহত্যাগ করিয়া পুরীধামে গমন করেন। সেখান হইতে মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ-পরিক্রমায় সহচর ছিলেন। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে একথা বলিয়াছেন। কড়চায় গোবিন্দদাস তাঁহার ঐ পরিক্রমার একটা বিবৃতি দিয়াছেন। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা নাই। গোবিন্দ সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার পরিব্রাজক ও প্রচারক জীবনের যে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—কোন প্রকারে অলঙ্কৃত বা অতিরঞ্জিত না করিয়াই সেগুলির যথাযথ বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি নিজেকেও একজন পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই,—ভৃত্যের মতই

পরিকল্পনানুযায়ী পূর্ণাঙ্গতা দান করিয়াছেন। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে কড়চাখানি আসলই বটে,—গোস্বামী মহাশয় ভাষার অদলবদল করিয়াছেন মাত্র। গোবিন্দ সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, তাঁহার ভাষা ছিল অমার্জ্জিত এবং ছন্দোবন্ধেও তাহার গ্রন্থে অনেক ত্রুটী ছিল। গোস্বামী মহাশয় মার্জ্জিত ভাষায় এবং বিশুদ্ধ ছন্দে উহাকে নবকলেবর দান করিয়াছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ বাল্যকালে মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সাহচর্য্য লাভ করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল যেমন জানা যায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তেমনি রাষ্ট্রীয় অবস্থার কথা জানা যায়। চৈতন্য-মঙ্গলে আছে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিরাল্যা গ্রামের মুসলমানগণ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিত। আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা কৌতুকজনক। সুলতান হুসেন শাহকে কেহ বুঝাইয়াছিল,—নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বংশে জাত একজন লোক বাঙ্গালার রাজা হইবে। তাহাতে

বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে গোবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধির কোন পরিচয় নাই। প্রভু কোথায় কোন সভায় কি বিচার বা বাদানুবাদ করিয়াছেন অথবা কি ভাবে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহার কোন পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে যে যে পুরজনপদে প্রভু পদার্পণ করিয়াছেন—সেই সেই পুরজনপদের কথাও তাহাদের অধিবাসীদের কথা গোবিন্দ বিস্তৃত ভাবেই লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য নিজের অসাধারণ প্রেমভক্তিবলে (বিভূতিবলে নয়) নানা স্থলে যে পাষণ্ডী-তারণ করিয়াছেন, মোহান্ধচিত্তে প্রেমের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন, সে সব কথা বহু স্থলেই আছে।

গ্রন্থের মূলাশ্রয় যে প্রাচীন এবং গ্রন্থখানি যে প্রত্যক্ষদর্শীর রচিত, স্থলে স্থলে তাহার প্রমাণ আছে। কেবল কল্পনার সাহায্যে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করা চলে, কিন্তু পুরজনপদের তন্ন তন্ন বর্ণনা ও প্রতিদিনকার ঘটনার বার্ত্তা দেওয়া চলে না। বঙ্গভাষায় ভ্রমণ-বৃথান্ত রচনার সূত্রপাত এই কড়চা হইতেই আরব্ধ মনে করা যাইতে পারে।

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।

এ যেন ঠিক খৃষ্টের জন্মের আগে হেরোডের বিভীষিকার মত। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের 'মনোরাজ্যের রাজার' কথার ইঙ্গিত।

জয়ানন্দের পুস্তকের সমাদর হয় নাই। (ইহাতে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিছুই নাই। ইহা লোক-মনোরঞ্জনের জন্য পালাগান মাত্র। সেজন্য অনেক অবান্তর কথা ও পৌরাণিক কাহিনী ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্যের ভাবাবেশ বা দিব্যোন্মাদের কথাও নাই।) চৈতন্যও অগ্রজ বিশ্বরূপের মত অর্থাৎ সাধারণ সন্ন্যাসীর মত বৈরাগ্য গ্রহণ করিলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। ভাষা এমনই নীরস, গদ্যাত্মক ও ছন্দের ত্রুটীতে পূর্ণ যে ইহাকে গদ্য রচনা বলিলেই হয়। বলা বাহুল্য, পঙ্গু পদ্যের চেয়ে খাঁটি চলন্ত গদ্যে লিখিলে এমন অপাঠ্য হইত না।

এই গ্রন্থে তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজের একটা ইতিহাসও পাওয়া যায়। বৈষ্ণবতা একটা জীবিকা বা বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছিল, কীর্ত্তনাদি গানও বহু-লোকের উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, গুরুদের খুব প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল, তাহারা দোলায় ও ঘোড়ায় যাতায়াত করিত। কেহ কেহ বেশ ধনী হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক ঠাকুরবাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সে গুলিতে অলস ব্যক্তিরা বৈষ্ণব সাজিয়া অন্ন ধ্বংস করিত। এইভাবে বৈষ্ণব-সমাজের আদর্শচ্যুতি ও অধঃপতনের সূত্রপাতের কথা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের একটা ইতিহাস আছে। জয়ানন্দ বলিয়াছেন—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ-বিজয়া নাচিতে। ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেইলক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥

তারপর মৃত্যু। লোচন বলেন—প্রভু গুঞ্জাবাড়ীতে জগন্নাথে লীন। ঈশান নাগর বলেন—মূলমন্দিরে জগন্নাথ-দেহে লীন। সাধারণ জনপ্রবাদ —টোটার গোপীনাথে লীন। কবিরাজ গোস্বামী বেদনায় নীরব। সমস্ত

মিলাইয়া তিরোধান সম্বন্ধে একটা কিছু অনুমান করিয়া লইতে হইবে। জয়ানন্দ প্রধান বার্ত্তাটিই দিয়াছেন এবং সূত্র ধরাইয়া দিয়াছেন।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস) বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতম্ (কড়চা) অবলম্বনে এবং দামোদর, গুরু নরহরিদাস ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের মুখে চৈতন্যচরিত-কথা শুনিয়া ইনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। ইনি ছিলেন প্রকৃত কবি। সেজন্য ইহার গ্রন্থ অন্যান্য চরিত-গ্রন্থের তুলনায় রীতিমত কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। (এই কাব্য অনেকটা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ধরণেই রচিত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রধান চরিত্রগুলি শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান। দেবতারা আপন আপন পূজা-প্রচারের জন্য তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই অবতীর্ণ হইয়া নিজেই নিজের পূজা প্রচার করিলেন। মঙ্গল কাব্যের মত ইহার আরম্ভেও নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি আছে। মঙ্গল কাব্যের মত চৈতন্যমঙ্গলেও দেবতা ও মানবের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রাখা হয় নাই এবং স্বর্গে মর্ত্তে ভাবের আদান প্রদান দেখানো হইয়াছে।) এমনভাবে ইহাতে রাগরাগিণীর সংযোগ আছে, যাহাতে ইহা মঙ্গল কাব্যের মত গাওয়াও যাইতে পারে। এক সময়ে গ্রামে গ্রামে চৈতন্যমঙ্গল গান হইত। সূত্রখণ্ডটি দেবতাদের লইয়াই রচিত। নারদ গোলোকধাম, কৈলাস ও ব্রহ্মলোকে ছুটাছুটি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতারণের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছেন। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর শ্রীকৃষ্ণের অবতার। সূত্রখণ্ডের সমস্ত ব্যাপারটা পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুকরণে পরিকল্পিত।

অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ চৈতন্য-ভাগবতের চেয়ে ইহাতে কম নয়। *

---

* লোচনদাস কিরূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিপাদিত করিতেন এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই। এক ব্রাহ্মণ অর্থকষ্টে আর্ত্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে ধর্ণা দেয়। তাহাতে ফল না হওয়ায় সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতে যায়। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সে

কবি তাঁহার রচনাকে কাব্যে পরিণত করিবার জন্য অনেক স্বকল্পিত বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট হইতে মহাপ্রভুর বিদায়ের একটি করুণ দৃশ্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা-প্রসূত।

দুনয়নে বহে নীর ভিজিয়া হিয়ার চীর
বক্ষ বহিয়া পড়ে ধার।
চেতনা পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে বার বার।
শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেও হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক-মুখে শুনি ইহা বিদারিয়া যায় হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি।
অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন স্থানে
কেমনে হাঁটিবে রাঙা পায়।
ভূমিতে দাঁড়াও যবে প্রাণে মোর ভয় তবে
হেলিয়া পড়য়ে পাছে গায়।
কি কহিব মুই ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।

দেখিল একটি পর্বত-প্রমাণ পুরুষ সমুদ্র জল ভেদ করিয়া উঠিয়া সাধারণ মনুষ্য মূর্তি ধারণ করিল। সে তাঁহার অনুসরণ করিল এবং পীড়াপীড়ি করিয়া জানিতে পারিল তিনি বিভীষণ; জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছেন। কিন্তু তিনি মন্দিরে না গিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে গিয়া নিজের আবেদন জানাইল। শ্রীচৈতন্যের আদেশে বিভীষণ ব্রাহ্মণকে ধন দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সঙ্গে লইয়া গেল।

তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া
সুখে তুমি বসো এই ঘরে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—লোচন নরহরি-প্রবর্ত্তিত নদীয়া-নাগরী-ভাবের প্রচারক। চৈতন্যমঙ্গলেও এই ভাবের কথা আছে। চৈতন্যের বিবাহ-বর্ণনায় কবি বাসর ঘরে নদীয়ার কুলবধূদের কথায় বলিয়াছেন—

"বসন বচন সব খলিত হৈল। ঢুলিয়া পড়িল রসে বিশ্বম্ভর কোলে।"
পরমসুন্দরী যত সবে হৈল উনমত বেকত মনের নাহি কথা।
রসালসে আবেশে লোলি পড়ে গোরাপাশে গরগর কামে উনমতা।

ইহা কখনও স্বাভাবিক নয়। কবি নাগরী-ভাব প্রচারের জন্য এখানে কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন।

লোচন গর্ভবাস হইতেই মহাপ্রভুর ভগবত্তা দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু যখন গর্ভশায়ী তখন দেবতারা শচীদেবীকে স্তব করিতেছেন। কবি শ্রীকৃষ্ণের মত মহাপ্রভুকে অষ্টম গর্ভের সন্তান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

লোচন মহাপ্রভুর ম্লেচ্ছসম্পর্কের প্রসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। হুসেন শাহ, কাজী, যবন হরিদাস ইত্যাদির কথা একেবারেই বলেন নাই। বৃন্দাবন দাস যাহাদের লইয়া খুব বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—তাহাদের সম্বন্ধে লোচন নীরব। লোচন নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবকে অভেদ বলিয়া মনে করিতেন—সেজন্য পৃথক করিয়া নিত্যানন্দের মহিমা প্রচার করেন নাই। বৃন্দাবন দাসে বৈষ্ণবোচিত দীনতার অভাব আছে—লোচনে সে দীনতার অভাব নাই। কবিরাজ গোস্বামীর মত লোচনও বার বার স্বকীয় গুরুকে স্মরণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদে লোচনের খুব ঝোঁক ছিল। এমন চমৎকার ভাবানুবাদ আর কেহ করিতে পারিতেন না। রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক ও মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতের বাছা বাছা শ্লোকের 'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' এমন সুন্দর ভাবানুবাদ করিয়াছেন যে, অনুবাদগুলি

মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। ভাগবত, মহাভারত, ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনি ভারত ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক তুলিয়া লোচন, শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতারের ভবিষ্যৎসূচনা প্রমাণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথা ইঁহার গ্রন্থে সামান্যই আছে।

লোচনের রচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতির—সখি হে অপুরুব চাতুরি গৌরি—পদের অনুসরণে লোচন 'গজমোতি হার ছিল গলায় তাহার' ইত্যাদি পদ রচনা করিয়াছেন।

জীবনচরিত হিসাবে লোচনের গ্রন্থ খুব মূল্যবান্ নয়—কাব্য হিসাবেই উপাদেয়। চৈতন্যমঙ্গল গৌরনাগর উপাসনার নব ভাগবত, বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ইহা ভক্তিশাস্ত্র। ‡

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত—শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনের জন্ম। ইঁহাকে চৈতন্য-লীলার ব্যাস বলা হইত। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও নিত্যানন্দ প্রভুকে বলরামের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার 'এই ধারণা প্রচার করিবার জন্য' ব্যাসদেব রচিত ভাগবতের অনুসরণে চৈতন্য-লীলার বর্ণনা করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহিত চৈতন্য-লীলার এবং বলরামের আচরণের সহিত নিত্যানন্দের আচরণের মিল দেখাইবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করেন। সেজন্য তাঁহার গ্রন্থ ভাগবত বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং তিনিও ব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। "চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।" মাতা নারায়ণী দেবীই চৈতন্যমঙ্গল নাম বদলাইয়া গ্রন্থের নামকরণ করেন।

ইঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সেকালে চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ণোদয়ের পূর্বে বঙ্গদেশের ধর্ম্মজীবন কিরূপ তমসাচ্ছন্ন ছিল। বাঙ্গালীরা মনসা, চণ্ডী ও

‡ ইহা ছাড়া লোচনের দুর্লভসার নামে একখানি গ্রন্থ আছে। উহা সহজিয়া বৈষ্ণবদের আদরের ধন। তাহাদের সাধন ভজনের অনেক কথা উহাতে আছে।

বাশুলী দেবীর পূজা করিয়া মদ্যমাংস-সেবনে রাত্রি জাগরণ করিত এবং তাহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত।

ধর্ম্মাধর্ম্ম লোকে সব এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি—তদা তদা ভগবান অবতীর্ণ হ'ন। এই সময়েও তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল—বৃন্দাবন দাসের ইহাই প্রতিপাদ্য। ইহা কেবল ভাগবতের অনুস্মৃতি নয়, সত্যই সেকালে ধর্ম্মের দারুণ দুর্গতিই ঘটিয়াছিল। ভাগবতের অনুসরণেই বৃন্দাবনদাস বালক গৌরাঙ্গকে অত্যন্ত দুর্দান্ত রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশের পরও ভারতের বহু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বৃন্দাবন দাস এই সকল পাষণ্ডদের উদ্দেশে যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও বিনয়ের আদর্শ লঙ্ঘন করিয়াছে। বৃন্দাবন দাসের উষ্মা হইতে অবৈষ্ণব হিন্দুসমাজের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ কিরূপ ছিল বুঝা যায়।

✓চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যের জীবনের ঐশ্বর্য্য-বিভূতির বহু দৃষ্টান্ত আছে। শিশুগৌরের মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। করাইমু সর্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার। ‡

---

‡ কেবল শ্রীচৈতন্যের নয়, নিত্যানন্দেরও ঐশ্বর্য্য-বিভূতির কথাও যথেষ্ট আছে। দস্যুরা নিত্যানন্দের গৃহ লুণ্ঠন করিতে আসিয়া মায়া-প্রহরীর দ্বারা গৃহ পরিবেষ্টিত দেখিয়া পলায়ন করিল। গীতায় বিশ্বরূপ দেখানোর মত শ্রীচৈতন্য জ্ঞানগর্বান্ধ সার্বভৌমকে ষড়ভুজরূপ দেখাইলেন। সার্বভৌম অর্জ্জুনের মত স্তব করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া, চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ। নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন। এই সময় কেহ আসিয়া পড়িলে—'এথানে থাক প্রভু বোলয়ে আপনে। চারি পাঁচ মুণ্ডগুলো লোটায় অঙ্গনে।' প্রভু শ্রীবাসকে চতুর্ভুজ ও মুরারিকে শূকররূপ দেখাইলেন। বৃন্দাবনদাস হরিদাসকেও অলৌকিক শক্তিতে মহিমান্বিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মাঝে মাঝে বলিতেন—অদ্বৈতের (নাঢ়ার) আহ্বানে তিনি গোলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছেন—'মুঞি সেই মুঞি সেই' বলিয়া হুঙ্কার করিতেন। শ্রীচৈতন্য কখনও কখনও বলরাম-ভাবেও আবিষ্ট হইতেন। নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া শুঁড়ির দোকানের পাশ দিয়া আসিবার সময় মদের গন্ধ পাইয়া শ্রীচৈতন্যের বলরাম-ভাব জাগিয়া উঠিল। প্রভু শুঁড়ির দোকানে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হইলেন। শ্রীবাস সঙ্গে ছিলেন—ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর সারা পথ মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিলেন। শিশুগৌরাঙ্গ শুচি অশুচি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুরারি প্রভুর বরাহ-ভাবাবেশের কথা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবন—তাহার উপর রঙ চড়াইয়া প্রভুর চারিখানি ক্ষুর পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থখানি অসমাপ্ত এবং একান্ত ভাবে গৌড়ীয়। বাংলার বাহিরের সহিত চৈতন্যের সম্পর্ক বৃন্দাবন দাস একরূপ বর্জ্জনই করিয়াছেন। পুরীর জীবনপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস যতটুকু গৌড়ীয়, ভক্তগণের বিশেষতঃ নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের সম্পর্ক ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন। রায় রামানন্দ, প্রতাপরুদ্র, রূপসনাতন ইত্যাদি ভক্তগণের নামোল্লেখ মাত্র আছে। শ্রীচৈতন্য সমগ্র ভারতবর্ষের। নিত্যানন্দ কেবলমাত্র বঙ্গের। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট বলিয়া বঙ্গের মধ্যেই চৈতন্যের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে চৈতন্যচরিত রচনা করিয়াছেন। বহু বিষয়ে বৃন্দাবন দাস লোচনদাসের বিপরীত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের নিত্যানন্দ-ভক্তির আতিশয্য ও গৌরনাগর ভাবের নিন্দা এ বিষয়ে এই দুইটি প্রধান দৃষ্টান্ত।

বৃন্দাবনদাসের পুস্তকে লীলার অনুক্রম যথাযথ নয়। নিজেই তিনি বলিয়াছেন—'এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।' গ্রন্থের সূত্রে যাহা আছে, গ্রন্থের মধ্যে তাহার প্রসঙ্গ নাই।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে আমরা বিশুদ্ধ পয়ারের নিদর্শনী পাই। ইহার সহযোগীদের রচনায় সর্ব্বত্র পয়ারের রীতি রক্ষিত হয় নাই। তবু বৃন্দাবনের গ্রন্থ কাব্য হইয়া উঠে নাই—পুরাণ হইয়া পড়িয়াছে।

দিগ্বিজয়ি-পরাভব মহাপ্রভুর দুর্জয় পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্যই কল্পিত। শ্রীচৈতন্য পাণ্ডিত্যের জন্য দিগ্‌বিজয়ী নহেন—প্রেমভক্তির জন্যই বিশ্বজয়ী। বৃন্দাবন প্রভুকে পাণ্ডিত্যেও বিশ্বজয়ী করিতে চাহিয়াছেন। কত বড় বিরাট পাণ্ডিত্যকে প্রভু হেলায় হেয় জ্ঞান করিলেন এবং প্রেমের কাছে হিমাদ্রি সমান পাণ্ডিত্যও যে বল্মীকের মত তুচ্ছ, তাহা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। এ যেন কোন হোমিওপ্যাথের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য সে যে এলোপ্যাথিরও এম, ডি তাহাই বলা।

বৃন্দাবনের রাগ ছিল অবৈষ্ণব হিন্দুদের প্রতি, আরো বেশি রাগ ছিল অহিন্দুদের উপর। সেই সঞ্চিত ক্রোধ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—কাজীদলনের মারফতে। বিশেষ ভাবে নিত্যানন্দের মহিমা সূচিত হইবে বলিয়া বৃন্দাবন জগাই মাধাই উদ্ধারের কথা খুব ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্য চরিতামৃতের পরেই সমাদৃত। গ্রন্থখানির কাব্য হিসাবে বিশেষ মূল্য নাই—ঐতিহাসিক দিক হইতেও তথৈবচ। ভক্তিরসের দিক হইতে বৈষ্ণবসমাজে ইহার মূল্য অনেক।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত†—বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যভাগবত

† কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাবে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ইনি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। সেখানে ছয় গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয় এবং তাঁহাদের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তিনি মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। সংস্কৃতে রচিত গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা ভাষ্য ইহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এইগুলি ছাড়া, ইনি যৌবনে ছোট ছোট বাংলা পুস্তকও

থাকিতে কৃষ্ণদাসের এই গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন কি ছিল ? চৈতন্যভাগবত যতই আদরের ধন হউক, উহা অসমাপ্ত গ্রন্থ। উহাতে গৌরলীলার বর্ণনা আছে, কিন্তু চৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের মহাবাণী বিবৃত বা ব্যাখ্যাত হয় নাই। মহাভাব-জীবনের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহাই বাদ পড়িয়াছে। বৃন্দাবনদাস বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন—রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যা তো আছেই, তারপর আর প্রয়োজন কি ? কিন্তু বাংলাভাষায় অদ্যাবধি কেহ উহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

ইহা ছাড়া, লোচন বা বৃন্দাবনদাস দুইজনের একজনও মহাপ্রভুর অন্ত্য লীলার সম্যক্ বর্ণনা করেন নাই। এজন্য কৃষ্ণদাসকে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লিখিবার জন্য গোস্বামিগণ আদেশ করেন। তাহার গ্রন্থে তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কবির চরণে শতশত প্রণতি জানাইয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের সমাদর কমিয়া যাইবে বলিয়াই হউক অথবা চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ণোদয়ের পূর্বের কথা লইয়া অধিক সময়ক্ষেপের প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই হউক, কবি নবদ্বীপ-লীলার বর্ণনা সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। লোচনদাস সন্ন্যাস-গ্রহণের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় কৃষ্ণদাসের

লিখিয়াছিলেন। সেই গুলির স্থলে স্থলে প্রাচীন গদ্য ভাষারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ইনি যখন অতিবৃদ্ধ, তখন গোস্বামী প্রভুগণ ইঁহাকে চৈতন্যচরিত লিখিবার ভার অর্পণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার গুরু রঘুনাথ গোস্বামী ও অন্যান্য গোস্বামিগণ যথেষ্ট সহায়তা করেন। আঠারো বৎসর ধরিয়া তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কথিত আছে, পুঁথি সমাপ্ত হইলে অন্যান্য মূল্যবান্ বৈষ্ণবগ্রন্থের সহিত উহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়। সঙ্গে ছিলেন—নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস। ধনসম্পদ ভ্রমে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর উহা লুট করিয়া লইয়া যান। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়া রাজাকে প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা দান করিয়া পুঁথির উদ্ধার সাধন করেন। কথিত আছে, পুঁথি লুট হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস শোকে প্রাণত্যাগ করেন। একথা সত্য মনে হয় না। কারণ, নকল না রাখিয়া কোন পুঁথিই গৌড় দেশে প্রেরিত হয় নাই।

বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্ত্য লীলাই কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান উপজীব্য। মহাপ্রভু যে অন্ত্যলীলায় সর্ব্বদা রাধাভাবে বিভাবিত ও দিব্যোন্মাদে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিতেন, কচিৎ কখনও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আসিতেন, এ সংবাদ আমরা এই গ্রন্থেই পাই।* চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক (supplementary)। চৈতন্যভাগবত যদি চৈতন্যলীলার ভাগবত হয়, চরিতামৃত তবে ঐ লীলার গীতা।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের সহিত তাঁহার প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ ও বাণী ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শ্রীচৈতন্য মুখে এই বাণী প্রচার করেন নাই; তাঁহার লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা লিখিতে হইলেই এই বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে হয়। এই বাণীটি যাঁহারা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রূপ, সনাতন, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, জীব গোস্বামী, মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপূরই অগ্রগণ্য। ইহারা সকলেই সংস্কৃতে চৈতন্যদেবের বাণীপ্রচার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহাদের গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়া, নানা সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে ভাষানুবাদসহ পরিপোষক শ্লোক উৎকলন করিয়া, এবং বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের মুখে উপদেশ শুনিয়া ঐ বাণীর বিবৃতি, ব্যাখ্যা ও তত্ত্ববিশ্লেষণ করেন এবং যাহা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল তাহাকে একটি দার্শনিক তত্ত্বের সূত্রে সুগ্রথিত করেন। ফলে, এ গ্রন্থ গীতা বা ত্রিপিটকের মত ধর্ম্মসূত্রের গ্রন্থ হইয়াছে। সাগর-মন্থনে অমৃতের উদ্ভব হইয়াছিল—চৈতন্য চরিতামৃতও সেইরূপ গ্রন্থ-সাগর মন্থনে উৎকলিত। দীর্ঘকালের প্রয়াস এবং সুদীর্ঘকালের

* বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট হইয়া চৈতন্য ভাগবতে নিত্যানন্দের কথাতেই গ্রন্থশেষ করিয়াছেন—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার বর্ণনা তাঁহার দ্বারা হয় নাই। বৃন্দাবনস্থিত ভক্তগণ সেই লীলা-মাধুরীর জন্য সতৃষ্ণ ছিলেন। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—প্রধানতঃ সেই তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য তাঁহার গ্রন্থ রচনা।

অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইয়াছিল কেবল প্রেমধর্ম্মের মূল তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নয়, উহাকে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক করিতে এবং অতি প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় ও ভঙ্গীতে সাধারণের অধিগম্য করিয়া উপস্থাপিত করিবার জন্য। মহাপুরুষদের মুখের কথা সাময়িক ভাবাবেশের অভিব্যক্তি; তাহা সাধারণের কাছে রহস্যময়। তাঁহাদের আচার আচরণও লৌকিক নীতি-সূত্র বা কর্ম্মসূত্রের আদর্শে বিচারিত হইতে পারে না। তাঁহাদের মনের ভাব যতটুকু অনুভাব ও আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়—তাহাও দুর্জ্ঞেয়, গহন ও দুরধিগম্য। যেজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মগুরুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবনবাণীর Rationalisationএর প্রয়োজন হয়। নতুবা যাহাদের অহৈতুকী ভক্তি নাই, তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কবিরাজ গোস্বামী ইউরোপের Scholastic Philosopherদের মতো এই Rationalisationএর কাজ করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ মনোবেগের মিষ্টিক অভিব্যক্তি, তাহাকে যুক্তিপরম্পরা ও মনস্তত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে দেশে দেশে যুগে যুগে সমাদৃত হয় না। ধর্ম্মগুরুর তিরোধানের পর যত দিন অতিবাহিত হইতে থাকে, ততই তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব দেশে ও কালে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে। তখন তাঁহার প্রভাবকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার বাণীকে দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অনুকল্প সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, মানুষ যতই ভক্ত হউক, সে যে বিচারশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী জীব, তাহা সে একেবারে ভুলিতে পারে না। তাই যুগে যুগে কবিরাজ গোস্বামীর মত বাণী-ব্যাখ্যাতার প্রয়োজন।

এই গ্রন্থে গোস্বামী দেখাইয়াছেন—ব্রজলীলার দ্বৈতভাবই নবদ্বীপ-লীলার অদ্বৈতভাবে পরিণত, রাধাকৃষ্ণের একাত্মকরূপই শ্রীচৈতন্য। এ তত্ত্বের প্রচারক স্বরূপদামোদর। সে মহাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের গুরু, গোস্বামী সেই মহাভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে ভাবে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন—কবিরাজও সেই ভাবেই রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য হইতে মধুর ভাবের ক্রমোন্মেষ দেখাইয়াছেন। কবিকর্ণপূর অলঙ্কার কৌস্তুভে যে ভাবে রতিভাব হইতে মহাভাবের ক্রমোন্মেষ দেখাইয়াছেন—ইনিও সেই-ভাবেই ভাব-পরিণতি দেখাইয়াছেন। প্রেম যে পুরুষার্থ-শিরোমণি, নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠলীলা, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা যে কাম নয়, প্রেম, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাই যে কাম, রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে সাধকজীবনের পরম কাম্য, জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই যে ঢের বড়, কেবলা রতি যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, ভুক্তি-স্পৃহার মত মুক্তিস্পৃহাও যে বর্জ্জনীয়, ‡ —এইরূপ এই গ্রন্থে বহু তত্ত্বের বিচার আছে।

কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবন্ধ একটু শিথিল, জরাশ্লথ হস্তেরই নিদর্শন। কোন কোন স্থলে সংস্কৃত বাক্য ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারে বাংলা ভাষার রূপ দেওয়া হইয়াছে। কোথাও কোথাও ভাষা অত্যন্ত গদ্যাত্মক। মনে হয় যেন কবি সংস্কৃতে ভাবিয়া মনে মনে অনুবাদ করিয়া বাংলা লিখিয়াছেন।

এ সমস্ত ক্রটী সত্ত্বেও কবিরাজের রচনায় কবিত্বের অভাব নাই। তিনি তাঁহার বক্তব্য সহজবোধ্য করিবার জন্য যে সকল উপমার প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলি যেমন মৌলিক, তেমনি যথাযথ এবং জোরালো। দৃষ্টান্ত—

> কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
> নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।
> শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু পাই তার একবিন্দু সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
> কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।
> সেইমত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে নিজ ভাব করেন বিদিত।

‡ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময় কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে বিষামৃতে একত্র মিলন।

পূর্ব্বগামী কবিদের সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত চৈতন্যচরিত যেন প্রতিমার কাঠামো মাত্র। কবিরাজ গোস্বামী তাহাতে রূপ-রস-বর্ণ-সংযোগে অপূর্ব্ব প্রতিমা গড়িয়াছেন। রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে যেরূপ ভাব-বিশ্লেষণ করিয়াছেন—কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের লীলা-বৈচিত্র্য অবলম্বনে সেইরূপ ভাববিলাসের বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন। চৈতন্য চরিতামৃতে গোসাঞির লিখন॥

কবিরাজ বিনা যুক্তিতে কোন তত্ত্বই প্রচার করেন নাই—৭৫খানি আকরগ্রন্থ হইতে শ্লোক উৎকলন করিয়া তিনি তাঁহার প্রচারিত তত্ত্বের পোষকতা দেখাইয়াছেন।

"শাস্ত্রের প্রমাণ যার মানে চমৎকার যুক্তিমার্গে সব হারি মানে।"

চৈতন্যের অলৌকিক লীলার কথাই কবির প্রধান উপজীব্য, তবু মাঝে মাঝে কবি চৈতন্যদেবকে লৌকিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবতারণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জননীর মনে ব্যথা দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি যে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন একথা কবিরাজ গোস্বামী ছাড়া আর কেহ লেখেন নাই।

"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন।"
"তোমার সেবা ছাড়িয়া আমি করলুঁ সন্ন্যাস। বাউল হইয়া আমি কইলুঁ ধর্ম্মনাশ।
এই অপরাধ তুমি না লয়ো আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।"

এই চারি চরণে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে চমৎকার মানবিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত—

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়। শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥ ‡

চরিতামৃতের আর একটি বৈশিষ্ট্য—গ্রন্থখানি ভাবঘনরূপে রচিত হইয়াছে। "বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার" তাহাতে কবির মনে সঙ্কোচ জন্মিলে তিনি তাঁহার বহু বক্তব্যকে ঘনসংহত রূপ দিয়াছেন।

চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিলে মনে হয়—কৃষ্ণদাস আপনার মনের মাধুরী দিয়া ভক্তির আবেষ্টনীর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' এই 'বাঙ্গালীই' কবিরাজ গোস্বামী। রবীন্দ্রনাথের কথার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাই বলি—

কবি তব মনোভূমি
গৌরের জনমভূমি নদীয়ার চেয়ে সত্য জানি।

কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু লোচনদাসের মত তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের মত ভক্তির আতিশয্যে

---

‡ জগদানন্দ প্রভুকে গন্ধতৈল মাখাইতে চায়, চৈতন্যের তাহাতে আপত্তি নাই—কিন্তু লোকভয়কে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন—

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে। দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে।

মহাপ্রভুর লৌকিক ভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত। প্রতি বৎসর প্রভুকে দর্শন করিতে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ বহু দুঃখ স্বীকার করিয়া আসিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য তাহাতে এক সময় ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন—প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে। আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহু মতে।

তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে। তোমা সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিতে।
মোর লাগি স্ত্রীপুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া। নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইস ধাঞা।
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া। পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া।
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন। কি দিয়া তা সবার ঋণ করিব মোচন।

শ্রীচৈতন্য কি জানিতেন না কি ধনের আশায় তাহারা এত ক্লেশ স্বীকার করে? কষ্ট হয় জানিয়াও সঙ্গসুখের জন্য নিষেধ করেন নাই। এখানে চৈতন্যদেব লোকব্যবহারের গণ্ডীতে নামিয়া আসিয়াছেন।

অবৈষ্ণবদিগকে শাপশাপান্ত দেন নাই। বিনয়, দীনতা ও আকিঞ্চনে কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বিপরীত। কবিরাজ নিজেকে পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ বলিয়াছেন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন—

চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে। তাঁহার চরণ ধুঞি করি মুঞি পানে।

কবিরাজ নিজেকে জগাইমাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ বলিয়াছেন। একস্থলে বলিয়াছেন—

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।

চরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের মত ভক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র নয়। অগাধজ্ঞান-সঞ্জাত বিচারবুদ্ধির বন্যার দ্বারা ইহাতে ভক্তির আবেগ সর্ব্বত্র সংযত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বক্তব্যকে যথাযথ উপমা, উৎপেক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। উপমার সাহায্যে অনেক দুরূহতত্ত্বও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতকগুলি দৃষ্টান্ত—

১। অনন্তস্ফটিকে যৈছে একসূর্য্য ভাসে। তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে।

২। মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

৩। দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।

৪। ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জসার। গন্ধ বাঢ়ে তৈছে এই শ্লোকের বিস্তার।

৫। এসব সিদ্ধান্তরস আম্রের পল্লব। ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ।

৬। গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে।

৭। এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল। তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল।

৮। উডুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব অঙ্গে। সেইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে।

৯। ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে। পাছে পাতনা উড়াইয়া সংস্কার করিতে।

১০। দশ অলঙ্কারে যদি একশ্লোক হয়। এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়।

সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত। এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত।
১১। মত্ত গজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন।
১২। মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার। জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।
১৩। * * তবু রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।
১৪। সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়। তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয়।
কোটী কামধেনু পতির ছাগী যৈছে মরে। ষড়ৈশ্বর্য্য পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে।
১৫। মৃগমদ বস্ত্রে বাঁধি কভু না লুকায়। ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়।
১৬। ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি। লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি।‡

এইভাবে কবিরাজ কত শ্লোকের মলয়জ-কাষ্ঠখণ্ডকে স্নিগ্ধশীতল চন্দনানুলেপে পরিণত কবিয়াছেন।

যে গ্রন্থে মহাভাবের উন্মেষ ও বিশ্লেষণ, শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের বর্ণনা এবং গূঢ় প্রেমতত্ত্বের বিচার ও আলোচনা মুখ্য উপজীব্য, সেই গ্রন্থে কি করিয়া কতকগুলি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বিষয় স্থান পাইল—তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—পাতা জুড়িয়া নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্যের তালিকা কি করিয়া এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইল, বুঝা কঠিন। বোধহয়, ভক্তির চোখে শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গে অতি তুচ্ছতম ব্যাপারও নব মহিমায় মণ্ডিত হইত।

‡ কবি লৌকিক খাদ্য সামগ্রীর আস্বাদনের সহিত অলৌকিক রসাস্বাদেরও উপমা দিয়াছেন।
১। দধিখণ্ড ঘৃতমধু মরিচ কর্পূর। এলাচাদি মিলনে যৈছে রসালা প্রচুর॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ।
২। সহজে চৈতন্য-চরিত ঘনদুগ্ধপুর। রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাতে কর্পূর মিলন। ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন।
৩। যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ডসার। শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্মল বাড়ে স্বাদ। রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ।

কবিরাজ গোস্বামী মহাজনগণের এক একটি শ্লোককে বীজস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ফলেফুলে পল্লবে সমৃদ্ধ এক একটি কবিতা-লতিকার সৃষ্টি করিতেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি ভাবে ও রসে অপূর্ব্ব। নিম্নের একটির উদাহরণ দিই। মূল শ্লোকটি এই—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণং বিনা। ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণাম্॥
পাষাণ শুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো। বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥

এই শ্লোকটি অবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন—

বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ সে নয়ন রহে কি কারণ?
সখিহে, শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল।
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ তার জন্ম হৈল অকারণে।
মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল যেই হরে তার গর্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ সেই নাসা ভস্ত্রার সমান।
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত স্বাদু সুধাসার বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে সে রসনা ভেকজিহ্বাসম।
কৃষ্ণকর পদতল কোটিচন্দ্র সুশীতল তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার সেই বপু লৌহসম জানি।

কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য অবতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই—

মৃগমদ ও তাহার গন্ধে যেমন অবিচ্ছেদ, রাধা ও কৃষ্ণ তেমনি একই স্বরূপ,—লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য বৃন্দাবনে দুই রূপ ধরিয়াছিলেন। তারপর রূপ গোস্বামীর অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন,—আমার

মধ্যে এমন কি রস আছে যাহাতে রাধা আমার বশীভূত। "আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।" এই তৃষ্ণা-ত আমার মিটিল না। বিজাতীয় ভাবে তাহার আস্বাদনও সম্ভব নয়। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব-কান্তি গ্রহণ করিয়া পুরুষরূপেই অবতীর্ণ হইবার বাসনা পোষণ করিলেন। ক্রমে যুগাবতারের সময় উপস্থিত হইলে অদ্বৈতের হুংকৃত আহ্বানে তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য ভগবান, তবে তাঁহার ভক্তভাব কেন? গোস্বামী ভাগবতের অনুসরণে ইহার উত্তর দিয়াছেন। যে প্রেমমাধুরী ভগবান মানবাবতারে নিজে উপভোগ করিলেন—সকল মানুষকেই তাহার আস্বাদ দিতে হইবে। জীবও যদি ঐ মাধুরীর আস্বাদ লাভ না করে, তবে ভগবানের মাধুরী-সম্ভোগ অপূর্ণ থাকিবে। সেজন্য তিনি—

"** ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার।"
"স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন।
ভক্তভাব অঙ্গীকারি হইল অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্বভাবে পূর্ণ।"*

---

* এই সকল চরিত-গ্রন্থ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের লীলার ইতিহাস তাঁহার ভক্তও পার্ষদগণের জীবন চরিতের মধ্যেও পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীর চরিত-গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ ২। নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস। ৩। প্রেমদাসের বংশী শিক্ষা। ৪। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ ৫। নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস। ৬। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল ৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর (ঘনশ্যাম) ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনিবাস রচিত ও নরোত্তম-বিলাস।

এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ঈশান নাগর মহাপ্রভুর সামসময়িক। হরিচরণদাসের অদ্বৈত মঙ্গলে মহাপ্রভুর দানলীলা অভিনয়ের কথা আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা মহাপ্রভু যে উপভোগ করিতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বংশীশিক্ষায় মহাপ্রভুর জীবন কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে অনেক আজগুবি কথা থাকিলেও ইহার

নিম্নলিখিত কবিতায় কবিরাজ গোস্বামীর জীবনকথা ছন্দে বিবৃত হইয়াছে—

কবে কোন্ শুভক্ষণে রসতীর্থ বৃন্দাবনে মহাব্রতে হ'লে তুমি বৃত,
গৌরলীলা দুগ্ধসিন্ধু মথিয়া জাগালে ইন্দু বিলাইলে তাহার অমৃত।
ভবরোগে সঞ্জীবন সে যে দিব্য রসায়ন তার লাগি কোটি হস্ত পাতা,
কবিরাজ, তুমি ছাড়া—কার কাছে যাবে তারা? এ আর্ত্তজগতে তুমি ত্রাতা।
জরাতুর তেজোহীন দৃষ্টি-শ্রুতি-শক্তি ক্ষীণ, স্মৃতিভ্রংশ হ'তো ক্ষণে ক্ষণে,
পাইতে কতই ব্যথা জুটিত না যোগ্য কথা পরম্পরা পড়িত না মনে।
লিখিতে কাঁপিত কর তবু তুমি অকাতর দেব আজ্ঞা করেছ পালন।
জানি না সে শক্তি কি যে বিস্মিত তুমিই নিজে হলো কিসে অসাধ্য সাধন।

ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে। ইহাতে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক ও আচার্য্যগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম। এই গ্রন্থে রূপসনাতন, জীব গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পরিচয়ও দেওয়া আছে। গ্রন্থে বহু শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থে সংগৃহীত পদগুলিও সুনির্বাচিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রমাণের বহু গল্প আছে। একটি গল্প এই—মুরারিগুপ্ত একদিন বহু ভোজ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করেন। পরদিন চৈতন্যদেব মুরারির নিকট ঔষধ চাহিয়া বলিলেন—'অতিরিক্ত ভোজনে তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।' মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় এত গুরুভোজন হইল?" প্রভু বলিলেন—"কেন! কাল অত ভোজ্য সামগ্রী তুমিইত নিবেদন করিয়াছিলে, ভুলিয়া গেলে?" মুরারিগুপ্তকে গরুড় বানাইয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রভু মুরারির পিঠে চড়িয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া ছিলেন—গ্রন্থে এই ব্যাপারেরও বর্ণনা আছে।

অদ্বৈত প্রভুর জীবনচরিত অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। এমন কি অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীরও জীবনচরিত আছে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কোন পৃথক জীবনচরিত নাই। চৈতন্য ভাগবতেরই প্রায় অর্দ্ধাংশ নিত্যানন্দের জীবন-চরিত। নিত্যানন্দ দাস একখানি নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন—তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

পায়নিক মিল দিতে ভাবে শব্দ জুটাইতে, ছন্দ তাই পঙ্গু হ'য়ে চলে,
হিয়ার আকৃতি তব ধরিয়াছে রূপ নব, কেহ গদ্য, কেহ পদ্য বলে।
তোমার প্রাণের বাণী কোন রীতি নাহি মানি চলে তাই আলু-থালু হেন।
শুনিয়া বাঁশীর স্বর সাজিবার অবসর পায়নিক শ্রীরাধিকা যেন।
পঙ্গুপদে ধীরি ধীরি লঙ্ঘিয়া কালের গিরি আসিয়াছে তব পুণ্যবাণী,
ভারতী জরতী বেশে দেখায়, ছলিতে এসে ধরা প'ড়ে, নিজ মূর্ত্তিখানি।
ফুরায়ে আসিছে দিন শোধিতে হবে যে ঋণ বিলম্ব যে হ'লো অসহন।
অঞ্জলি ভরিয়া সবি নির্বিচারে দিলে কবি। কোথা ছন্দ যতির শাসন ?
অবশ কম্পিত হাতে দিলে যা কলার পাতে নহে তাহা ভোগের বৈভব,
দিলে যে প্রীতির সাথে সুরভিত পারিজাতে গোবিন্দের প্রসাদ দুর্লভ।
এ ধন যাদের তরে তাহারা মাথার 'পরে ধরিয়া রয়েছে কবিবর,
কত কাব্য, কত গীতি, বন্দনা গাহিছে নিতি এর ঠাঁই সবার উপর।
ব্রজে মাধুকরী করি' বিন্দু বিন্দু মধু হরি' মধুচক্র করেছ গঠন,
আনন্দে করিছে পান তোমার স্বর্গীয় দান গৌরভক্ত যত গৌড়জন।
তৃণগুচ্ছ দন্তে ধ'রে গলবস্ত্রে করযোড়ে রসক্ষেত্রে প্রবেশ তোমার,
তোমার জীবনখানি জীবন্ত চৈতন্য-বাণী দীনতার তুমি অবতার।
যা কিছু লিখেছ কবি 'শুকের পঠন' সবি বলিয়াছ তুমি আত্মহারা,
বিনয়ে বলেছ যাহা, বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা, শুকদেব কে বা তুমি ছাড়া ?
গলাইলে এ পাষাণ মূঢ় পাষণ্ডের প্রাণ তিতাইলে অশ্রুর সলিলে,
ইহা হ'তে অনুমানি ভক্তের প্রাণে না জানি কি রসপাথার বিথারিলে।
করিয়াছ শান্তিময় ছায়াদানে নিরাশ্রয় তাপদগ্ধ এ সংসার-মরু,
আমি মূল্য কিবা জানি, তোমার ও গ্রন্থখানি ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু।
তব গ্রন্থ হাতে করি বার বার শুধু স্মরি শ্রীগোপাল-মন্দিরের ছবি।
করযোড়ে আছ বসি শ্রীমাল্য পড়িল খসি,—দেবের আশিস পেলে কবি।

স্মরিতে হৃদয় টুটে স্বপ্নে যেন ভেসে উঠে আর এক চিত্র এ নয়নে,
তুমি রাধাকুণ্ড-তীরে গুরুপদ ধরি শিরে শুয়ে আছ অন্তিম শয়নে।
তোমার সর্ব্বস্ব ধন লুটিয়াছে দস্যুগণ, গৌড় হ'তে এসেছে বারতা,
এ বারতা বিষবাণ হরিল তোমার প্রাণ, পেয়ে গেলে শরশয্যা-ব্যথা।
মুখে তব অবিরাম শুধু রাধাকৃষ্ণ নাম, কণ্ঠে তব হরিনাম ঝুলি।
সর্ব্বাঙ্গে নামের মালা জুড়াল সকল জ্বালা—বৈকুণ্ঠের দ্বার গেল খুলি।
সমস্ত জীবন মথি যে সুধা লভিলে যতি, গ্রন্থ-পুটে করিলে সঞ্চিত,
তোমারি তপের গুণে সে সুধার আস্বাদনে গৌড়জন হয়নি বঞ্চিত।
জেনে তাহা গেলে না যে এ বেদনা বুকে বাজে, অশ্রুজলে হারাই আঁখর।
শুনিলে আশ্বস্ত হ'তে গ্রন্থ তব ভক্তি-পোতে তরাইল আপন তস্কর।
'ভেক-জিহ্বাসম' যাঁকে এ রসনা বৃথা ডাকে, কৃষ্ণনামে নাহি তার রুচি,
'কাণাকড়ি ছিদ্রসম' এই কর্ণযুগ মম কুবচনে সদাই অশুচি।
বৈষ্ণবের দাস নহি মায়াপাশে বদ্ধ রহি, ভক্ত নই করি না ভজন,
তবু উহা বুকে ধরি কত দিবা-বিভাবরী ভাব-ঘোরে করেছি যাপন।
তবু উহা ভালবাসি অশ্রুর পাথারে ভাসি, তার মাঝে সন্তরে অক্ষর।
কোন্ সুদূরের স্মৃতি অই অশ্রুজলে তিতি উদাসীন করে এ অন্তর।
সে স্মৃতি প্রত্যেক শ্লোকে বিঁধে এ মনের চোখে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার মত,
কমল-কোরক অঙ্গে গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দংশে যেন শত মধুব্রত।
ছিন্ন ক'রে সব ডোর তাপিত অন্তরে মোর অমৃতের তুলিকা বুলায়।
ইহার পরশে মন রচি নব বৃন্দাবন লুটে পড়ে তাহার ধূলায়।
সূত্রাকারে তব বাণী মলয়জ-কাষ্ঠখানি কঠিন বলিয়া মানি তায়,
এ পাষাণ-চিত্তে যত ঘষি তায় অবিরত সৌরভে জীবন ভরি' যায়।
জটিল বাক্যের বনে রসফল অন্বেষণে ক্লিষ্ট হয় এ মন উন্মুখ,
সে ক্লেশে না গণি কবি, চরিতার্থ হই লভি 'তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের সুখ'।

এই সকল চরিত-শাখার পুস্তক হইতে কেবল শ্রীচৈতন্যদেব নয়—তাঁহার ভক্ত ও অনুচরগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ ভক্তির ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধরণের প্রয়োজন আছে।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচরগণ ও ভক্তগণ যে মহাপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চরিতকারগণ তাঁহাদের চরিত্র-মাহাত্ম্যকে এত বেশি অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখাইলেও পারিতেন। রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ, ইত্যাদি সাধকগণ প্রভূত ধনসম্পদ ও মানগৌরব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের মহিমা সম্যক্ ভাবেই উপলব্ধ হয়। অলৌকিক শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের আরোপে মনুষ্যত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণই হইয়াছে—বৃদ্ধি পায় নাই। চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও সহযোগিগণকে দেবতার অবতার বলিয়া অথবা রুক্মিণী, সত্যভামা, ব্রজগোপী ও মঞ্জরীগণের অবতার বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ যেন কবিকল্পনার সাহায্যে অবতীর্ণ ভগবানের সভাসংসার-রচনা। তাঁহাদের আহারবিহার চালচলন সমস্তকেই অমানুষিক ও অপ্রাকৃত লীলা বলিয়া মনে করা হইয়াছে। ইহাতে মানুষের মাহাত্ম্যস্বীকার না করিয়া প্রকারান্তরে দেবতারই মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা ইঁহারা একেবারে হরণ করিয়া লইয়াছেন। ফলে, চৈতন্যদেব আর রক্তমাংসের মানুষ হইতে পান নাই। ইঁহাদের কাছে তিনি ভাববিগ্রহ। মানুষ হইয়াই তিনি যে কত বড়, দেবতাদের চেয়েও বড়, তাহা বুঝিবার জানিবার সুযোগ বা অবসর তাঁহারা দেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন—মানুষ নহেন বলিয়াই তিনি এত বড়। নিমাই যে সুপণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু পাণ্ডিত্যই তাঁহার জীবনে বড় কথা নয়, পাণ্ডিত্যের খাণ্ডিত্যই বড় কথা—জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম যে অনেক বড় এই কথাই তাঁহার জীবনের মূল সূত্র। চরিতকারগণ

তাঁহার জীবনে চরম পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। যে মহাজ্ঞান Revealed (আপ্ত), তাহার নিকট অনুশীলন বা অধ্যয়ন হইতে আহৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ। এইরূপক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের গ্রন্থগত বিদ্যাকে উপেক্ষা করিলেও চলিত। মনে হয় শ্রীচৈতন্যের ঐশী শক্তির ইহাও একটা অভিব্যক্তি—এইরূপ সংজ্ঞাপনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অথবা যে জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমমার্গ অবলম্বন করিলেন, তাহার চরম শিখরে আরোহণ না করিলে প্রেমধর্ম্মের পূর্ণ সার্থকতা হয় না,—ত্যাগের চরমোৎকর্ষও দেখানো হয় না (শ্রীচৈতন্যের ধনসম্পদ ছিল না—বিদ্যাই তাঁহার সম্বল ছিল), জ্ঞানমার্গ বর্জ্জনীয় এ কথা বলিবার অধিকার জন্মে না—এই সকল কথা ভাবিয়া চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যে চরম পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। চরিতকারগণ মুখেই শ্রীচৈতন্যের গভীর পাণ্ডিত্যের কথা বলিয়াছেন, দিগ্‌বিজয়ি-পরাভবে অথবা বাদানুবাদ-তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া মহাপ্রভুর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন নাই। অতি তুচ্ছ কথা লইয়া দিগ্‌বিজয়িপরাভবের কাহিনী রচনা করিয়াছেন এবং বৈদান্তিকদের পরাভবে বিভূতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

চরিতকারগণ ভোগাসক্ত গার্হস্থ্য জীবনের, ব্যবহার-রসের ও কুলশীল পাণ্ডিত্যের অসারতা দেখাইয়াছেন। বর্ণাশ্রম-শাসনের প্রতি ঔদাসীন্য, জাত্যভিমানের নিন্দা, নীচজাতীয় ভক্তগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, এবং ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সারল্য ও চিত্তশুদ্ধির জয়গানে তাঁহাদের রচনা পূর্ণ। চরিত-গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায়—বঙ্গদেশে অবৈষ্ণব সমাজের সহিত নবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সমাজের দারুণ দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছিল। দেশে নূতন ধর্ম্মমতের সহিত নূতন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নৈতিক বিচারের মানদণ্ডেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—চরিত্র-মর্য্যাদা ও নমস্যতা নূতন নীতিসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—অকৈতব সরল ভক্তি, ধনমান পাণ্ডিত্য কুলগৌরব ইত্যাদির উপরে স্থান পাইয়াছিল। ভক্তি যাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মই ছিল,

সেই শূদ্রগণ অথবা সর্ব্বাভিমানত্যাগী দ্বিজাতিরাই সমাজে নমস্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহাদের ধনমান, পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যই ছিল প্রধান সম্বল, তাহাদের আসন টলিয়াছিল। প্রেমভক্তির আদর্শে দেশে অভিনব আভিজাত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিবানন্দ সেনের মত গোষ্ঠীপতি ও সমাজপতি শ্রেণীর মহাপ্রাজ্ঞ সম্মানিত ব্যক্তিও নিত্যানন্দের পদাঘাত পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেন। সপ্তগ্রামের নবলক্ষপতির সন্তান রঘুনাথ পথের ধারে প্রসাদ কুড়াইয়া খাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন। রায় রামানন্দের ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ রাজমন্ত্রী শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন—আর স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণদর্শনের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। রাজার প্রতি করুণার উদ্রেকের জন্য সহচরগণকে কত সুপারিশ করিতে হইতেছে। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিজেদের কত অধম, কত অভাজনই না মনে করিয়াছেন!

নবপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের যাহারা প্রতিকূলতা করিয়াছে—শ্রীচৈতন্যকে যাহারা ভগবান বলিয়া মানে নাই, চরিতকারগণকে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এজন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণে নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও বিচারাদর্শের মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে—শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে নজির তুলিতে হইয়াছে, পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের নবধর্ম্মোপযোগী ব্যাখ্যা দিতে হইয়াছে, ভক্তগণের জয়গান করিতে হইয়াছে, কেবল চৈতন্যদেবের নয়—তাঁহার অনুচরসহচরগণের জীবনে ঐশ্বর্য্যবিভূতি আরোপ করিতে হইয়াছে। এ সমস্তের জন্য অনেক কাল্পনিকতা, অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন ও অলঙ্কৃতির আশ্রয় লইতে হইয়াছে, মাঝে মাঝে শাপশাপান্ত করিতে হইয়াছে, অলীক ভয় দেখাইতে হইয়াছে, বৈষ্ণবদ্বেষীর দুর্গতি দেখাইবার জন্য উপাখ্যান রচনা করিতে হইয়াছে। যেমন,—বৈষ্ণবদ্বেষের জন্য কুষ্ঠ হইয়াছে—ভক্ত

বৈষ্ণবের পাদোদক পানে তাহার আরোগ্য হইয়াছে। বর্ণনায় পাওয়া যায়—দস্যুরা ধন হরণ করিতে আসিয়া কাঁদিয়া পায়ে পড়িয়াছে—পাষণ্ড দুরাচারদের চৈতন্য হইয়াছে—জ্ঞানদৃপ্ত তার্কিকগণ মুগ্ধ হইয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে—যাবনিক রাজশক্তিও অলৌকিক মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে।

এ সকলের মধ্যে কোন সত্য নাই, সবই কাল্পনিক উপন্যাস, একথা আমি বলিতেছি না। যাহা সত্য তাহাকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে যে তাহাতে যেন কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। অনেকস্থলে স্তাবকতা ও ভাবকতায় সত্যও তাহার বাস্তব রূপ ত্যাগ করিয়াছে। সাধকদের জীবনের অতি অকিঞ্চিৎকর কথাকেও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। যেখানে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম, সেখানে এইরূপই হয়, প্রতিপক্ষকে পরাহত করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিঃশেষেই প্রয়োগ করিতে হয়—তূণ শূন্য করিয়াই প্রহরণ নিক্ষেপ করিতে হয়—দুর্ব্বল হইলেও সবলের অভিনয় করিতে হয়।*

* এই যে দ্বন্দ্ব—ইহা সাধারণতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব—বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভক্তিনিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বন্দ্ব।

নরোত্তমবিলাসে আছে—শাক্তরা কালীমন্দিরে গিয়া বৈষ্ণবদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা জানাইত। যখন নরোত্তমের মৃতদেহ সমাধির জন্য নীত হইতেছিল—তখন শাক্তরা পিছু পিছু হাততালি দিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছিল।

তন্ত্ররত্নাকর নামক গ্রন্থে বৈষ্ণব-দ্বেষের বেশ একটা দৃষ্টান্ত আছে। বটুকভৈরব গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ত্রিপুরাসুর এখনো বাঁচিয়া আছে—না—শঙ্কর কর্ত্তৃক হত হইয়াছে?" গণদেব বলিলেন—"না, সে মরে নাই, কলিযুগে সে তিনমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে—চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই তাহার তিন মূর্ত্তি।'

একজন চরিতকার বলিয়াছেন—

সেই নবদ্বীপে প্রভু প্রকাশ পাইল। যত ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল।

গৌরপদাবলী-সাহিত্যে ও গৌরচরিত-শাখায় শ্রীচৈতন্য যে রূপমহিমায় মণ্ডিত হইয়াছেন নিম্নলিখিত কবিতায় তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। গৌরভক্ত মহাজনগণের ভাবমুগ্ধ বাণীগুলিকেই একসূত্রে ইহাতে গুম্ফিত করা হইয়াছে।

তব—নয়নে বাদর ঝরে পুলকাঙ্কুরে ভরে হেমতনু, জাগে রসমঞ্জরীবৃন্দ।
স্বেদছলে মধুকণ ক্ষরে তায় অনুখন, চরণপঙ্কে ফুটে রাতা অরবিন্দ।

শ্রীচৈতন্য চরিত ছাড়া অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনচরিত গ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায়—শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরব রক্ষার জন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজের সাধকগণকে জীবনে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে—তাহারও তুলনা নাই। যাঁহারা বৈষ্ণব-সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন—অথচ প্রেমধর্ম্মের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—তাঁহাদিগকেও প্রতিপক্ষগণের সম্মুখে আপনাদের সম্প্রদায়ের মহিমা প্রচারের জন্য প্রকৃত মহাপুরুষদের মতই আচরণ করিতে হইয়াছে। ইহা সাধনার ফল নয়—ইহা অনুশীলনের ফল। কারণ যাহাই হউক, তাহাতে অপূর্ব্ব আত্মসংযম, চরিত্রদৃঢ়তা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা ইত্যাদি গুণের পরিস্ফূর্ত্তিই হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা স্বতন্ত্র। ঈশানদাগরের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের তুলনায় বৃন্দাবনদাসের উদ্ধত তেজস্বিতা অধিকতর স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনুশীলনের ফলে দৈন্য, বিনয় ও আত্মবিলোপের ভাব বৈষ্ণবসমাজে স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিপক্ষের দল ভক্তদের দৈন্যমণ্ডিত আচরণকে ভণ্ডামি মনে করিয়া যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা বিচলিত হইতেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাঁহারা শুধু তৃণাদপি সুনীচ ছিলেন না, তরোরিব সহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁহারা এই ঐহিক জীবনের 'অল্পে' সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার লোভে,—পরশপাথরের সন্ধানে ক্ষ্যাপার মতন জীবন যাপন করিয়াছেন। এলকেমিষ্টরা যে সাধনা করিয়াছেন পরীক্ষাগারে, ইঁহারা সেই সাধনা করিয়াছেন আধ্যাত্মিক জগতে। ইঁহারা এই লোকোত্তর চরম ধনের জন্য—'যে ধনে ধনী হইয়া সাধক—মণিরেও মণি মানে না।' সে ধনের জন্য—ঐহিক ও লৌকিক সম্পদ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য। কে চিনিবে এ সকল শ্রীচৈতন্য ভৃত্য।
কি করিবে বিদ্যাধন রূপ যাগ কুলে। অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে।

শোভি সংসারমরু জাগিলে কল্পতরু, ও-ছায়ে শরণ নিল কলিকলুষার্ত্ত।
যেই ফল বিতরিলে অনুপম এ-নিখিলে প্রেমসম নয় মিলে চারি পুরুষার্থ।
কল্পতরুর কাছে পায় বটে যেই যাচে, না যাচিতে তব দান না বিচারি যত্ন।
কল্পতরুর তলে না গেলে কি আশা ফলে? পথে পথে জনে জনে বিলাইলে রত্ন।

কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পায় যাহা। কোটি কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা।
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে। কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে।

(চৈতন্য ভাগবত)

কেবল ঐহিক সম্পদ কেন—স্বর্গ,—'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে' জন্মের সৌভাগ্য,—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা না করিয়া পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধনের জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চরিত-গ্রন্থাবলীর ভাববিলাসের আতিশয্য, স্তাবকতা ও ভাবকতার অবন্ধিত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই সত্যটি কোথাও হারাইয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী চরিত গ্রন্থাবলী হইতে ইহাও জানা যায় যে—এই আদর্শ শেষ পর্যান্ত রক্ষিত রয় নাই। ভক্তির অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির কথা ভুলিয়া শেষে মানুষেরই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—মানুষকে জোর করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তাহাকে দেবতার আসনে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তের ভক্তিই দেবতার সর্ব্বনাশ সাধন করে—দেবতা ভক্তের সেবাপরিচর্য্যায় ক্রমে ভোগবিলাসী হইয়া পড়ে। সাধে শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ীর মুখ দর্শন করিতেন না এবং জগদানন্দকে স্বাচ্ছন্দ্যভোগে প্রবর্ত্তনার জন্য তিরস্কার করিতেন। তাই দেখা যায়, যাঁহারা যৌবনে কঠোর সংযম, ক্ষান্তি, শম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিয়া নমস্য হইয়াছেন—পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারা ভক্তের সেবার আতিশয্যে, আগ্রহে ও আবদারে 'বিষয় ভুঞ্জন' করিয়া 'স্খলৎপাদ' হইয়াছেন।

ক্রমে গৌর-পারম্যবাদের প্রচার হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বদলে গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া গুরুকেই ভগবান করিয়া তুলিলেন—ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত মহান্ আদর্শ নষ্ট হইল। আবার সেই চিরন্তন গুরুবাদ ফিরিয়া আসিল, সেই মীননাথ-গোরক্ষনাথের পুনরভিনয় হইতে লাগিল।—কর্ত্তাভজা দলের সৃষ্টি হইল—সহজিয়াবাদ নূতন আকারে দেখা দিল,—বৈষ্ণবধর্ম্ম ও পদাবলীর ভোগানুকূল ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল। যে ধর্ম্ম বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহার সহিত ভোগের ও ভোগী মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার সহিত সন্ধি করিতে হইল।

বৈদান্তিক যত হলো সবে পদানত জ্ঞানসুরা-ঘট ভাঙি, পিয়ে প্রেমদুগ্ধ।
কৃষ্ণ-সারের পায় কেশরী করুণা চায় তরল-আয়ত-আঁখি-পরসাদে মুগ্ধ।
ঢল ঢল নিকষিত হেমতনু-বিগলিত লাবণি গড়ায়ে পড়ে অবনীর অঙ্গে।
চন্দন-ললাটিকা বিথারে ললাটে শিখা 'মদন মুরুছা পায় হাস্যতরঙ্গে।'
কীর্ত্তন-তাণ্ডব—বিলোল চরণে তব অভিঘাতে জাগে ভূমি-জননীর হর্ষ।
'হরি-হরি'—হুঙ্কৃতি উত্তাল সঙ্গীতি গগন বিদারি করে গোলোকেরে স্পর্শ।
রসহ্রদে ডগমগ কনক-মরাল-খগ ফুটালে পাখার বায়ে আঁখি-শতপত্র।
ফেলি বল্লবীখানি উল্লাসে বীণাপাণি নাচিল তোমার সনে ত্যজি জ্ঞানসত্র।
তব হেম ব্রজকায়ে পুলকিত নীপছায়ে রাস-রসে বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য।
প্রকটিত শ্রীআননে ঢুলু ঢুলু দ্বিনয়নে বিরহিণী শ্রীমতীর নিখিল চরিত্র।
ডুবে উৎকল রাঢ় আকুমারী একাকার ভাসাল গৌড়ব্রজ তব প্রেমসিন্ধু।
নাচিলে লহরী'পরি তা তা থৈ থৈ করি', লক্ষধা বিম্বিত—নদীয়ার ইন্দু।
খনে হাসি খল খল খনে আঁখি ছল ছল রামধনু রচে মেঘরৌদ্রের সঙ্গে।
শরৎ মুরতি ধরি আসিলে কি অবতরি? শ্যাম-গৌরব মরি ফলিত মৃদঙ্গে।
কর-নখে রবি জ্বলে পদ-নখে শশী ঝলে নিশ্বাসে বিলসিত তুলসীর গন্ধ।
মহাভাবরসভোর হ্লাদিনীমধুর চোর মাধুরী-লতার গোরা চির-রসকন্দ।
তব লাবণির ভায় হেম-মুকুরের ছায় হেরে কবি লীলাময় যুগল শ্রীমূর্ত্তি।
হুঙ্কার-তাণ্ডবে "পুরুষ" বিকাশ লভে, লীলায়িত ভঙ্গিতে "প্রকৃতি"র স্ফূর্ত্তি।
তব পদপঙ্কজে দাদুরীরো মন মজে—হেরি দুটি পাণি নাগকেশরের দণ্ড,
প্রেম-হ্রদে ঢলঢল দুটি নীল শতদল ভৃঙ্গ হইল তায় কত যে পাষণ্ড।
কৃষ্ণ-বিরহানল প্রাণ-দীপে প্রোজ্জ্বল যে অনলে বিগলিত অযুত অনঙ্গ,
কলিকল্মষ পুড়ে' ধূলি হয়ে যায় উড়ে,—ভকত-ভৃঙ্গ তায় হইল পতঙ্গ।
যে অনলে স্বেদজলে তনু-নবনীত গলে, যে অনলে অরুণিত নয়নের প্রান্ত,
কলিযুগে যে অনলে হরিনাম-যাগ জ্বলে, সে অনলে পুড়ে গেল তন্ত্র-বেদান্ত।

কেবা করে পথ-রোধ? দিগ্বিজয়ের যোধ চলে সাথে, জয়নাদ করে শতভুণ্ড।
পুরোভাগে দুলিদুলি হে বীর, চলেছ তুলি আজানুলম্বি বাহু করিবরশুণ্ড।
দেহে ধূলি বিভূষণ গলে দুলে সুশোভন নাম-সূতে গাঁথা হরিগুণমণি-মাল্য।
হৃদজলে শশিলেখা—স্বেদজলে বলিরেখা, রাজে যৌবনবনে ধ্রুব হয়ে বাল্য।
দিলে সারিশুকমুখে হরিনাম, কৌতুকে কিরাতে শুনায় সদা 'জয় রাধাকৃষ্ণ'।
পুরীপথে লতাতরু সিন্ধুর বেলামরু নাম-সুধাধারা লাগি হইল সতৃষ্ণ।
ব্রজনাট অভিনয়ে এলে নট সুসময়ে দম্ভদমন-লীলা করিলে আরম্ভ।
গঙ্গা, যমুনা হয়ে ভাবঘোরে যায় ব'য়ে তীরে তার সব তরু শিহরি কদম্ব।
ধরণী বুকের পানে তোমা ঘন ঘন টানে। সচকিতে শচীমা'র মমতার দৃষ্টি,
যেথাযেথা ধূলি'পরে তনু আছাড়িয়া পড়ে কমলশয্যা করে সেথাসেথা সৃষ্টি।
ভাবাবেশে গর-গর' কতবার পড়-পড়'. অবিরল দরদর ধারা বহে চক্ষে।
ধ্বস ধ্বস মার প্রাণ উৎসুক বেপমান মনে মনে বার বার ঠেকা দেয় বক্ষে।
তাণ্ডবঝঞ্ঝায় ঢলি পড় কায় গায়? কার গলা ধরি কাঁদ? অদ্ভুত দৃশ্য!
সংকোচে লাজে ডরে সে যে নিজে পড়ে-পড়ে সে-যে দীনচণ্ডাল হীন অস্পৃশ্য।
মূকের জড়তা হরো, শুকেরে মুখর করো, মোহমূঢ় অন্ধের আঁখি কর ফুল্ল।
পঙ্গুরে দাও বল, লঙ্ঘে সে হিমাচল, কাক-পেচকেরে করো গরুড়ের তুল্য।
বিলাইলে হাটে মাঠে বঙ্গের বাটে বাটে নাম মণিমাল্যের ডোর করি ছিন্ন।
সঙ্গে তোমারি ছায়া ধরে ভকতের কায়া, অঙ্গে তোমার মহাভাগবতচিহ্ন।
নাম ও নামীর মাঝে কোন ভেদ নাহি রাজে, চিন্ময় নাম,—নয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।
ভোগীর রসনাধামে অর্পিলে সেই নামে সেই নামব্রহ্মেরে দিলে রূপ বাহ্য।
রূঢ় জ্ঞানযোগিগণ ছিল যারা নিমগন পুঁথিতে খুঁজিতে সেই সচ্চিদানন্দে,
লীলানন্দের সাড়া পেয়ে চঞ্চল তারা, কি লিপি পাঠালে তুমি তুলসীর গন্ধে।
শ্রীরূপের অন্তরে রসময় কন্দরে প্রেমতরু-লতাবীজ করিলে যা উপ্ত।
হলো তাই ব্রজবন পুন তায় সচেতন গোকুলের কেলি-কল কুলায়-সুযুপ্ত।

যবন-জীবন জলে ভোগশৈবালদলে বিষয়পঙ্কে প্রভু ফুটালে যে পদ্ম,
রাধাপদরজে গড়া সৌরভ মধুভরা রসিক অলির তাই চিররসসদ্ম।
সনাতনে সখা জানি ধ্রুব সনাতনী বাণী বলিলে যা কলিযুগে তাই গীতামন্ত্র।
তার বেশী কোন্ ধন আছে সার সনাতন? একাধারে তাই বেদসংহিতাতন্ত্র।
ভুলাইলে ধন জন কেলি কাম কাঞ্চন, রচিলে মাধুরী দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা।
তাপসের জটা ভরি রসসঞ্চার করি, ভাসাইল 'গজপতি' তব প্রেম-গঙ্গা।
তোমার লীলার ব্রজ দিল যে পথের রজ ভবকাণ্ডারী চায় তাহারি প্রাচুর্য্য।
জ্ঞান ধ্যান হোম জপ সাধনা কঠোর তপ সব হ'তে বড় হলো সহজ মাধুর্য্য।
ধনমানজ্ঞানযশ কে তোমা করিবে বশ? তোমার চরিতরীত বেদবিধিগুহ্য।
কলা মূলা বেচে খায় শ্রীধর করুণা পায়, অবাক তাপস যোগী, সেও সাধুপূজ্য।
পেয়ে নীল জলধারা হয়ে তুমি জ্ঞানহারা ঝাঁপ দিয়াছিলে প্রভু হেরি শ্যামকান্তি।
হৃদয়-কালিমাহারি ঝরে মোর আঁখি-বারি যমুনা বলিয়া এরে হবে না কি ভ্রান্তি?
এ-অধমে তার' তার' ডুবিতে কি বল আরো, পতিতপাবন নাম হবে কি অসত্য?
কতটা পতিত হ'লে প্রভু তুমি নেবে কোলে? শ্মশানে চলিলে, মিছে ঔষধ-পথ্য।
ব্যবহার-রসে হায় দিন মোর জ'রে যায় তব নাম-রসনায় আসে না দিনান্তে।
শ্রীবাসের আঙিনার ধূলি কবে হবে সার নামামৃত-রসে কবে ডুবাবে এ ক্লান্তে?
নিঃস্ব অকিঞ্চনে চড়াইলে সযতনে ভাব-গজরাজে, প্রভু হাতে ধ'রে তুল্লে।
ছয় ঘোড়া টানে রথ নিরাপদ নহে পথ, সেই পথে প'ড়ে যেবা তারে কেন ভুল্লে?
'তোমার চরণে স্বামি শরণ নিলাম আমি' একথা বলিলে লোকে বলিলেই ভণ্ড।
তুমি অশরণ জেনে তোমা পানে লও টেনে এর বেশী কি যাচিবে পামরপাষণ্ড?

(ব্রজবেণু)

\

চণ্ডীদাস (২)

চণ্ডীদাস যে প্রেমের কথা তাঁহার কবিতায় বলিয়াছেন—তাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থদ্যোতনাও যে হয় না তাহা নহে। প্রেম গভীর হইলেই তাহা লৌকিক গণ্ডী ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যায়—রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকিলেও তাহা হইত। কবিতাগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও বিশেষ নাই—কিন্তু বৃন্দাবনলীলার চিরন্তন তত্ত্বের† আলোকপাতে ইহা আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহা ছাড়া, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনী, Romantic কবিতাগুলিকে একটা Mystic Interpretation দান করিয়াছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রেম-কবিতাগুলি লৌকিক জীবনের দিকেই আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। চণ্ডীদাসের প্রেমের গান শুনিয়া ভক্তের চিত্ত স্বতই ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু আমাদের চিত্ত আমাদেরই চারিপাশের সমাজ-সংসারের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। আমরা জিজ্ঞাসা করি—

---

† এই তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি—

"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গিহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়, প্রেমের জন্য। ব্রজের কৃষ্ণরূপ ও রাধা রূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে —সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

"এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার দীন মর্ত্তবাসী এই নর-নারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের তপ্তপ্রেমতৃষা ?"

ইহাতে চণ্ডীদাসের গানের সাহিত্যিক মূল্য বিন্দুমাত্র কমিতেছে না। কারণ, লৌকিক গণ্ডীর মধ্যে গানগুলির অবস্থান হইলেও উহাদের গভীরতম বাণী অতিলৌকিক রসলোকেই পৌঁছিতেছে। অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ্যমানতা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি না। কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থও ব্যঙ্গার্থ মাত্র। ব্যঙ্গার্থের আবিষ্কার ও রসাস্বাদন এক কথা নয়। ব্যঙ্গার্থের আবিষ্কার রসাস্বাদনে সহায়তা করে মাত্র, কোন কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেই তাহা রসোত্তীর্ণ হইল না। বাচ্যার্থের সাহায্যে কোন কবিতা যে-ভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক অর্থের সাহায্যেও তাহাকে সেই ভাবেই রসোত্তীর্ণ হইতে হইবে—নতুবা তাহা ধর্ম্মতত্ত্ব হইবে—কাব্য হইবে না। অবশ্য যে-কবিতা আধ্যাত্মিক অর্থের সাহায্যে রসোত্তীর্ণ হয়—তাহাকে আমরা অনেক সময় Mystic কবিতা বলিয়া থাকি।

চণ্ডীদাসের কবিতার Mystic মূল্য যাহাই থাকুক—লৌকিক মূল্যের জন্যই তাহা রসোত্তীর্ণ। এখানে কবিতাগুলির লৌকিক মূল্যের কথাই বলিতেছি। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি—তিনি লৌকিকতার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিয়াই চলিয়াছেন।

"আমি কুলশীল লাজ মান ভয় সমস্ত জয় করিয়া হে জীবনদেবত, তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, চারিদিকে লোকগঞ্জনায় প্রাণ-ধারণের উপায় নাই। তোমার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলাম। তবু তুমি বাম হইলে। হে প্রিয়তম, আমি তোমার চিরদাসী, তুমি বিমুখ হইবে হও, আমি চিরদিন সকল জ্বালা সহিয়া তোমাকেই ধ্যান করিব।"—চণ্ডীদাসের রাধা যদি এইভাবে আক্ষেপ করিত, তাহা হইলে মধুররসের সহিত অধমরসের মিশ্রণ ঘটিয়া যাইত এবং লৌকিকতারও অভাব হইত। বিদ্যাপতির

আদর্শ আসিয়া পড়িত। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে মহাসিন্ধু, চিন্তামণি, কল্পতরু, গিরিবর ইত্যাদির সহিত উপমিত করিয়া বলিয়াছেন,—

শাঙনমেহ যব বিন্দু না বরখব স্থরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিবর সেবি ঠাম নাহি পাওব বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন—"হে শঠ, তোমার বাঁশী আমাকে পাগল করিয়াছিল। আমি সরলা গোপবালা, সেই বাঁশী শুনিয়া আমার জীবন-যৌবন সমস্ত তোমাকে সমর্পণ করিলাম। এজন্য কুলশীল লাজভয় সমস্তে তিলাঞ্জলি দিলাম—এ-দেহ আমার কুবচনে ভাজা। এত জ্বালা যাহার জন্য সহিলাম—সে এমন খল, এমন শঠ তাহাত জানিতাম না। পিরীতির যে এত জ্বালা তাহা জানিলে কি খলের কথায় বিশ্বাস করি? এইরূপ শঠের সঙ্গে পীরিতি আর কেহ যেন না করে। তোমাকে ভুলিবার জন্য আমার চেষ্টার অবধি নাই—পাছে তোমাকে মনে পড়ে, তাই কালো কাঁচুলি ত্যাগ করিয়াছি—মেঘপানে চাহি না—যমুনার জলে যাই না। কিন্তু এমনই শেল তুমি হানিয়াছ যে মর্ম্ম হইতে তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেছি না, তুষের আগুনে দগ্ধ হইতেছি—তোমাকে যে কিছুতেই ভোলা যায় না। এখন উপায় কি? একবার ভাবি বিষ খাইয়া মরি কিংবা যমুনার জলে ঝাঁপ দিই—আবার ভাবি জীবন গেলে জ্বালা জুড়াইবে—কিন্তু বঁধুয়াকে ত' পাইব না। জীবন থাকিলে একদিন না একদিন তোমাকে পাইতে পারি।"

নানাভাব দ্বন্দ্বে দিশেহারা রাধার এই যে মুখের কথা, ইহাই মানবসংসারের নিখিল রাধার কথা। চণ্ডীদাস এই বিশ্বের সকল রাধার প্রাণের বাণীকেই সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা দান করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো যে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারানিশি সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে ॥

সমাজসংসার প্রেমের মর্য্যাদা বুঝে না—তাহারা বুঝে নিজেদের আধিপত্যও বিধিবিধান নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা। তাহারা যখন নিয়মশৃঙ্খলার বিধিবিধান রচনা করিয়াছে—তখন তাহারা অবশ্য সাধারণ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রেমকে তাহারা হয় বিলাস—নয় স্বপ্ন—নয় অলীক মোহমাত্র মনে করিয়াছে। প্রেমের অন্তস্তলের গভীর সত্যকে তাহারা স্বীকার করে নাই। তাহারা বলে—"প্রেম করিতে হয় আমাদের বিধিবিধান মানিয়া আমাদের শাসনেই প্রেম কর; তাহা যদি না কর আমরা তোমার দণ্ড দিব—আমরা তোমার বৈরী হইয়া দাঁড়াইব।"

আমাদের আদিম অবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলার হয় ত' এত বাধা-বাঁধন ছিল না। তারপর ক্রমে লোকাচার, কুলাচার, জাতিভেদ ইত্যাদি সামাজিক বিধিবিধানের জটিলতা ও কড়াকড়ি বাড়াইয়া দিয়াছে। সামাজিক সংস্কার ও প্রেমের এই দ্বন্দ্ব সকল দেশের সম্বন্ধেই খাটে। প্রেমের আকর্ষণ দেশকালাতীত সার্ব্বজনীন মানবধর্ম্মের উপর নির্ভর করে—প্রেম কোন দেশবিশেষের সমাজ বা সংসারের নিয়মশৃঙ্খলার শাসন মানিয়া চলে না।

সামজিক বিধিবিধানের জটিলতাই **জটিলা**, তাহার প্রকৃতি-বিরোধী ব্যবস্থার ভ্রূকুটি-কুটিলতাই **কুটিলা** এবং প্রেমই **রাধা**।

\ প্রেম যেখানে অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত দুর্নিবার, সেখানে সে সমাজ-সংসারের শাসন মানিয়া চলিতে পারে না। সকল বাঁধন কাটিয়া সে সিন্ধুর উদ্দেশে শৈবলিনীর মত ছুটিয়া যায়, তখন সমাজ-সংসারের সকল অস্ত্র উদ্যত হইয়া উঠে—সহস্র রসনা ফণা তুলিয়া বিষোদ্গিরণ করিতে থাকে। প্রেমিকার জীবনে তখন দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—এ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা দুর্ব্বিষহ। প্রেমের

ইহাই দারুণ দণ্ড। এইখানেই শেষ নয়—ইহার উপর যাহার জন্য এত জ্বালা সে যদি উপেক্ষা করে, অথবা ভুলিয়া থাকে—তাহা হইলে প্রেমিকার আক্ষেপের অবধি থাকে না। জগতে এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে। ইহা প্রেমপাশ জড়িত অবলাজীবনের নিদারুণ Tragedy. এই সংসারে ঐ হতভাগিনীর মত অসহায় নিরাশ্রয় যেন কেহই নাই। এই অবলা-জীবনের গূঢ় গভীর বেদনার বাণী আমরা চণ্ডীদাসের কবিতায় পাই। শ্রীমতীর অন্তরে জগতের নিখিল উপেক্ষিতা প্রেমিকা এককণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। ইহাই চণ্ডীদাসের কবিতার লৌকিক রূপ।

অভিমানিনী শ্রীমতী কখনও প্রেমাস্পদকে তিরস্কার করিতেছেন, কখনও তাঁহার উদ্দেশে কাকুতি মিনতি করিতেছেন, কখনও সমাজ-সংসারকে গালি দিতেছেন,--কখনও প্রেমেরই নিন্দা করিতেছেন, কখনও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন—কখনও নিজের অশরণতার কথা বলিতেছেন এবং কখনও বা মৃত্যু কামনা করিতেছেন। এই আক্ষেপের জন্য আধ্যাত্মিক অর্থের প্রয়োজন নাই—শ্রীমতীকে স্বয়ং লক্ষ্মী বানাইবারও প্রয়োজন নাই--কোন তত্ত্বের সাহায্য লইয়া এই আক্ষেপের ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। জগতের সকল প্রেমিকার প্রাণের বাণী যাহা, তাহাই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সার্ব্বজনীন মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীদাস যে ভাষায় শ্রীরাধার আক্ষেপাভিমান ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন পূরা বাঙ্গালীর ঘরাও ভাব আছে—তেমনি অন্যদিকে সার্ব্বজনীন আবেদন (universal appeal) আছে—একদিকে যেমন মনে হয় এই রাধা আমাদেরই গ্রামের এমন কি আমাদের পাড়ারই রাধা—অন্য দিকে তেমনি মনে হয় এ যেন যুগযুগান্তরের দেশদেশান্তরের রাধা।

চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখানি কল্পিত, কিন্তু রাধাটি একেবারে বাস্তব। স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে সত্যের এমন প্রতিষ্ঠা জগতের অল্প সাহিত্যেই আছে।

যে রাধা বলিয়াছেন প্রেমের জন্য 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' তাঁহার জীবনে ঘর ও বাহির (Home and the world) দুইই পাইতেছি—বাঙ্গালার নিজস্ব পল্লীজীবনই ঘর, বিশ্বজনীনতাই বাহির।

রাধা বলিতেছেন—

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর। যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।
ছার দেশে বসতি নাই দোসর জনা। মরমের মরমী নইলে না জানে বেদনা।

প্রেমের স্পর্শ সকলের ভাগ্যে ঘটে না—কচিৎ কেহ প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। যে অনুভব করে, তাহার যে কি জ্বালা, তাহা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে? সেজন্য চিরকাল অপরে প্রেমিক-প্রেমিকাকে পাগল, নির্ব্বোধ, ভ্রান্ত, বিদ্রোহী—এমন কি পাপপথচারী মনে করে। সেজন্য তাহাদের প্রতি কাহারও দরদ বা সহানুভূতি থাকে না। প্রেম চিরকালই নিরাশ্রয়—অসহায়। প্রেমিকা চিরদিনই 'সোতের সেঁওলি'।

দুঃখের উপর দুঃখ, দরদী মনে করিয়া কাহারও কাছে প্রাণের কথা বলিলে সে যে কৃত্রিম হৃদয়হীন অলীক প্রবোধ দেয়, তাহাতে ব্যথা আরও দ্বিগুণিত হয়, আবার কেহ কেহ বা ধর্ম্মোপদেশ দেয়।

"মরম না জানে ধরম বাথানে সে আরও দ্বিগুণ ব্যথা।"

মনের কথাটি কাহাকেও বলিয়া যে হৃদয়ের ভার লঘু করা যাইবে, প্রেমিকার সে উপায়ও নাই।

"এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী।")

রাধা বলিয়াছেন—

১। কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি। এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে। নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে॥
আর না করিব পাপ পীরিতির লেহা। পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা॥

২। কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে জন পীরিতি করে।
তুষের আগুন যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।
আপনা আপনি দিবস রজনী ভাবিয়ে কত যে দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই না দেখাই পাপ-মুখ।
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে এমতি সঙ্কট তারে।

এই সকল পংক্তি হইতে বুঝা যায় চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা আগে বাঙ্গালার রাধা, তারপর বিশ্বের রাধা। চণ্ডীদাসের কবিতায় যতই অলৌকিক ইঙ্গিত থাকুক, তিনি তাঁহার রাধিকাকে লৌকিক জীবনের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যান নাই। সেই জন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাসের রাধা আমাদের এত অন্তরঙ্গ।

কবি-কৌশলের জন্য চণ্ডীদাস বড় কবি নহেন। চণ্ডীদাস যে পীরিতির গান গাহিয়াছেন, সে পীরিতি রসজীবনের চরম সৃষ্টি। এ পীরিতি লৌকিক জগতে দুর্লভ। ইহার কাছে জীবন-যৌবন, ধন-জনমান সব তুচ্ছ। এই পীরিতির সর্ব্বস্বলুপ্তিভাব আমাদের চিত্তকে লৌকিক জীবনেই পরিচ্ছিন্ন রাখে না। ইহা অলৌকিক—ইহা আমাদের চিত্তকে অতীন্দ্রিয় লোকে লইয়া যায়; আমাদের জীবাত্মার অন্তরে যে চিরন্তন ব্যাকুলতা—অজানা অনন্তের জন্য যে শাশ্বত আগ্রহাকাঙ্ক্ষা সুপ্ত আছে, তাহাই জাগাইয়া তুলে। তাহাতে অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা, অস্বাতন্ত্র্য ও পরবশতার বেদনা জাগিয়া উঠে, তাহা বিচ্ছেদের বেদনারই মত। আমাদের চিত্তও রাধিকার মত চিরন্তনের উদ্দেশে ছুটিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ইহা সেই বিরহের গান, 'সেই মোহমন্ত্রগান, যাহা কবির গভীর প্রাণে চিরবিরহের ভাবনা' জাগাইয়া তুলে। চণ্ডীদাসের গানের ইহা Mystic না হউক, Transcendental interpretation। রবীন্দ্রনাথ এই অজানা অনন্তের তৃষ্ণাকে বলিয়াছেন—মানবাত্মার 'চিরবিরহিণী নারী"।

"কহিলাম তারে 'তুমি চাও কারে ওগো বিরহিণী নারি ?'
সে কহিল 'আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

শ্রীরাধার প্রেমাবেশ-বর্ণনায় চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের ভগবত্তা ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনার অন্তরের মধ্যে যে চিরবিরহিণী রাধা বিরাজ করিতেছে—তাহার আকৃতি আকুলতাকেই তাঁহার রচনায় রসরূপ দান করিয়াছেন। রাধিকার আর্ত্তি আকুলতার গহনতায় আমরাও ভাগবত বা পুরাণের কথা ভুলিয়া যাই—রাধা যে ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি তাহাও আমাদের মনে থাকে না। রাধা আমাদের কাছে চিরন্তনী নারী, জীবাত্মাও নয়—ভক্তও নয়। আমাদের অন্তরের 'চির বিরহিণী নারীই' ঐ রাধার সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। ইহার সহিত ব্রহ্মস্বাদের কোন সম্বন্ধ নাই,ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রসের সহিতই ইহার সম্পর্ক।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় যদি সাধারণ নরনারীর প্রণয়রূপেই পরিকল্পিত হইত, তাহা হইলেও রসের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হইত না। পরমাত্মার উদ্দেশে জীবাত্মারই হউক, আর চিরন্তনের উদ্দেশে অনিত্যেরই হউক, আর মানবের উদ্দেশে মানবীরই হউক, প্রেম সেই একই অনির্ব্বচনীয় বস্তু। সর্ব্বস্বপণ আত্মহারা এই যে প্রেমের আকৃতি, ইহা আমাদের চিত্তকে আখ্যানবস্তুর সকল গণ্ডী এবং দেশকালের সীমা পার করিয়া কোথায় লইয়া যায়—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। সে কি কোন স্বপ্নলোক ? সে কি কোন অনাবিষ্কৃত ভাবলোক ? সে কি মহামানবতার হৃদয়-লোক ? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। যাহারা এই গভীর প্রেমের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মস্বাদ লাভ করেন, তাঁহারা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই, আমরা যে স্বাদ পাই তাহারও তুলনা কোন লৌকিক স্বাদের সহিত সম্ভবে না, ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

স্পষ্ট কথা, সত্য কথা, সহজ কথা, অনাবিল সরল কথা, অন্তরের অন্তস্তল হইতে অবলীলাক্রমে উদ্গীর্ণ কথা কেমন করিয়া বিনা আড়ম্বরে,

পঞ্চমাত্রার ছন্দ *—পূর্ব্বালোচিত ছন্দগুলিতে যে ভাবে মাত্রা-বিচার হইয়াছে, সেই ভাবের ৫ মাত্রায় ৪টি পর্ব্ব এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ।

৫+৫+৫+৫—হরিচরণ। শরণ জয়। দেব কবি-। ভারতী।

বসতু হৃদি। যুবতিরিব। কোমল ক-। লাবতী (জয়দেব)

ইহার স্তবকিত রূপ—জয়দেবের—৫+৫+৫+৫—৫+৫+৪

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি। দন্তরুচি-। কৌমুদী॥ হরতি দর। তিমির মতি। ঘোরম্

স্ফুরদধর। সীধবে। তব বদন-। চন্দ্রমা। রোচয়তি। লোচন-চ-। কোরম্॥

বৈষ্ণবকবিগণ এই স্তবকিত রূপেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এ ছন্দের প্রধান কবি শশিশেখর। বৈচিত্র্যের জন্য ৫+৪+৫+৪—৫+৫+৪ মাত্রাতেও স্তবক গঠিত হইয়াছে, অন্তরায় স্থলে স্থলে মিলও দেওয়া হইয়াছে।

১। গ্রাম্যকুল। বালিকা। সহজে পশু-। পালিকা। হাম কিয়ে। শ্যাম উপ-। ভোগ্যা।

রাজকুল-। সম্ভবা। সরসিরুহ-। গৌরবা। যোগ্যজনে। মিলয়ে জনু। যোগ্যা॥

২। প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি মরিলে হাম করবি ইহ কাজে।

নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি রাখবি দেহ এই বরজ মাঝে॥

৩। কান্ত সঞে কলহ করি কঠিন। কুল কামিনী বৈঠি রহু আসি নিজ ধামে।

তবহি পিক পাপিয়া শুক সারী উড়ি আওত বদন ভরি রটত শ্যাম নামে॥

* প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ৫ মাত্রার স্তবকিত ছন্দকে ঝুল্লনা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই ছন্দের ২য় ও ৪র্থ চরণে দুইটি করিয়া পর্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঝুল্লনা—

সহস মঅ। মত্ত গঅ। লাখ লখ। পক্খরিঅ॥ সাহি দহ। সাজি খে। লন্ত গিং। দু॥

কোপ্পি পিঅ। জাহিতহি। থাপ্পি জসু। বিমল মহি। জিণই ণহি। কোই তুঅ। তুলক হিং। দু॥

শিখা—ছন্দও পাঁচ মাত্রায় গঠিত—ইহার সহিত বৈষ্ণবকবিদের ছন্দের মিল আরও ঘনিষ্ঠ।

ফুলিঅ মহু। ভমর বহু। রঅণি পহু। কিরণ লহু। অব অরু ব-। সন্ত।

মলয় গিরি। কুসুম ধরি। পবন বহু। সহব কহু। সুমুহি সখি। ণিঅল ণ হি। কন্ত।

ভানুসিংহ প্রত্যেক ২য় পর্বে একটি করিয়া মাত্রা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেমন—

"কহিলাম তারে 'তুমি চাও কারে ওগো বিরহিণী নারি ?'
সে কহিল 'আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

শ্রীরাধার প্রেমাবেশ-বর্ণনায় চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের ভগবত্তা ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনার অন্তরের মধ্যে যে চিরবিরহিণী রাধা বিরাজ করিতেছে—তাহার আকৃতি আকুলতাকেই তাঁহার রচনায় রসরূপ দান করিয়াছেন। রাধিকার আর্ত্তি আকুলতার গহনতায় আমরাও ভাগবত বা পুরাণের কথা ভুলিয়া যাই—রাধা যে ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি তাহাও আমাদের মনে থাকে না। রাধা আমাদের কাছে চিরন্তনী নারী, জীবাত্মাও নয়—ভক্তও নয়। আমাদের অন্তরের 'চির বিরহিণী নারীই' ঐ রাধার সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। ইহার সহিত ব্রহ্মস্বাদের কোন সম্বন্ধ নাই,ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রসের সহিতই ইহার সম্পর্ক।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় যদি সাধারণ নরনারীর প্রণয়রূপেই পরিকল্পিত হইত, তাহা হইলেও রসের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হইত না। পরমাত্মার উদ্দেশে জীবাত্মারই হউক, আর চিরন্তনের উদ্দেশে অনিত্যেরই হউক, আর মানবের উদ্দেশে মানবীরই হউক, প্রেম সেই একই অনির্ব্বচনীয় বস্তু। সর্ব্বস্বপণ আত্মহারা এই যে প্রেমের আকৃতি, ইহা আমাদের চিত্তকে আখ্যানবস্তুর সকল গণ্ডী এবং দেশকালের সীমা পার করিয়া কোথায় লইয়া যায়—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। সে কি কোন স্বপ্নলোক ? সে কি কোন অনাবিষ্কৃত ভাবলোক ? সে কি মহামানবতার হৃদয়-লোক ? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। যাহারা এই গভীর প্রেমের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মস্বাদ লাভ করেন, তাঁহারা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই, আমরা যে স্বাদ পাই তাহারও তুলনা কোন লৌকিক স্বাদের সহিত সম্ভবে না, ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

স্পষ্ট কথা, সত্য কথা, সহজ কথা, অনাবিল সরল কথা, অন্তরের অন্তস্তল হইতে অবলীলাক্রমে উদ্গীর্ণ কথা কেমন করিয়া বিনা আড়ম্বরে,

পঞ্চমাত্রার ছন্দ *—পূর্ব্বালোচিত ছন্দগুলিতে যে ভাবে মাত্রা-বিচার হইয়াছে, সেই ভাবের ৫ মাত্রায় ৪টি পর্ব্ব এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ।

৫+৫+৫+৫—হরিচরণ। শরণ জয়। দেব কবি-। ভারতী।
বসতু হৃদি। যুবতিরিব। কোমল ক-। লাবতী (জয়দেব)

ইহার স্তবকিত রূপ—জয়দেবের—৫+৫+৫+৫—৫+৫+৪
বদসি যদি। কিঞ্চিদপি। দন্তরুচি-। কৌমুদী ॥ হরতি দর। তিমির মতি। ঘোরম্
স্ফুরদধর। সীধবে। তব বদন-। চন্দ্রমা। রোচয়তি। লোচন-চ-। কোরম্ ॥

বৈষ্ণবকবিগণ এই স্তবকিত রূপেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এ ছন্দের প্রধান কবি শশিশেখর। বৈচিত্র্যের জন্য ৫+৪+৫+৪—৫+৫+৪ মাত্রাতেও স্তবক গঠিত হইয়াছে, অন্তরায় স্থলে স্থলে মিলও দেওয়া হইয়াছে।

১। গ্রাম্যকুল। বালিকা। সহজে পশু-। পালিকা। হাম কিয়ে। শ্যাম উপ-। ভোগ্যা।
রাজকুল-। সম্ভবা। সরসিরুহ-। গৌরবা। যোগ্যজনে। মিলয়ে জনু। যোগ্যা ॥

২। প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি মরিলে হাম করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি রাখবি দেহ এই বরজ মাঝে ॥

৩। কান্ত সঞে কলহ করি কঠিন। কুল কামিনী বৈঠি রহু আসি নিজ ধামে।
তবহি পিক পাপিয়া শুক সারী উড়ি আওত বদন ভরি রটত শ্যাম নামে ॥

---

* প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ৫ মাত্রার স্তবকিত ছন্দকে ঝুল্লনা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই ছন্দের ২য় ও ৪র্থ চরণে দুইটি করিয়া পর্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঝুল্লনা—

সহস মঅ। মত্ত গঅ। লাখ লখ। পক্খরিঅ ॥ সাহি দহ। সাজি খে। লন্ত গিং। দু ॥
কোপ্পি পিঅ। জাহিতহি। থাপ্পি জসু। বিমল মহি। জিণই ণহি। কোই তুঅ। তুলক হিং। দু ॥

শিখা—ছন্দও পাঁচ মাত্রায় গঠিত—ইহার সহিত বৈষ্ণবকবিদের ছন্দের মিল আরও ঘনিষ্ঠ।

ফুলিঅ মহু। ভমর বহু। রঅণি পহু। কিরণ লহু। অব অরু ব-। সন্ত।
মলয় গিরি। কুসুম ধরি। পবন বহু। সহব কহ। সুনুহি সখি। ণিঅল ণ হি। কন্ত।

ভানুসিংহ প্রত্যেক ২য় পর্বে একটি করিয়া মাত্রা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেমন—

সাতমাত্রার ছন্দ ‡—একই রূপ মাত্রাবিচারে সাত মাত্রায় গঠিত তিন পর্ব্ব এবং ৩, ৪ বা ৫ মাত্রায় গঠিত শেষ পর্ব্বের দ্বারা এই ছন্দ রচিত। পর্ব্বের ৭ মাত্রাকে ৩+৪ মাত্রায় উপবিভাগ করা চলে। জয়দেবের—৭+৭+৭+৩

কিং করিষ্যতি। কিং বদিষ্যতি। সা চিরং বির। হেণ।
কিং জনেন ধ-। নেন কিং মম। জীবিতেন গৃ-। হেণ॥

৭+৭+৭+৪—শ্রীসনাতন। চিত্তমানস। কেলিনীপ ম-। রালে।
মাদৃশাং রতি। রত্র তিষ্ঠতু। সর্ব্বদা তব। বালে॥

নব—মঞ্জু মঞ্জুল। পুঞ্জরঞ্জিত। চূত-কানন। শোহই।
রসা—লাপ কোকিল। কোকিলাকুল। কাকলী মন। মোহই॥

৭+৭+৭+৩—নবীন নীরদ। নীল নীরজ। নীলমণি জিনি। অঙ্গ।
যুবতিচেতন। চোর চূড়হি। মোর পিঞ্ছ বি। ভঙ্গ॥

আজু সখি মুহু মুহু। গাহে পিক কুহু কুহু। কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু। দোঁহার পানে চায়।
যুবনপদ বিলসিত। পুলকে হিয়া উলসিত। অবশ তনু অলসিত। মুরছি জনু যায়।

রবীন্দ্রনাথ (১) পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী (২) একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে, মরিমরি অনঙ্গ দেবতা (৩) শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে (৪) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে (৫) মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে ইত্যাদি কবিতায় এই পাঁচ মাত্রার ছন্দকে নানা বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

‡ প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দ (১ চর্চরী (২) মনোহংস (৩) গীতা (৪) হরিগীতা।

চর্চরী—পাঅ নেউর। ঝংঝণক্কই। হংস সদ্দ সু। মোহনা।
থূর থোর থ-। ণগংগ ণচ্চই। মোত্তিদাম ম-। নোহরা॥

গীতা——জহ—ফুল্ল কেঅই। চারু চম্পঅ। চূতমঞ্জরি। বঞ্জুলা।
সব—দীস দীসই। কেসু কাণণ। পাণ বাউল। ভম্মরা।

কেবল দুই মাত্রা অতিপর্ব্ব ছাড়া দুই ছন্দে কোন ভেদ নাই।

হরিগীতা——গঅ—গহহি ঢুক্কিঅ। তরণি লুক্কিঅ। তুবর তুর অহি। যুজ ঝিরা
রহ—রহসি মীলিঅ। ধরণি পীলিঅ। অপ্প পর ণহি। বুঝিরা।

বিনা কলাশ্রীমণ্ডনে, বিনা আলঙ্কারিক চাতুর্য্যে কাব্য হইয়া উঠিতে পারে, চণ্ডীদাস তাহা দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের রচনা সম্পূর্ণ মনোবেগ-সঞ্জাত, ইহার রচনাক্রম সম্পূর্ণ আবেগাত্মক বা Emotional. ইহাতে যুক্তিমূলক ক্রম (Logical Sequence) সন্ধান করা বৃথা। *

প্রাণের গভীর সত্যের বাণী যেখানে রসরূপ ধরিয়াছে, সেখানে অলঙ্কারশাস্ত্র হতদর্প, স্তম্ভিত। গভীর প্রেমের ভাষাই স্বতন্ত্র। এ ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য জানিত না। এ ভাষার প্রবর্ত্তক চণ্ডীদাস। অনেকে বলেন, শ্রীচৈতন্য এ ভাষা বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। তাই অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যের পর চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়াছেন।

ব্রজলীলা-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু যে বাঙ্গালীহৃদয়-মন্থনে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই বাঙ্গালীহৃদয়ে

---

* অনেক পদে আমাদের যুক্তিসন্ধিৎসু মন ঐ ক্রম সন্ধান করিতে চায়, না পাইয়া একটু ক্ষুণ্ণ হয়—মনে হয় যে কথার পর যে কথার আসিবার সম্ভাবনা তাহা যেন আসিল না।

মনে রাখিতে হইবে, মনোবেগের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি তাহার নিজস্ব পরম্পরা বা ক্রম অনুসরণ করে। সেই আদর্শে চণ্ডীদাসের পদের বিচার করিতে হইবে। একই পদে পীরিতির নিন্দা, আত্মধিক্কার, পীরিতির গুণগান, রূপমুগ্ধতা সবই পাওয়া যাইবে। অনেক পদই একই ধরণের। তাহাদের মধ্য হইতে পংক্তি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া প্রত্যেক ভাব বা বিষয়কে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুসমঞ্জস পদ রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বোধানন্দের দিক হইতে লাভ হইতে পারে, রসানন্দের দিক হইতে লাভ নাই। প্রত্যেক পদ একই মনের অভিব্যক্তি। যে প্রেমার্ত্ত মনের উহারা উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি, সেই মনে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভাব ও অনুভূতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশিয়া আছে—ঐ বিচিত্র মন আমাদের মত সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ মন নয়। প্রেমাবেগে স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যহীন রসোচ্ছল মন। সেই মনের অভিব্যক্তি যাহা হওয়া স্বাভাবিক কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।

অর্থাৎ পদগুলির বিচার করিতে হইবে রাধার মনের দিক হইতে, আমাদের নিজের মনের দিক হইতে নয়।

এই ভাষামৃত নিশ্চয়ই সঞ্চিত ছিল। কবি বাঙ্গালী প্রাণের সেই অন্তঃসুপ্ত ভাষাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন, অণ্ডসুপ্ত কাকলী যেমন বিহগের সঙ্গীতে পরিণত হয়। যুগে যুগে বাঙ্গালীর প্রেমিকহৃদয় যে ভাষায় অন্তরের গভীরতম আকুতি প্রকাশ করিয়াছে, ইহা সেই ভাষা।

এক একবার তাই মনে হয়, এই পদাবলী যেন চণ্ডীদাসের সৃষ্টি নয়, চণ্ডীদাসের আবিষ্কার। যুগযুগ হইতে বাঙ্গালীর অন্তরেই যেন এই কথাগুলি প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, উপযুক্ত কবির অভাবে সেগুলি মূর্চ্ছনা লাভ করে নাই। চণ্ডীদাসই সেই কবি, যিনি ঐগুলিকে ছন্দে সুরে বাণীরূপদান করিয়াছেন।

রাধাশ্যামের পীরিতি বাঙ্গালীর বড় আদরের, বড় আকুতির, বড় বেদনার ধন। এই শ্যাম মানুষও নয়, দেবতাও নয়। বাঙ্গালীহৃদয়ের সমস্ত সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য, স্নেহমমতা, প্রীতি ও সরলতা যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া উপচিত হইয়া শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়াছে। আর তাহার আর্ত্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা ও জীবাত্মার অন্তর্নিহিত অতিলৌকিক পিপাসা সমস্ত একত্র মিলিয়া রাধারূপ ধরিয়াছে। সেই রাধাশ্যামের প্রেমলীলার কথা গাহিয়াছেন রসের গুরু, বাঙ্গালীর রসজীবনের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ কবি চণ্ডীদাস। তাই এই লীলা-কথাকে রসোত্তীর্ণ করিতে চণ্ডীদাসকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। সেই জন্যই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার আপামর সাধারণ সকলেই উপভোগ করিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রচনায় বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্য, কলা-চাতুর্য্য বা মণ্ডনাড়ম্বর নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা বুঝিতে হইলে মস্তিষ্কের আয়াসের প্রয়োজন হয় না। অবিমিশ্র মনোবেগের অভিব্যক্তি সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে—ইহার জন্য কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি, শিল্পজ্ঞান অনেকেই পায় নাই বটে, প্রাণের আবেগ হইতে-ত বিধাতা কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

যুগধর্ম্মের বৈতালিক বা বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কবিদের একটা লৌকিক

পরমায়ু আছে। এই সকল কবিদের কাব্যে যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবন উপাদান উপকরণ যোগায় বা প্রতিবিম্বিত হয়—সে জীবনেরও জরা মৃত্যু আছে। সে জীবনের রূপান্তর বা অবসান ঘটিলেই, দেশের লোকের জীবনধারা, রুচি, আদর্শ ও ভাবধারার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই এই শ্রেণীর কবিদের কাব্য আর জাতির সাধারণ সম্পদ হইয়া থাকে না। উহা তখন বিদ্বৎসমাজের অধ্যয়ন, আলোচনা ও গবেষণার বস্তু কিংবা সারস্বত ভবনের প্রত্ন-সম্পদ হইয়া পড়ে।

চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর কবি নহেন। চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জীবনের বাঙ্গালীর অন্তরাত্মার, বাঙ্গালীত্বের সেই রসসম্পদকে কাব্যের উপাদান করিয়াছেন, যাহা চিরন্তন, শাশ্বত, কখনও যাহার রূপান্তর বা লুপ্তির সম্ভাবনা নাই। সকল মহাকবিই তাই বাহ্য জগৎকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া অন্তরের চিরন্তন সম্পদ্ লইয়াই কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীদাস আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গূঢ়তম রসসম্পদকে কাব্যের উপাদান করিয়াছেন বলিয়াই ইহা—আপামর সাধারণের উপভোগ্য। মানবমাত্রেই ইহার রসসম্ভোগে অধিকারী।

চণ্ডীদাসের সঙ্গীত তাই বঙ্গের নাটমন্দিরে, আম্রকুঞ্জে, বেণুবনে, ইক্ষুক্ষেত্রে, খেয়াতরীর উপরে একদিনের জন্যও থামে নাই। যদি বা কালধর্ম্মে কখনও স্তিমিত হইত, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য তাহা হইতে পায় নাই। এই চণ্ডীদাস যদি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তবে চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অগ্রদূত—প্রেমসূর্য্যের শুকতারা। চণ্ডীদাস যে রসসম্পদের কবি, শ্রীচৈতন্য তাহারই পরিবেষক, চণ্ডীদাস যে বাণীর গায়ন, চৈতন্যদেব তাহারই প্রচারক। চণ্ডীদাসের সঙ্গীতে যে স্বপ্ন মূর্চ্ছিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গীতে তাহা সত্যরূপে মূর্ত্ত হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস বাঙ্গালীকে অন্তরাত্মার ভাষা দিয়া গিয়াছেন, তারপর কত কবিই

জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সে ভাষার ঐশ্বর্য্য অনেক বাড়াইয়াছেন। মানব-জীবনের কত বৈচিত্র্য আজ সে ভাষায় অভিব্যক্ত হইতেছে, সে ভাষা আজ আমাদের কত সহজ ও পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, চণ্ডীদাসই এই ভাষার বাল্মীকি। আজ আমাদের গৃহের দুয়ারে সুরধুনী কূলে কূলে ভরা, কিন্তু গঙ্গাধরের জটাজালকে আমরা কি করিয়া ভুলিব? আজ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত সহস্র সহস্র পুস্তক আমাদের সহজে অধিগম্য, কিন্তু ক্রৌঞ্চবধূর বেদনায় গদ্‌গদ্ ঋষিকণ্ঠে উদীরিত সেই প্রথম শ্লোকটিকে কি করিয়া ভুলিব? *

চণ্ডীদাস কয় জন তাহা লইয়া বাদানুবাদের অন্ত নাই। এই কবিতায় তাহার উত্তর দিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি—

কোথা কবে জন্ম নিলে পণ্ডিতেরা করিছে বিবাদ
তাই নিয়ে। তব রস-কমলের মাধুরী আস্বাদ

---

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজভাবের কবি। এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। বিদ্যাপতি সুখের কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন। চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন; বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার প্রেম "কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা"। তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও বিষামৃতে একত্র করিয়া। চণ্ডীদাসের কথা এই যে প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যাহা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিঙড়াইয়া বাহির করিতে হয়। বিদ্যাপতির অনেকস্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবে মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। কঠোর ব্রতসাধনরূপে প্রেম-সাধন করা চণ্ডীদাসের ভাব। তিনি প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িণীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়।"

দ্বন্দ্বকোলাহলে আজ, দাদুরীর কলরবে হায়
কমল-মাধুরীসম সরোবরে, কোথায় হারায়।
এ পৃথ্বী বিপুলা বটে, তাই বলি অন্নজল দিয়া
রক্তমাংসময় তব একখানি শরীর গড়িয়া
তোমারে করিবে বন্দী হেন শক্তি আছে কি তাহার?
কাল নিরবধি বটে, তাই বলি জীবন তোমার
পরিচ্ছিন্ন পরিমিত করিবে সে বর্ষের গণ্ডীতে,
হেন স্পর্দ্ধা নাহি তার। যত দ্বন্দ্ব করুক পণ্ডিতে।
সর্ব্বদেশময় তুমি হে বিরাট সর্ব্বযুগময়।
জুড়িয়া রয়েছ তুমি চিরদিন সকল হৃদয়।

তবু তুমি জন্ম নিলে বাঙ্গালীর মনোবৃন্দাবনে।
বিরহিণী শ্রীমতীর গূঢ়মর্ম্ম-কুটীর অঙ্গনে
স্বপ্নময় বেদনায়। স্থূলদেহ করনি ধারণ।
গীতিময় দেহ ধরি বিশ্বময় আত্মবিকিরণ
করেছিলে একদিন। রসজ্ঞের স্বপ্নে তুমি আজো
যেমন সেদিন ছিলে গীতদেহে তেমনি বিরাজো।
কোথায় পরম সত্য সন্ধানিব রূপে কিংবা ভাবে?
নিজেই অসত্য হয়ে দেশকাল কি সত্য জানাবে?
ভাবে আছ, রসে আছ। মধুগন্ধে তৃপ্ত যেইজন
পদ্মের মৃণাল কোথা কভু কি সে করে অন্বেষণ?

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান ছন্দ **পজ্ঝটিকা**।* প্রধানতঃ এই ছন্দে প্রাকৃত

---

* প্রাকৃতপিঙ্গলে পজ্ঝটিকার বিবিধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ব্ব দীর্ঘস্বর দিয়া আরব্ধ হইলে পজ্ঝটিকাকে বলা হইয়াছে—দোধক

পিংগ জ-। টা বলি। ঠাৱিঅ। গঙ্গা॥ ধারিঅ। গাঅরি। জেণ অ। ধংগা॥

চন্দ-ক-। লা জসু। সীসহি। ণোক্‌খা॥ সো তুহ। সংকর। দিজ্জউ। মোক্‌খা॥

লঘুস্বরান্ত শেষ পর্ব্বে দুইটি দীর্ঘস্বরের স্থলে দুইটি লঘুস্বর এবং একটি দীর্ঘস্বর থাকিলে এই দোধকের নাম হয় মোদক।

গজ্জউ মেহ কি অংবুর সাবর। ফুল্লউ ণীব কি বুল্লউ ভম্মর॥

একউ জীঅ পরাহিণ অম্মহ। কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥

পজ্ঝটিকার দোধকরূপে প্রত্যেক চরণে দুইমাত্রা অতিপর্ব্ব থাকিলে নাম হয় তারক।

ণব—মঞ্জরি লিজ্জিঅ। চূঅহ গাচ্ছে॥ পরি—ফুল্লিঅ কেসু ণ। আ বণ কাচ্ছে॥

জই—এথি দিগংতর। জাই ণহি কংতা। কিঅ—বম্মহ ণথি কি। ণথি বসংতা॥

কেবল প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বের প্রারম্ভে দীর্ঘস্বর থাকিলে এবং বাকি সমস্তে হ্রস্বস্বর থাকিলে পজ্ঝটিকার নাম হয় একাবলী।

সো জণ। জনমউ। সো গুণ-। মন্তউ॥ জে কর। পরউঅ-। আর হ-। সন্তউ॥

জো পুণ। পর উঅ-। আর বি-। রুজ্জউ॥ তাক জ-। ণণি কি ণ। থক্কউ। বংঝউ॥

পজ্ঝটিকার শেষাক্ষর ছাড়া যদি সব স্বরগুলি হ্রস্ব হয়—তবে তাহাকে বলে সরভ।

তরল কমলদল সরিজুঅণঅণা॥ সরঅ সমঅ সসি সুসরিস বঅণা॥

মঅগল করিবর সঅলস গমণী। কমণ সুকিঅ ফল বিহিমঠ রমণী॥

বিদ্যাপতির—কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥ অনেকটা এইরূপ। বৈষ্ণব কবিদের পজ্ঝটিকার ছন্দে রচিত পদে এই সকল বিশিষ্টরূপের চরণের অবাধ মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। চর্য্যাপদের পজ্‌ঝটিকার দৃষ্টান্ত—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥

ভাষায় কবিতা রচিত হইত। এই ছন্দে চরণে চরণে মিল থাকে। দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের ধ্রুব সন্নিবেশ মানিতে হয় না। প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা এবং প্রত্যেক লঘুস্বরকে একমাত্রা ধরিয়া প্রত্যেক চরণে ষোলটি মাত্রা রাখিলেই চলে। ঐ ষোলমাত্রা চারিটি পর্ব্বে ভাগ করা যায়। দীর্ঘস্বর বেশি থাকিলে অক্ষরসংখ্যা কম থাকে, লঘুস্বর বেশি থাকিলে অক্ষরসংখ্যা বেশি থাকে। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' (৯ অক্ষর), 'নলিনীদলগতজলমতিতরলম্' (১৫অক্ষর) দুইই পজ্ঝটিকার চরণ। স্বরের ধ্রুব সন্নিবেশের নিয়ম না থাকায় এই ছন্দোরচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বৈষ্ণব কবিরা স্বাধীনতার পরিসর আরও বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে উদাহরণ দিতেছি—

তাল ফ-। লা দপি। গুরু মতি। সরসম্॥ কিমু বিক-। লী কুরু-। যে কুচ। কলসম্।
সীদতি। সখি মম। হৃদয় ম-। ধীরম্॥ যদভজ। মিহ নহি। গোকুল-। বীরম্॥
আঁচর। লেই ব-। দন পর। ঝাঁপে॥ থির নহি। হোয়ত। থরথর। কাঁপে॥
হঠপরি। রভসে। নহি নহি। বোল॥ হরি ডরে। হরিণী। হরিহিয়ে। ডোল॥
শিরপর। চাঁদ অ-। ধরপর। মুরলী॥ চলইতে। পন্থে ক-। রয়ে কত। খুরলী॥
সো ধনি। মানি সু-। রত অধি। দেবী॥ তাকর। চরণ ক-। মলপর। সেবি॥
তুঁহু বর। নারী চ। তুরবর। কাণ॥ মরকতে। মিলল ক-। নক দশ। বাণ॥

সংস্কৃত চরণের সহিত ব্রজবুলির চরণগুলি মিলাইলে দেখা যাইবে— বৈষ্ণব কবিরা শেষপর্ব্বে অধিকাংশ স্থলে ৪ মাত্রার বদলে ৩ মাত্রা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া একমাত্রা ধরিয়াছেন। অনেক চরণকে ৮+৭ মাত্রায় না পড়িয়া ৭+৮ মাত্রায় পড়িলে সুরের বৈচিত্র্য ঘটে বলিয়া ৭+৮ মাত্রার বিভাগে পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন।

ক্রমে ১৫ মাত্রার পজ্ঝটিকার চরণের শেষপর্ব্বে আরও একটি মাত্রা লুপ্ত হওয়ায় পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নলিখিত চরণগুলি পজ্ঝটিকার পদে দেখা যায়। এইগুলি পয়ারেরও চরণ।

বদনে দশন দিয়া দগধে পরাণ। রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান। না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
নব কুচ নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে। জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে।
রসবতি আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ। দশদিশ দামিনী দহন বিথার।

পজ্ঝটিকার ১৬ মাত্রা স্থলে ১৪ মাত্রা ধরিলে এবং প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে একমাত্রা ধরিলেই পয়ার হইল। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ উপেক্ষা করায় এবং শব্দের মাঝে যতিদানের প্রথা উঠাইয়া দেওয়ায় পয়ারে পজ্ঝটিকার ছন্দঃস্পন্দ একেবারে লোপ পাইল। "মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট"—ইহাতে যে ছন্দঃস্পন্দ আছে পয়ারে তাহা নাই।

আরও একমাত্রা কমানোতে ইহা নূতন ছন্দের রূপ লাভ করিল। যেমন—

শুন সুন্দর কানু। ব্রজবিহারী। হৃদি-মন্দিরে রাখি। তোমারে হেরি॥
আহিরিণী কুরূপিণী। গোপনারী। তুমি জগরঞ্জন। বংশীধারী।

ইহারই অনুরূপ—রবীন্দ্রনাথের—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দকে বলা হইয়াছে **হাকলি**—

উচ্চউ ছাঅণ। বিমল ধরা। তরুণী ধরিণী। বিনয় পরা॥
বিত্তক পূরল। মুদ্দহরা। বরিসা সমআ। সুকৃখ করা॥

ব্রজবুলিতে রচিত পদের আর একটি প্রধান ছন্দ **প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদী**। এই ছন্দ প্রাকৃতের **মরহট্টা, চউপইআ** ও **নরেন্দ্র বৃত্তের** মিশ্রণ। *

---

* এই ছন্দগুলির দৃষ্টান্ত প্রাকৃত পিঙ্গল হইতে দেওয়া হইল। বৈষ্ণব কবিগণ অধিকাংশ স্থলে গোড়ার অতিপর্ব্ব দুই মাত্রা বাদ দিয়া থাকেন। প্রথমে মরহট্টার কথা বলি। মরহট্টা—দুইমাত্রা অতিপর্ব্বের (Hyper-metrical) পর—৮+৮+৮+৩ মাত্রায় মরহট্টার চরণ গঠিত॥ ভ্রমক্রমে আগে মরহট্টা ভরহট্টা ছাপা হইয়াছে।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের প্রথমাংশ পজ্ঝটিকা। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে যেমন উপজাতি, নরেন্দ্রবৃত্ত ও মরহট্টার (বা চউপইআ) মিশ্রণে তেমনি এই দীর্ঘ ত্রিপদী। ঠিক পজ্ঝটিকার নিয়মেই ব্রজবুলিতে এই ছন্দ রচিত। প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধ—মরহট্টা বা চউপইআর মত ৮+৮ মাত্রা কিংবা

জই—মিত্ত ধনেসা। সমুর গিরীসা। তছ বিহু পিংধন। দীস।
জই—অমিঅহকন্দা। ণি অলহি চন্দা। তহ বিহু ভোঅন। বীস॥
জই—কণঅসুরঙ্গা। গোরি অধংগা। তহ বিহু ডাকিনি। সঙ্গ।
জো—জসু হি দিআবা। দেব সহাবা। কবহু ণ হো তসু। ভঙ্গ॥

চ-উপইআ (২)—৮+৮+৮+৪

কির—ণা বলি কংদা। বন্দিঅ। চংদা। ণঅণহি অণল ফু। রস্তা।
সো—সংপঅ দিজ্জউ। বহু সুহ বিজ্জউ। তুজ্ঝ ভবানী। কন্তা॥

বৈষ্ণব কবিরা পর্ব্বে পর্ব্বে কোথাও মিল দিয়াছেন—কোথাও দেন নাই। চউপইআ ও মরহট্টায় বিশেষ প্রভেদ কিছু নাই। মরহট্টার শেষ পর্বে ৩ মাত্রার বদলে ৪ মাত্রা। বৈষ্ণব কবিগণ কোথাও মরহট্টার মত ৩ মাত্রা—কোথাও চউপইআর মত ৪ মাত্রা ধরিয়াছেন। পিঙ্গল এই দুই ছন্দে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সুনির্দ্দিষ্ট সমাবেশ পর্বে পর্বে একরূপই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু ইহা বাধ্যতামূলক নয়। বৈষ্ণবকবিকুঞ্জরগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ।

মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্র বৃত্তের মিশ্রণে বৈষ্ণব কবিদের বহু পদ রচিত হইয়াছে। নরেন্দ্র বৃত্তের চরণকে ৭+৯+৮+৪ বা ৩ মাত্রায় ভাগ করা হয়। প্রাকৃত কবি এই ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের নিয়মিত বিন্যাস করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস না করিয়া স্বেচ্ছামূলক বিন্যাস করিয়াছেন এবং মোটের উপর মাত্রাবিভাগ ঠিক রাখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, নরেন্দ্র বৃত্তে তাঁহারা পৃথক পদ রচনা না করিয়া অধিকাংশ স্থলে মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্র বৃত্তের চরণ মিশাইয়াছেন। প্রাকৃত পিঙ্গলে নরেন্দ্র বৃত্তের দৃষ্টান্ত—

৭+৯+৮+৪—ফুল্লিঅ কেসু। চন্দ তহ পঅলিঅ। মঞ্জরি তেজ্জউ। চুআ।
দক্খিণ বাউ। সীঅ ভউ পবহই। কম্প বিয়োইণি। হীআ।
কেঅই ধূলি। সব্ব দিস পসরই। পীঅর সব্বউ। ভাসে।
আউ বসন্ত। কাই সহি করিঅই। কন্ত ন থক্কই। পাশে।

নরেন্দ্রবৃত্তের মত ৭+৯ মাত্রায় গঠিত। বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দোহিল্লোল ও

ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—ঐ ছন্দে।

কিংশুক ফুল। চন্দ্র এবে প্রকটিত। মঞ্জরী ত্যজে সহ। কারে।
দক্ষিণ পবন। শীতল হয়ে প্রবাহিত। বিরহিণী কাঁপে বারে। বারে।
কেতকীর পরাগে। ভরিয়া গেল দশদিশ। পীতবাসে তারা যেন। হাসে।
বসন্ত আইল। কি করি বল সখি আজ। কান্ত যে নেই মোর। পাশে।

গগনাঙ্গ ছন্দেও এইরূপ ৭-৯ মাত্রায় পর্বার্দ্ধ গঠিত। পর্ব্ববিভাগ—(১) ভংজিঅ মলঅ। চোল বই পিবলিঅ। (২) মালব রাঅ। মলঅ গিরি লুক্কিঅ—এইরূপ। ইহাতে নরেন্দ্রবৃত্তের মত দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের ধ্রুব বিন্যাস নাই। বৈষ্ণব কবিরা এই প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে—রবীন্দ্রনাথ প্রাঃ দীঃ ত্রিপদীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

নীল আকাশে। তারক ভাসে। যমুনা গাওত। গান।
পাদপ মরমর। নির্ঝর ঝরঝর। কুসুমিত বল্লী বি। তান।

এই পদে কবি পর্বে পর্বে মিলও দিয়াছেন। কিন্তু বিনা মিলের চরণেই অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ রচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরকে দুইমাত্রা ধরিয়া অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম পালন করিয়াছেন। এই ছন্দে তিনি খাঁটি বাংলায় গানও লিখিয়াছেন। তাঁহার একটি বিখ্যাত গানের দুই চরণ—

পতন অভ্যুদয়। বন্ধুর পন্থা। যুগ যুগ ধাবিত। যাত্রী।
হে রণ-সারথি। তব রথচক্রে। মুখরিত চির দিন। রাত্রি॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে তিনি এই ছন্দে স্তবক বন্ধনও করিয়াছেন—

মরণ রে—তুঁহু মম শ্যাম স। মান।
মেঘ বরণ তুঝ। মেঘ জটাজুট। রক্তকমল কর। রক্ত অধর পুট।
তাপবিমোচন। করুণা কোর তব। মৃত্যু অমৃত করে। দান।
ভুজপাশে তব। লহ সম্বোধয়ি। আঁখিপাত মম। আসব মোদয়ি।
কোর উপর তুঝ। রোদয়ি রোদয়ি। নীদ ভরব সব। দেহ।
তুহুঁ নহি বিসরবি। তুহুঁ নহি ছোড়বি। রাধা হৃদয় তু। কবহুঁ ন তোড়বি।
হিয় হিয় রাখবি। অনুদিন অনুখন। অতুলন তোঁহার। লেহ।

ইহা পজ্ঝটিকার অন্তরার সঙ্গে প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর স্তবক বন্ধন।

সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই উভয়বিধ চরণের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—
৮+৮+৮+৪ অথবা ৩

রাধা বদন বি-। লোকন বিকসিত। বিবিধ বিকার বি-। ভঙ্গম্
জলনিধি মিব বিধু-। মণ্ডলদর্শন। তরলিত তুঙ্গ ত-। রঙ্গম্—(জয়দেব)
ভজদবনস্থিতি। মখিল পদে সখি। সপদি বিড়ম্বিত। তূলম্
কলিত সনাতন। কৌতুকমপি তব। হৃদয়ং স্ফুরতি স। শূলম্—(সনাতন)
গিরিবর গুরুয়া। পয়োধর পরশিত। গীম গজ মোতিম। হারা।
কাম কম্বু ভরি। কনয়া শম্ভু পরি। ঢারত সুরধুনী। ধারা॥ (বিদ্যাপতি)
রজনি কাজর বম। ভীমভুজঙ্গম। কুলিশ পড়য়ে দুর। বার
গরজ তরজ মন। রোষে বরিষ ঘন। সংশয় পড়ু অভি। সার—(গোবিন্দদাস)
আহিরিণী কুরূপিণী। গুণহিনী অভাগিনী। কাহে লাগি তাহে বিষ। পিয়বি।
চন্দ্রাবলী মুখ। চন্দ্রসুধারস। পিবি পিবি যুগে যুগে। জিয়বি। (চন্দ্রশেখর)
৭+৯+৮+৪ অথবা ৩—নরেন্দ্রবৃত্তের চরণ।

করিবর রাজ-। হংস জিনি গামিনী। চলিলহুঁ সংকেত। গেহা।
অমলা তড়িত-। দণ্ড হেম মঞ্জরী। জিনি অতি সুন্দর। দেহা। (বিদ্যাপতি)
অভিমত কাম। নাম পুন শুনইতে। রোখই গুণদর-। শাই। (কবিশেখর)
লহু লহু মুচকি। হাসি হাসি আয়সি। পুন পুন হেরসি। ফেরি—(জ্ঞানদাস)
আঘণ মাস। নাহ হিয় দাহই। শুনইতে হিম কর। নাম।
অঙ্গন গহন। গহন ভেল মন্দির। সুন্দরি তুঁহু ভেলি। বাম (বলরাম)

এই দৃষ্টান্তগুলি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে—বৈষ্ণব কবিরা সুবিধামত কখনও দীর্ঘস্বরকে দুমাত্রা ধরিয়াছেন—কখনও একমাত্রা ধরিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে হ্রস্বস্বরকেও কোথাও কোথাও দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পর্ব্বে পর্ব্বে মিলও আছে—এ মিল অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। শেষ পর্ব্বে তিনটি লঘুমাত্রারও সমাবেশ করিয়াছেন। যে চরণে দীর্ঘস্বর বেশি, সেই

চরণে ছন্দোহিল্লোলের স্থষ্টি হইয়াছে। যে চরণে হ্রস্বমাত্রার সংখ্যা বেশি সে চরণে অক্ষর-বাহুল্য ঘটিয়াছে—ছন্দোহিল্লোলের অভাব হইয়াছে। এই ছন্দের চরণে অক্ষর-বাহুল্য ঘটিলে এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণকে উপেক্ষা করিলে ইহা প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত অংশে ছন্দোহিল্লোলহীন প্রচলিত দীর্ঘত্রিপদী ও ছন্দঃস্পন্দময় প্রাকৃত দীর্ঘত্রিপদীর চরণ একসঙ্গে গুম্ফিত হইয়াছে। একমাত্রায় ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর না থাকায় এই গুম্ফন সম্ভব হইয়াছে।

না দেখিলে প্রাণ কাঁদে। দেখিলে না হিয়া বাঁধে। অনুখন মদন ত-। রঙ্গ।
হেরইতে চাঁদমুখ। উপজে চরম সুখ। সুন্দর শ্যামর। অঙ্গ।
চরণে নূপুরধ্বনি। সুমধুর শুনি শুনি। রমণীক ধৈরজ। অন্ত।
ওরূপ-সায়রে মন। হিলোলে নয়ন মন। আটকিল রায় ব-। সন্ত।

এই ছন্দের চরণের শেষার্দ্ধকে এক-একটি চরণ ধরিয়া নব ছন্দের রূপ দেওয়া হইয়াছে। যেমন—

গণইতে মোতিমা। হারা ॥ ছলে পরশিবি কুচ। ভারা। (বিদ্যাপতি)
হাম করলু পরি। হাস ॥ তাকর বিরহ হু-। তাশ। (যদুনন্দন)

এই ছন্দকে প্রাকৃত পিঙ্গলে **আভীর** ছন্দ বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

সুন্দরি গুঞ্জরি। নারী ॥ লোঅন দীশ বি-। সারি ॥
পীন পওহর। ভার ॥ লোলই মোতিম। হার ॥

এইরূপ চরণের সঙ্গে পজ্ঝটিকার পূরা চরণের মিল দেওয়াও হয়।

মানয়ে তব পরি-। রম্ভ। প্রেমভরে সুবদনি। তনু জনু স্তম্ভ ॥
তোড়ল যব নীবি-। বন্ধ। হরিসুখে। তবহিঁ ম-। নোভব মন্দ ॥

এই আভীর ছন্দের চরণই হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্য হারাইয়া দশাক্ষরী লঘু পয়ারে পরিণত জন্ম হইয়াছে।

আজু কেগো মুরলী বা-। জায় ॥ এতো কভু নহে শ্যাম। রায় ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে। হাসে। এরূপ হইবে কোন। দেশে ॥

প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ পর্ব্বে ৩ বা ৪ মাত্রার স্থলে ৬, ৭ বা ৮ মাত্রা থাকিলে তাহাকে **প্রাকৃত দীর্ঘ চৌপদী** বলা যায়।* মাত্রা-নির্ণয়, মাত্রা-বিভাগ ইত্যাদি প্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীর মতই।

---

* এই দীর্ঘ চৌপদীর বিবিধরূপ প্রাকৃত পিঙ্গলে বিভিন্ন নামে অভিহিত। সব মাত্রাগুলিকে লঘুস্বরে পরিণত করিলে এবং দুইমাত্রা অতিপর্ব্ব যোগ করিলে হয় জলহরণা।

চলু—দমকি দমকি বলু। চলই পইক বলু। ধুলকি ধুলকি করি। করি চলিআ।

বর—মলু সঅল কমল। বিপখ হিঅঅ সল। হমীর বীর জব। রণ চলিআ।

প্রত্যেক পর্বার্দ্ধ দীর্ঘস্বরের দ্বারা আরব্ধ হইলে চউবোলা।

রে ধনি মত্ত ম। তংগজগামিনি। খংজস লোঅণি। চন্দমুহী।

চংচল জুব্বণ। জাত ণ জানহি। ছইল সমপ্পহি। কা ই নহী।

দুইটি অতিপর্ব মাত্রার সঙ্গে নিয়মিত দীর্ঘমাত্রার ঘন ঘন প্রয়োগের ফলে হয় পদ্মাবতী।

ভঅ—ভংজ্জিঅ বংগা। ভংগু কলিঙ্গা। তেলঙ্গা রণ। মুকি:চলে।

মর—হট্টা ধিট্টা। লগ্গিঅ কট্টা। সোরট্টা ভঅ। পাঅ পলে।

এই ছন্দগুলিকে সাধারণভাবে প্রাকৃত চৌপদী নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃত চৌপদীতে রচিত পদে ঐ সকল বিশিষ্টরূপের চরণের অবাধ মিশ্রণ থাকে। সেজন্য এই শ্রেণীর ত্রিভংগী ছন্দের সহিত বৈষ্ণব কবিদের অবলম্বিত ছন্দের মিল বেশি।

শির—কিজ্জিঅ গংগং। গৌরি অধংগং। হণিঅ অনঙ্গং। পুরদহনম্।

কিঅ—ফণি বই হারং। তিহুঅণ সারং। বন্দিঅ ছারং। রিউমহণম্॥

সুর—সেবিঅ চরণং। মুনিগণ সরণং। ভবভয় হরণং। মুলধরম্।

সা—নন্দিঅ বঅণং। সুন্দর ণঅণং। গিরিবর সঅণং। ণমহ হরম্॥ (ত্রিংগী)

এই পুস্তকের ১৬৬ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্য-স্তবের ছন্দটি ইহারই বাংলারূপ। এই ছন্দই অক্ষরমাত্রিক হইয়া অথবা স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হারাইয়া বাংলার দীর্ঘ চৌপদীতে পরিণত হইয়াছে। যেমন—রবীন্দ্রনাথের—

কেদারার পরে চাপি। ভাবি শুধু ফিলসাফি। নিতান্তই চুপিচাপি। মাটির মানুষ।

লেখাত লিখেছি ঢের। এখন পেয়েছি টের। সে কেবল কাগজের। রঙিন ফানুষ।

৮+৮+৮+৬, ৭+৯+৮+৬, ৭+৯+৮+৭, ৮+৮+৮+৭, ৮+৮+৮+৮

অধর সুধা ঝরু। মুরলী তরঙ্গিণী। বিগলিত রঙ্গিণী। হৃদয় দুকুল।
মাতল নয়ন। ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি। উড়ত পড়ত শ্রুতি। উতপল ফুল।
গোরোচন তিলক। চূড়ে বনি চন্দ্রক। বেঢ়ল রমণী মন। মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস চিতে। নিতিনিতি বিহরই। ইহ নাগর বর। তরুণ তমাল।
নীল সুলাবণি। অবনী ভরল রূপ। নখমণি দরপণি। তিমির বিনাশে।
রায়বসন্ত মন। সেবই অনুখন। ঐছন চরণ ক-। মল-মধু আশে॥

এই ছন্দের চরণের সহিত আভীর, পজ্‌ঝটিকা ও প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর মিল দেখা যায়।

(১) গোবিন্দ দাস মতি। মন্দে
এত সুখ সম্পদে। রহুইতে আনমন। যৈছন বামন। ধরলহি চন্দে॥

(২) সে সুখ সম্পদে। শঙ্কর ধনিয়া
সো সুখ সার। সরবস রসিকই। কণ্ঠ হি কণ্ঠ প-। রায়ল বনিয়া॥

(৩) বলয় বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী নূপুর রুনু রুনু বাজে।
গোবিন্দ দাস পহুঁ নিতিনিতি ঐছন বিহরই নবঘন বিপিন-সমাজে॥

এই ছন্দের স্তবক-বন্ধনের নিদর্শনও বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরহরি চক্রবর্ত্তীর একটি পদ হইতে নিদর্শন উদ্ধৃত করি—

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন। নিত্যানন্দ বিপদভয়ভঞ্জন,
কঞ্জ নয়ন জিতি নব নব খঞ্জন। চাহনি মনমথ গরব হরে।
ঝলকত দুহুঁ তনু কনক ধরাধর। নটনঘটন পগ ধরত ধরণী পর।
হাস মিলিত মুখ লয়ত সুধাকর। উদার বচন জনু অমিয় ঝরে।

গোবিন্দদাস দুই একটি পদে এই দীর্ঘ চৌপদীকে একটি অভিনব রূপ দিয়াছেন। একই মিলের বার বার আবির্ভাবে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কুঞ্চিত-কেশিনী। নিরুপম-বেশিনী। রস আবেশিনী। ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী। অঙ্গ তরঙ্গিণী। সাঙ্গলি নব নব। রঙ্গিণী রে।

বিদ্যাপতির 'গেলি কামিনী গজহগামিনী বিহসি পালটি নেহারি।' গোবিন্দদাসের 'নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ', রায়শেখরের গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।' কবিশেখরের (বিদ্যাপতির ?) ঈ' ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' সিংহভূপতির 'মোর বনবন শোর শূনত বাঢ়ত মনমথ পীড়' ইত্যাদি বিখ্যাত পদ এই ছন্দে রচিত।

এই ছন্দের স্তবকিত রূপ—৭+৭, ৭+৭, ৭+৭, ৭+২ (কিংবা ৭+৫)

যবহুঁ পিয়া মঝু। আঙনে আওব। দূরে রহি মুঝে। কহি পাঠাওব।
সকল দূখন। তেজি ভূখন। সমক সাজব। রে।
লাজ নতি ভয়ে। নিকটে আওব। রসিক ব্রজপতি। হিয়ে সম্ভায়ব।
কাম কৌশল। কোপ কাজর। তবহুঁ রাজব। রে। (সিংহভূপতি)

নরহরি চক্রবর্ত্তী ঘনশ্যাম এইরূপ স্তবকগঠণের প্রধান শিল্পী। দৃষ্টান্ত—

গৌর বিধুবর। বরজ সুন্দর। জননী পদধূলি। ধরত শির পর।
করত বিজয় বি-। বাহে ভূসুর। বৃন্দ বলিত সু-। শোহয়ে।
চড়ত চৌদল। নাহি ঝলকত। অরুণ কিরণ স-। মুদ্র উছলত।
মদন মদভর। হরণ সরস শি-। ঙার জনমন। মোহয়ে॥

পর্ব্বের প্রথমে দীর্ঘস্বরের বদলে ইহাতে হ্রস্বস্বর আছে ইহাই প্রভেদ।

মনোহংস——জহি—ফুল্ল কেসু অ। সোঅ চম্পঅ। মংজুলা।

সহ—আর কেসর। গন্ধ লুদ্ধউ। ভম্মরা।

ইহাতে একটি পর্ব্বই কম। রবীন্দ্রনাথ ৭এর সহিত ৫ মাত্রার পর্ব ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। (১) বেলা যে পড়ে এল জলকে চল (২) পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে (৩) এমন দিনে তারে বলা যায়, (৪) গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি ইত্যাদি কবিতায় ৭এর সঙ্গে ৫ মাত্রার সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

চলি—চুঅ কোইল। সাব॥ মহু—মাসপঞ্চম। গাব

মণ—মজ্ঝ বম্মহি। তাব॥ গহ—কন্ত অজ্ঝবি। আব

প্রাকৃত লিখলে তোমর ছন্দের এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। ২—৭+৩

লঘু ত্রিপদী ও চৌপদী‡—একই নিয়মে ৬টি মাত্রায় এক এক পর্ব্ব গঠন করিয়া ৩ পর্ব্ব ও একটি ২ বা ৩ মাত্রার উপপর্ব্বে প্রাকৃত লঘু ত্রিপদীর চরণ ও ঐরূপ তিন পর্ব্ব ও ৪ বা ৫ মাত্রায় গঠিত এক এক উপপর্ব্বে প্রাকৃত লঘু চৌপদীর চরণ গঠন করা হইয়া থাকে।/ দৃষ্টান্ত—

৬+৫+৬+৩—বসতি বিপিন। বিতানে ×। ত্যজতি ললিত। ধাম

৬+৬+৬+৩—লুঠতি ধরণি। শয়নে বহু। বিলপতি তব। নাম। (জয়দেব)

৬+৬ } কুর্ব্বতি কিল। কোকিল কুল। উজ্জ্বল কল। নাদম্।
৬+৪ } জৈমিনি রিতি। জৈমিনি রিতি। জল্পতি সবি-। যাদম্। (সনাতন)

৬+৬+৬+৪ (১) আওত পর। বঞ্চক শঠ। নাগর শত। ঘরিয়া।
রমণী পদ-। যাবক পরি। সর বক্ষসি। ধরিয়া॥

শচীনন্দন দাস ও ঘনশ্যাম দাস বারমাস্যা পদে এই তোমর ছন্দকে সাত মাত্রার সহিত মিশাইয়া স্তবক গঠন করিয়াছেন।

দেখ—পাপি আবন। মাস॥ জনু—বিরহতাপ-হু। তাশ
ঘর—শাই সুখবিহি। পেল॥ হিয়ে—কৈছে সহইব। শেল
হিয়ে—কৈসে সহইহ। শেল ভেল মধু। প্রাণ পিয়া পর। দেশিয়া।
জনু—ছুটল ফুল-শর। ফুটল অন্তর। রহিল তহি পর। বেসিয়া॥

তোমর ছন্দ হইতে গীতাচ্ছন্দে ৪টি শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা অভিসরণ সঙ্গীত মাধুর্য্য বাড়াইয়াছে। শচীনন্দন দাসও ঠিক এই ভাবে ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন।

‡ ইহার অনুরূপ ছন্দ প্রাকৃত পিঙ্গলে হীর ও ধবলাঙ্গ।

হীর ছন্দে শেষ পর্বে পাঁচ মাত্রা এবং ধবলাঙ্গ ছন্দে দুই মাত্রা। অতএব হীর লঘু চৌপদীর এবং ধবলাঙ্গ লঘু ত্রিপদীর অনুরূপ। এই দুই ছন্দে দীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস আছে—বৈষ্ণব কবিদের পদে মোটের উপর পর্বে পর্বে মাত্রা সাম্য রাখা হইয়াছে।

হীর—৬+৬+৬+৫—ধুলি ধবল। হক্ক সবল। পক্খি পবল। পত্তিএ।
কন্ন চলই। কুম্ম ললই। ভুমি ভরই। কীত্তিএ।

৬+৬+৬+৪ (২) স্ফুটচম্পক। দলনিন্দিত। উজ্জ্বল তনু। শোভা।
পদপঙ্কজে। নূপুর বাজে। শেখর মনো। লোভা॥ (শেখর)
৬+৬+৬+৫ (৩) চন্দ্রকোটি। কমল ছোটি। ঐছে বদন। ইন্দুয়া।
মুকুতা পাঁতি। দশন কাঁতি। বচন অমিয়া। সিন্ধুয়া। (মাধব)
৬+৬+৬+৩ (৪) নব রঙ্গিম। পদ ভঙ্গিম। অঙ্গুলে নখ। চাঁদ।
মাধব ভণ। রমণীমন-। চকোর নিকর। ফাঁদ।
স্তবক—আজু বিপিনে আওত কান। মূরতি মূরত কুসুম বাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভাঙ নটবর শোহণী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ। তরুনী নয়ন বয়ন ফন্দ।
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলী। ত্রিভুবন মনমোহনী।

বৈষ্ণব কবিগণ কোথাও অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রায় ধরিয়াছেন—কোথাও কোন কোন দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়াছেন। কোথাও তাঁহারা পর্ব্বের প্রথমাংশে দীর্ঘ মাত্রা, কোথাও দ্বিতীয়াংশে দীর্ঘ মাত্রার ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব স্বরকে সর্ব্বত্রই দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। ক্রমে এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বর, ঐকার, ঔকার ছাড়া কোন দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব স্বীকার করা হয় নাই। পরে কোন দীর্ঘস্বরকেই দুই মাত্রা ধরা হয় নাই অর্থাৎ ছন্দ অক্ষর-মাত্রিক হইয়া পড়িয়া একেবারে ছন্দোহিল্লোল হারাইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঘন ঘন যুক্তাক্ষর প্রয়োগে হীরছন্দের ছন্দো হিল্লোল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—
কভু—কাষ্ঠলোষ্ট্র ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া। কভু—ভূতলজল অন্তরীক্ষ লঙ্ঘনে লঘুমায়া॥
তব—খনিখনিত্র নখ বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অস্ত্র। তব—পঞ্চভূত বন্ধন কর পঞ্চভূততন্ত্র॥

ধবলাঙ্গ—৬+৬+৬+২—তরুণ তরণি। তবই ধরণি। পবণ বহ খ। রা
লগ ণ হি জল। বড় মরু থল। জণ জিঅণ হ। রা॥

এই ৬ মাত্রার ছন্দ ৩ ভাবে বাংলায় রূপ লাভ করিয়াছে। (১) একটি রূপে প্রত্যেক দীর্ঘ

পয়ার—পজ্ ঝটিকা শেষপর্ব্বের দুই মাত্রা এবং হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রার বৈষম্য হারাইয়া চতুর্দ্দশ অক্ষর-মাত্রায় পয়ারে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বেই কতকগুলি চরণ তুলিয়া দেখাইয়াছি—সেগুলি পজ্ ঝটিকার পদে যেমন সুসমঞ্জস, পয়ারের পদেও তেমনি। চণ্ডীদাস, কবিশেখর, যদুনন্দন ইত্যাদি কবিগণ এবং চৈতন্য-চরিতকারগণ পয়ারে কাব্য রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পয়ারে যুক্তাক্ষরের আতিশয্য নাই—সেজন্য ইহা পজ্ ঝটিকারই কাছাকাছি।

১। কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী। কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী।

২। এ কবিশেখর কয় না করিহ ডর। গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না জানিবে পর।

ক্রমে এক-এক মাত্রার স্থলে দলে দলে যুক্তাক্ষর পয়ারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পয়ারকে পজ্ ঝটিকা হইতে বহু দূরে লইয়া গেল। যেমন—

ভাবাদি অষ্টজা তিন বৈমুগ্ধ্য চকিত। দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত। যদুনন্দন

স্বরের জন্য দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। যেমন—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিল তব ভেরী। আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

(২) কেবল যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বর ও ঐকার ঔকারকে দুই মাত্রা ধরিয়া। যেমন—

পৌষ প্রখর শীত জর্জর ঝিল্লী মুখর রাতি। নির্জ্জন গৃহ নিদ্রিত পুরী নির্বাণ দীপ বাতি।

(৩) সকল প্রকার দীর্ঘ স্বরকেই উপেক্ষা করিয়া অক্ষর মাত্রিক ভাবে। যেমন—

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীরসম স্বাদু নীর।

রবীন্দ্রনাথ অন্তরার পর্বে দুই মাত্রা বাড়াইয়া লিখিয়াছেন—

(১) শুনহ শুনহ বালিকা। রাখ কুসুম মালিকা। কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মঞ্জরী। ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি। অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে॥

(২) তুমি—চক্র মুখর মন্দ্রিত। তুমি—বজ্রবহ্নি-বন্দিত।
তব—বস্তুবিশ্ব বক্ষদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত। তব—দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী বিঘ্নবিজয় পন্থ॥

ইহা অনেকটা বিদ্যাপতির—যব—গোধুলি সময় বেলি। ধনি—মন্দির বাহির ভেলি। নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি ইত্যাদির অনুরূপ।

তারপর পয়ারের মধ্যে আর একশ্রেণীর চরণ প্রবেশ করিল। এই শ্রেণীর চরণে পাদকমাত্রা (Syllablic) এক এক মাত্রার স্থান অধিকার করিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত হসন্তবর্ণের মিলনে অথবা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে এক একটি পাদকমাত্রা গঠিত। পয়ারের মধ্যেই পাই—

পিঠে দোলে সোনার ঝাঁপা তাহে পাটের খোপা।
গলে দোলে বকুল মালা গন্ধরাজ চাঁপা। (রামানন্দ)

ইহা যে পয়ার তাহা নিম্নলিখিত রূপ হইতেই বুঝা যাইবে—৮+৬, ৮+৬
পিঠে দোলে সোনাঝাঁপা তাহে পাটের্খোপা। গলে দোলে বকুল্মালা
গন্ধরাজ চাঁপা।

এই শ্রেণীর চরণ পয়ারের মধ্যে কিরূপ চলিয়া গিয়াছে, তাহা কৃত্তিবাসের ছন্দোবিশ্লেষণে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এই শ্রেণীর চরণের আতিশয্য কোন পদে ঘটিলেই তাহাকে ধামালী বলা হয়। পয়ারের এই ধামালী-রূপের সূত্রপাত বড়ু চণ্ডীদাস হইতেই হইয়াছে।

কে না। বাঁশী। বায় বড়ায়ি। কালিনী নই। কূলে।
কেনা বাঁশী। বায় বড়ায়ি। এ গোঠ গো-। কূলে।

বৈষ্ণবসাহিত্যে লোচনদাস এই ধামালী ছন্দের প্রধান প্রবর্ত্তক।* তারপর পর ক্রমে এই ছন্দই রামপ্রসাদের রচনার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাংলা কবিতার প্রধান ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত—

৪+৪+৪+২—রূ-পের্ না-গর্। র-সের্-সা-গর। উ-দয়্-হলো। এসে।
না-গ-রী লো-। চ-নের্ মন্ যে। তাইতে গেল। ভেসে॥

---

* চাইলে নয়ন বাঁধা রবে মনচোরা তার রূপ। হাস্যবয়ান রাঙা নয়ান এই না রসের কূপ।
চাইলে মেনে মরবি ফেলি কুল সে রবে নাই। কুলশীল তোর রাখবি যদি থাক না বিরল ঠাঁই।
কুল খোওয়াবি বাউরি হবি লাগবে রসের ঢেউ। লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পারে কেউ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—পজ্ঝটিকা যে ভাবে পয়ারে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদী ও সেইভাবে সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘ স্বরের মাত্রাগৌরব হারাইয়াও ইহা কেবল অযুক্তাক্ষরের ভূরি প্রয়োগে প্রাকৃত ছন্দের কাছাকাছি ছিল। যেমন—

গোকুল নগর মাঝে। আরো কত নারী আছে। তাহে কেন না পড়িল। বাধা।
নিরমল কুলখানি। যতনে রেখেছি আমি। বাঁশী কেন বলে রাধা। রাধা॥

ক্রমে একএকটি মাত্রার স্থলে যুক্তাক্ষরের অবাধ প্রবেশে ইহা প্রাকৃত হইতে দূরবর্ত্তী হইল। যেমন—

মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম। কি কান্তি আনন্দ সদ্ম। কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়।
কহিতে গদ্গদবাণী। পুলকিত অঙ্গখানি। এ যদুনন্দন দাসে কয়॥

শুধু যুক্তাক্ষর নয় ক্রমে পাদকমাত্রা (স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন+হসন্ত ব্যঞ্জনে গঠিত মাত্রা) প্রবেশ করিয়া ইহার রূপ আরও বদলাইয়া দিল। যেমন—

অক্রূর করে তোর দোষ। আমায় কেন কর রোষ। ইহা যদি কহ তুরা-। চার।
তুই অক্রূর মূর্ত্তি ধরি। কৃষ্ণ নিলি চুরি করি। অন্যের নয় ঐছে ব্যব-। হার।

পাদকমাত্রার সংখ্যা বাড়িয়া এই ছন্দ ধামালীর দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপ ধরিল।

এমন কেউ ব্যথিত থাকে। কথার ছলে মাণিক রাখে। নয়ান ভরি দেখি। রূপ খানি।
লোচনদাসে বলে কেনে। নয়ান দিলি উহার পানে। কুল মজালি আপনা আ। পনি।

ইহারই বর্ত্তমান রূপ (রবীন্দ্রনাথ)

খোকা মাকে শুধায় ডেকে এলাম আমি কোথায় থেকে কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
মা তারে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে॥